# আমার জীবন
# ও
# বিভাগপূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি

---

আবুল হাশিম

চিরায়ত প্রকাশন
প্রাইভেট লিমিটেড
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট • কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৮

প্রকাশক
শিবব্রত গঙ্গোপাধ্যায়
চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রাকর
এন. গোস্বামী
নিউ নারায়ণী প্রেস
১/২, রামকান্ত মিস্ত্রী লেন, কলকাতা ৭০০ ০১২

প্রচ্ছদ : সুবোধ দাশগুপ্ত

আমি বিনীতভাবে এ গ্রন্থ উৎসর্গ করছি
আমার পিতা বর্ধমানের মৌলবী আবুল কাসেমের
স্মৃতির উদ্দেশে
যাঁর জনসেবার কথা
বাংলার জনগণের কাছে সুবিদিত

# সূচীপত্র

## মুখবন্ধ

আমি আমার পূর্বপুরুষদের এবং আমার শৈশব জীবনের, স্কুল ও কলেজ পর্বের কিছুটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করেছি। কিন্তু এটি ঠিক আমার আত্মচরিত নয়। যাঁরা তিরিশ ও পঁয়ত্রিশ বছরের যুবক পাকিস্তান আন্দোলনের কোনো প্রত্যক্ষ ধারণা তাঁদের নেই। বইটিতে ১৯৩৬ সাল থেকে ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের মুসলিম রাজনীতির ও সেই সঙ্গে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের স্রোত ও অন্তঃস্রোতের উপর আলোকসম্পাত করে একটি বাস্তব বর্ণনা দেওয়ার সম্ভব মতো প্রচেষ্টা করা হয়েছে। এটা ভাগ্যের পরিহাস ছিলো যে, বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার অব্যবহিত পরই মুসলিম লীগের পার্লামেণ্টারী ফ্রন্টের নেতাদের সঙ্গে আমাকে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিলো। মুসলিম লীগের তিনটি পত্রিকা 'মর্নিং নিউজ', 'স্টার অব ইণ্ডিয়া', এবং 'আজাদ', পার্লামেণ্টারী পার্টির স্বপক্ষে প্রায় প্রতিদিন কোনো না কোনো অজুহাতে আমার প্রতি অগ্নিবর্ষণ করত। আমি ঘোষণা করেছিলাম যে, বঙ্গীয় মুসলিম লীগকে আমি একটি ব্যাপক গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল পার্টি হিসাবে সংগঠিত করব। পার্লামেণ্টারী পার্টির মূল অংশ মুসলিম লীগকে তার পার্লামেণ্টারী ফ্রন্টের অধীনস্থ করে রেখেছিলো। আমি পার্লামেণ্টারী ফ্রন্টকে মূল অংশ বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের তত্ত্বাবধানে ও নিয়ন্ত্রণাধীনে চালিত করতে চেয়েছিলাম। এই নীতি ঘোষণা একদিকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি মৌলানা আকরাম খান এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষক বাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের বিরক্তির উদ্রেক করেছিলো, অপর পক্ষে, বাংলার মুসলিম যুব সম্প্রদায়কে করেছিলো উদ্বুদ্ধ।

আমি বাংলার প্রগতিশীল মুসলিম যুব সম্প্রদায়ের সক্রিয় সহযোগিতা লাভ করেছিলাম এবং তাঁদের অক্লান্ত ও যথার্থ পরিশ্রমের দরুন মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীকে সাফল্যের সঙ্গে পরাভূত করতে এবং ১৯৪৬-এর সাধারণ নির্বাচনে তাঁদের ক্ষমতাচ্যুত করতে সক্ষম হয়েছিলাম। আমার বর্ণনা কতখানি তথ্যপূর্ণ ও বাস্তব হতে পেরেছে সেটা পাঠকরাই নির্ধারণ করবেন। এ বই-এর প্রকাশনা সার্থক বলে বিবেচিত হবে —যদি এটা প্রাক্ স্বাধীনতা মুসলিম লীগের এবং পাকিস্তান সংগ্রামের নির্ভরযোগ্য ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে ভাবী ঐতিহাসিকদের কোনো সাহায্যে আসে।

আবুল হাশিম

## স্বীকৃতি

আমার বন্ধু বর্ধমানের এককালীন বাসিন্দা সৈয়দ মুজিবুল্লাহর আর্থিক সহায়তা আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করছি। এ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করার জন্য তিনি কয়েকজন গবেষণা-কর্মী ও সহকারী নিযুক্ত করেছিলেন।

প্রয়াত শ্রদ্ধেয় শরৎচন্দ্র বসু, যিনি বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে খুব দৃঢ় প্রতিরোধ সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রী অমিয় কুমার বসুর প্রতিও আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। তিনি দয়া করে অনেক মূল্যবান দলিলপত্রের ফটো কপি, যার মধ্যে তাঁর পিতার ব্যক্তিগত রেকর্ড থেকে সংগৃহীত দলিলপত্রও ছিলো, আমাকে ব্যবহারের জন্য দিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র বসু রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে যে অবদান রেখেছিলেন সেটা স্বীকৃত হবে এবং তার মূল্য বোঝা যাবে তখনই যখন বাংলার জনগণ তাদের স্বাভাবিক চিন্তাশক্তি ফিরে পাবে এবং বঙ্গ বিভাগের দুঃখজনক পরিণতি পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করবে।

# আমার জীবন ও বিভাগপূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি

## বাল্যকাল

আমার জন্ম হয়েছিলো শুক্রবার প্রত্যুষে ২৭শে জানুয়ারী, ১৯০৫ সালে। আমি আমার পিতামাতার সপ্তম সন্তান ছিলাম। আমার জন্মের পূর্বে আমার ভগ্নীদের জন্ম হয়েছিলো। তাঁদের মধ্যে দু'জনের শৈশবেই মৃত্যু ঘটে। আমার পিতামাতা উভয়ে ছিলেন চাচাতো ভাই ও ভগ্নী। আমার পিতামহ ও মাতামহ ছিলেন সহোদর। এঁদের অগ্রজ হলেন আমার মাতামহ নবাব আবদুল জব্বার ( সি. আই. ই. ) এবং অনুজ আমার পিতামহ মৌলবী আবদুল মজিদ। পিতা মৌলবী আবুল কাসেম ছিলেন তাঁর পিতামাতার প্রথম সন্তান এবং আমার মাতা মোকাররামা খাতুন ছিলেন নবাব আবদুল জব্বারের কনিষ্ঠা কন্যা।

বর্ধমান জেলায় আমাদের পারিবারিক আবাসভূমি কাশিয়াড়া ( বর্তমান নাম কাসেমনগর —অনুবাদক ) গ্রামে আমার জন্ম হয়। আমার মাতামহ সরকারী চাকুরী থেকে অবসর প্রাপ্তির পর তাঁর গ্রামের বাড়িতে বসবাস করতে শুরু করেন। তিনি ছিলেন একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। সরকারী চাকুরীতে অবসর প্রাপ্তির পর তাঁকে ভূপালের প্রধানমন্ত্রীর পদে বহাল করা হয়। আমার পিতামহ মৌলবী আবদুল মজিদ ভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে একজন প্রথম শ্রেণীর উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। আমার প্রপিতামহ খান বাহাদুর গোলাম আসগর ছিলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে একজন অধঃস্তন বিচারক। আমার মাতা তাঁর সন্তানদের নিয়ে মৃত্যুর পূর্ব অবধি আমার মাতামহের সঙ্গেই বসবাস করেছিলেন। আমি ছয় বৎসর বয়সে মাতৃহারা হয়েছিলাম। আমার পিতাও অল্প বয়সে মাতৃহারা হয়ে তাঁর চাচা নবাব আবদুল জব্বার কর্তৃক প্রতিপালিত হয়েছিলেন এবং ষোলো বৎসর বয়সে তাঁর কনিষ্ঠা কন্যার সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। আমার মাতামহী মুসাম্মাৎ সাদেকা খাতুন একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা ছিলেন। শৈশবে আমার পিতা যখন মাতৃহারা হন তখন তিনি তাঁকে আপন সন্তানবৎ লালন-পালন করেন। আমার পিতা এবং তাঁর সহোদরা আফিয়া খাতুন তাঁদের পিতার প্রথম স্ত্রীর দুই সন্তান ছিলেন। আমার ফুপু আফিয়া খাতুন মায়ের মৃত্যুর পর তাঁদের নিঃসন্তান বিধবা ফুপু মুসাম্মাৎ নাজরুন্নেসা কর্তৃক প্রতিপালিত হন।

আমাদের পরিবার দাবী করেন যে, তাঁরা মহান্ দরবেশ মখদুম শাহ বদরুদ্দীন বদরের বংশোদ্ভূত। এই মহান্ দরবেশ কিছুকাল চট্টগ্রামে বসবাস ও কর্মব্যস্ততায় অতিবাহিত করেন। তিনি বিহারের খ্যাতনামা শহর বিহার শরীফে মারা যান

এবং সেখানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়। হযরত মখদুম শাহ বদরুদ্দীন বদরের বংশোদ্ভূত শাহ হায়াৎ মজিদ বিবাহ করেছিলেন হামিদ দানেশমন্দ নামক একজন বিখ্যাত দরবেশের কন্যাকে যিনি হামিদ বাঙালী নামে সমধিক পরিচিত। তিনি বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান ছিলেন। শাহ হায়াৎ মজিদ কাশিমবাড়ায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন এবং সেখানেই মারা যান। তাঁকে আমাদের পারিবারিক সমাধিক্ষেত্রে সমাহিত করা হয়। হযরত আহমদ শিরহিন্দ, যিনি মুজাদ্দিদ আলফেসানী নামে সমধিক পরিচিত, হামিদ দানেশ মন্দকে বাংলায় তাঁর প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছিলেন। হযরত মুজাদ্দেদ আলফেসানী বাদশাহ আকবর ও জাহাঙ্গীরের সমসাময়িক ছিলেন। বাদশা আকবর যখন তাঁর নতুন ধর্ম 'দীন-এ-এলাহী' প্রবর্তন করতে উদ্যোগ নিয়েছিলেন সেই সময়ে হযরত মুজাদ্দেদ আলফেসানী আকবরের সেই অভিপ্রায় যাতে কার্যকর না হয় তার জন্য তীব্র প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিলেন। বাদশাহ জাহাঙ্গীরের ইসলাম-বিরোধী কার্যকলাপেরও তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন।

আমার মাতার মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে আমার মাতমহ লোকান্তরিত হন। আমার মাতার মৃত্যুর পর তাঁর বড় বোন নাসিবা খাতুন আমার লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি একজন অবস্থাপন্ন নিঃসন্তান বিধবা মহিলা ছিলেন এবং বর্ধমান শহরেই বসবাস করতেন। তিনি তিরানব্বই বৎসর জীবিত ছিলেন এবং ১৯৬৩ সালে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

আমার পিতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করার পর কোনো সরকারী চাকুরী গ্রহণ না করে রাজনীতিতে যোগ দেন। স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের দায় দায়িত্ব গ্রহণ করার কোনো সময় বা প্রয়োজন তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে খুব একটা ছিলো না। এসব ব্যাপারে সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছিলো আমার মাতামহ নবাব আবদুল জব্বার এবং খালা মুসাম্মাৎ নাসিবা খাতুনের উপর। আমার পিতা ছিলেন স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর একজন অনুরক্ত শিষ্য এবং লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের বিরোধী সংগ্রামে তাঁর সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত। আমার পিতা ছিলেন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের একজন শীর্ষস্থানীয় সদস্য এবং স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ও তাঁর রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত। স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ১৯২১ সালে কংগ্রেস ত্যাগ করার পর আমার পিতা তাঁকে অনুসরণ করেন। মণ্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কার প্রবর্তনের পর থেকে আমার পিতা প্রাদেশিক অথবা কেন্দ্রীয় উভয় আইনসভার সদস্য পদে আমৃত্যু বহাল ছিলেন। তিনি ১৯৩৬ সালে ১০ই অক্টোবর পরলোকগমন করেন।

আমি যদিও সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশে জন্মেছিলাম ও লালিত হয়েছিলাম তথাপি আমাদের পরিবার বিরাট কোনো জমিদারীর মালিক ছিলেন না। অবশ্য নিজের গ্রামের মধ্যে তাঁরাই জমিদার ছিলেন এবং তাঁদের ভূসম্পত্তি থেকে বাৎসরিক আয়

হতো দশ থেকে বারো হাজার টাকার মতো। পরিবারের সদস্যদের মূল পেশা ছিলো সরকারী চাকুরী। নবাব আবদুল জব্বারের জ্যেষ্ঠ পুত্র মৌলবী মহাম্মদ আবদুল্লাহ ছিলেন একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। দ্বিতীয় সন্তান খান বাহাদুর আবদুল মোমেন অবসর গ্রহণ করেন চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার হিসাবে। মৌলবী মহাম্মদ আবদুল্লার জ্যেষ্ঠ পুত্র মৌলবী মহাম্মদ আবদুল হাফিজ অবসর প্রাপ্ত হন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সরকারী রেলপথের মুখ্য নিরীক্ষক হিসাবে। মূলত তিনি ছিলেন ইণ্ডিয়ান ফাইনান্স সার্ভিসের মহা হিসাবরক্ষক। আমার বড় বোন মসিহা খাতুনের সঙ্গে মৌলবী আবদুল হাফিজের বিবাহ হয়। পরিবারের কিছুসংখ্যক সদস্য বিহার অঞ্চলে চাকুরীরত ছিলেন। সে সময় বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা একই প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। আমার মাতামহ নবাব আবদুল জব্বার খান ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন এবং বিহারেই অধিককাল অবস্থান করেন। আমার পিতামহ মৌলবী আবদুল মজিদ, যিনি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন, তিনিও উত্তর প্রদেশের আগ্রা ও অযোধ্যা অঞ্চলে অধিক কাল কার্যরত থাকায় আমাদের পরিবারের উপর বিহার ও উত্তর প্রদেশের সংস্কৃতির একটা বড় রকমের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। পরিবারের সদস্যরা উর্দুকে তাদের মাতৃভাষা হিসাবে ব্যবহার না করে বরং তাকে স্কুল-কলেজের শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। পরিবারের মধ্যে শহর বা নগর-কেন্দ্রিক জীবন-যাপনের প্রতি কোনো মোহ ছিলো না। তাঁরা মনে করতেন যে, শহর নগর জীবিকা অর্জনের জন্য এবং বসবাসের জন্য গ্রামই শ্রেয়। সুতরাং উপার্জনের বেশির ভাগ অংশই তাঁরা গ্রামে নিজেদের অভিরুচি অনুযায়ী বসতবাড়ি তৈরীতে ব্যয় করতেন। তবে আমার মামা খান বাহাদুর আবদুল মোমিন ( সি. আই. ই. ) অবসর গ্রহণের পরে কলকাতায় বসবাস শুরু করেন। আমি যখন তেরো বছরের বালক তখন আমার মাতামহ নবাব আবদুল জব্বার ১৯১৮ সালে মারা যান। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তাঁর সন্তানেরা ছুটিতে গ্রামেই অবকাশ যাপন করতেন। এভাবে শৈশব থেকে গ্রামের প্রতি আমার একটা বিশেষ আকর্ষণ জন্মায়। যখন আমি উপার্জন শুরু করি তখন আমাদের গ্রামে পুকুর ও বাগানসহ সুন্দর একটা বাড়ি তৈরী করেছিলাম। আমার মাতামহ নবাব আবদুল জব্বার আমাকে খুবই স্নেহের চোখে দেখতেন, আমিও তাঁর প্রতি খুবই আকৃষ্ট ছিলাম এবং বেশির ভাগ সময় তাঁর কাছাকাছি থাকতাম।

তখনকার দিনে নিয়ম ছিলো যে, প্রাদেশিক গভর্নর বৎসরে অন্তত একবার কেবলমাত্র গণ্যমান্য উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য তাঁদের সঙ্গে মিলিত হতেন। মাতামহ প্রায়ই তাঁদের আলাপ-আলোচনা কি হতো• আমাকে বলতেন। একবার তিনি একটা খুব মজার ঘটনা আমাকে বলেছিলেন। তাঁর পিতা খান বাহাদুর গোলাম আসগরকে একবার গভর্নর তলব করেছিলেন

এবং তিনি তাঁর বালক পুত্র আবদুল জব্বারকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসকবর্গ সে সময় সন্দেহ করেন যে, সিপাহী বিদ্রোহের সঙ্গে আমার প্রপিতামহের কোনো সংযোগ রয়েছে সেজন্য গভর্নর তাঁকে বলে বসলেন যে, উনি একজন বিশ্বাসঘাতক। প্রপিতামহ উত্তরে বলেছিলেন, সেতো অবশ্যই, নতুবা আপনারা আমাদের শাসন করেন কিভাবে? গভর্নর উত্তরে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে বিরত থাকেন। আমার প্রপিতামহ খুবই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। বাংলাদেশে যখন ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন হয় তখন মুসলমান সম্প্রদায়ের অধিকাংশই তা বর্জন করে; কিন্তু তিনি তাঁর সন্তানদের ইংরেজি স্কুলে ভর্তি করেন এবং আবদুল জব্বার পরবর্তীকালে বাংলার প্রথিতযশা সাহিত্যিক বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়ের সহপাঠি হন।

আবদুল জব্বার যখন বি. এ. ক্লাসের শেষ বর্ষে পড়ছিলেন তখন তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। সে সময় কেবলমাত্র সম্মানিত পরিবারের সদস্যদের জন্যই এ ধরনের সরকারী পদগুলি সংরক্ষিত থাকত। আমার পিতামহ মৌলবী আবদুল মজিদ এণ্ট্রান্স (বর্তমানে ম্যাট্রিকুলেশন) পাশ করে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে সিনিয়র অফিসার পদে নিয়োজিত হয়েছিলেন। নবাব আবদুল জব্বারের জ্যেষ্ঠ পুত্র আমার বড় মামা মৌলবী মহাম্মদ আবদুল্লাহ এণ্ট্রান্স পাশ করে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন।

আমার পিতামহ মৌলবী আবদুল মজিদ বর্ধমান জেলার কালনা মহকুমার অন্তর্গত রসুলপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা মুসাম্মাৎ সালমা খাতুনকে বিবাহ করেন। আমার পিতা ও ফুপু আফিয়া খাতুন ছিলেন আমার পিতামহের প্রথমা স্ত্রী সালমা খাতুনের গর্ভজাত দুই সন্তান। আমার পিতা ও ফুপু শৈশবেই মাতৃহারা হয়েছিলেন। পিতামহ তাঁর স্ত্রী-বিয়োগের পর তাঁর শালিকাকে বিবাহ করেন। কিন্তু বিবাহের কয়েক মাসের মধ্যেই তিনিও মারা যান। এরপর পিতামহ তৃতীয়বার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন আমার মাতামহীর ভাগিনেয়ী মুসাম্মাৎ তাইয়েবা খাতুনের সঙ্গে। তৃতীয় স্ত্রীর গর্ভে আমার পিতামহের সাতজন সন্তান-সন্ততি জন্মেছিলেন। এঁরা হলেন চার পুত্র, আবুল বারাকত, আবুল হায়াৎ, আবুল খয়রাত ও আবুল হাসনাত এবং তিন কন্যা, শাফিয়া খাতুন, রাফিয়া খাতুন, ও সোয়েবা খাতুন। আমার ফুপু আফিয়া খাতুন তাঁর ফুপু মুসাম্মাৎ নাজরুন্নেসা খাতুন কর্তৃক কন্যারূপে গৃহীত ও প্রতিপালিত হয়েছিলেন। মুসাম্মাৎ নাজরুন্নেসা একজন অবস্থাপন্ন বিধবা নিঃসন্তান মহিলা ছিলেন এবং আমাদের গ্রাম কাশিয়াড়া থেকে তিন মাইল দক্ষিণে মাহাতা নামক গ্রামে বসবাস করতেন। মুসাম্মাৎ আফিয়া খাতুনের বিবাহ হয়েছিলো নবাব আবদুল জব্বারের দ্বিতীয় পুত্র খান বাহাদুর আবদুল মোমেনের সঙ্গে। নাজরুন্নেসা খাতুন তাঁর সমুদয় সম্পত্তি দান করেছিলেন আফিয়া খাতুন ও তাঁর স্বামী আবদুল মোমেনকে।

আমার পিতা যখন নাবালক তখন আমার পিতামহ তাঁর প্রথমা ও দ্বিতীয়া স্ত্রীর সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়েছিলেন, কাজেই আমার পিতা তাঁর মাতা ও ফুপু নাজরুন্নেসার কোনো সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হননি। আমার পিতামহ একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অধিক সময় আল্লাহর উপাসনায় অতিবাহিত করতেন। তিনি সহজেই বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়তেন ও মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ছেলেদের ও গৃহ ভৃত্যের প্রতি নির্দয় ব্যবহার করে বসতেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি খুবই সরল জীবন-যাপন করতেন কিন্তু অন্যান্যদের প্রয়োজনে তিনি ছিলেন অসম্ভব উদারহস্ত ও সংবেদনশীল। দয়া-দাক্ষিণ্যে তিনি অনেক সময় সীমা অতিক্রম করে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়তেন। এক সময় যখন জনৈক ঋণদাতা তাঁর গ্রামের বাড়ি ক্রোক করে নিলামে চড়িয়েছিলো তখন তাঁর অগ্রজ নবাব আবদুল জব্বার তাঁকে দায়মুক্ত করেন। আমার পিতামহকে পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠরা উপদেশ দেন তিনি যেন তাঁর সমস্ত সম্পত্তি ও ভিটাবাড়ি তাঁর তৃতীয়া স্ত্রীর নামে হস্তান্তর করেন। পিতামহের মাত্রাতিরিক্ত বদান্যতার কারণে এই আনুষ্ঠানিক কার্য সম্পাদন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কিন্তু পিতামহের মৃত্যুর পর তাঁর এই তৃতীয়া স্ত্রীর সন্তানরা আমার পিতা ও তাঁর বোন আফিয়া খাতুনকে বঞ্চিত করে সমুদয় সম্পত্তি দখল করে নিয়েছিলেন। আমার পিতামহের মৃত্যুর সময় আমার চাচা আবুল খয়রাত ও আবুল হাসনাত ছিলেন নাবালক মাত্র। আমার মাতা তাঁর পিতার জীবিত অবস্থায় মারা যান। সুতরাং আমি আমার পিতামাতার পূর্ব পুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে কোনো সম্পত্তি লাভ করিনি। যাই হোক, মাতামহ আবদুল জব্বার অবশ্য গ্র্যাণ্ড ট্র্যাঙ্ক রোডের ধারে একটি সুন্দর বাড়ি আমাকে দান করে-ছিলেন। আমার পিতার মৃত্যুর পর তাঁর বালিশের নীচে পেয়েছিলাম একটি কলম, চশমা ও সেই সঙ্গে একটি চামড়ার ব্যাগ। আমি মনে করি না যে আমার সন্তানদের জন্য আমি কোনো সম্পত্তি রেখে যেতে পারব।

আমার মাতামহের মৃত্যুকালে আমার মাতা গর্ভবতী ছিলেন এবং মাতামহের মৃত্যুর পরবর্তী সময়ে তিনি বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় নিয়ে আসা হয় কিন্তু তাঁর অসুখ ভালো হলো না। অবশেষে একটি মৃত সন্তান প্রসব করে তিন দিন পর তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। তাঁর মৃতদেহ আমাদের গ্রামে নিয়ে আসা হয় এবং সেখানে পারিবারিক সমাধিক্ষেত্রে সমাহিত করা হয়।

## স্কুল-কলেজের শিক্ষা

আমার মাতার মৃত্যুর পর আমার খালা নাসিবা খাতুন আমার লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর অভিভাবকত্বে আমি তাঁর বর্ধমানের বাড়িতে থাকতাম। তিনি একজন মহিয়ষী মহিলা ছিলেন ও আমাকে নিজ সন্তানের মতো প্রতিপালন করেছিলেন। আমার মাতার জীবিতাবস্থায় আমার দুই বোন

মাসিহা খাতুন ও হাবিবা খাতুনের বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিলো। মাসিহা খাতুনের বিবাহ হয়েছিলো আমার বড় মামার জ্যেষ্ঠপুত্র মৌলবী মুহাম্মদ আবদুল হাফিজের সঙ্গে ও আমার মেজো বোন হাবিবা খাতুনের বিবাহ হয়েছিলো খালা নসিবা খাতুনের স্বামী মরহুম সৈয়দ আবদুস সালামের ভাগ্নে সৈয়দ হামিদুল্লাহর সঙ্গে। মেজো বোন হাবিবা খাতুন ও তাঁর স্বামী বর্ধমানে আমার খালার বাড়িতেই থাকতেন। আমার অন্য দুই অবিবাহিতা বোন সুফিয়া খাতুন ও হাফসা খাতুনও থাকতেন বর্ধমানে আমার খালার সঙ্গে। মৌলবী মহাম্মদ আবদুল্লাহ ও খান বাহাদুর আবদুল মোমেন ছাড়াও আমার আরও দুই মামা ছিলেন। তাঁরা হলেন মৌলবী আবদুস সামাদ ও মৌলবী আবদুল হালিম। এঁরা আমাদের খুবই স্নেহ করতেন। মৌলবী আবদুল হালিম আরবী ও ফার্সীতে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং কলকাতা মাদ্রাসার শিক্ষা শেষ করে ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হন।

তখনকার দিনে নিয়ম ছিলো ছেলেমেয়েদের আরবী লেখা ও পড়ার মাধ্যমে শিক্ষার হাতেখড়ি দেওয়া। মৌলবী গিয়াসউদ্দীন নামক দেওবন্দ মাদ্রাসার একজন যোগ্য সুপণ্ডিতের তত্বাবধানে আমাকে রাখা হয়। তিনি ছিলেন বিখ্যাত দরবেশ ও পণ্ডিত মাওলানা আশরাফ আলী থানবীর ছাত্র। মৌলবী গিয়াসউদ্দীন বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল ইংরেজি উচ্চ বিদ্যালয়ের আরবী ও ফার্সীর শিক্ষক ছিলেন। গৃহ-শিক্ষক হিসাবে তিনি আমাদের বাড়িতেই থাকতেন এবং বর্ধমান জেলারই অধিবাসী ছিলেন। আল কোরানের বিশুদ্ধ উচ্চারণ পদ্ধতি ও নামাজের নিয়মাবলী অনুশীলনের মাধ্যমে আমি আমার শিক্ষাজীবন শুরু করি। এরপর শুরু হয় বাংলাভাষা শিক্ষা। মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের বাংলা, ইংরেজি, অংক ইত্যাদি শিক্ষার পূর্বে কোরান অধ্যয়ন ও নামাজের নিয়মাবলী শিক্ষা বাধ্যতামূলক ছিলো। আমার গৃহশিক্ষক বিশ্বাস করতেন না যে, আমি কখনো মিথ্যা বলতে পারি। যদিও এটা সত্যি নয় যে, আমি তাঁকে কখনো মিথ্যা বলিনি।

সাত বৎসর বয়সে আমি বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল উচ্চ ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম। এই স্কুলে তখন দ্বাদশ শ্রেণীর মধ্যে চতুর্থ পর্যন্ত ছিলো প্রাথমিক শ্রেণী। প্রাথমিক শ্রেণীতে চার বছর আমি যা শিখেছিলাম সেটা দু'বছরেই শেষ করতে পারতাম। এভাবে আমার দুটি বছর অনর্থক নষ্ট হয়েছিলো। নিয়মানুবর্তিতা ও ভদ্র আচার ব্যবহার শিক্ষার অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ ছিলো। স্কুলের শিক্ষকরা কেবলমাত্র বেতনভোগী ছিলেন না; তাঁরা শিক্ষা আহরণ ও বিতরণে নিজেদের উৎসর্গ করতেন। তখনকার শিক্ষা ব্যবস্থায় এ রকম ধ্যান ধারণা ছিলো যে, ছেলেমেয়েকে উপযুক্ত শাসন ব্যতীত লেখাপড়া করানো সম্ভব নয়। স্কুলের শুরুতে টেবিলের উপর পিয়ন খড়ি, ঝাড়ন ও একটি বেত রাখত এবং ছাত্রকে বেঞ্চিতে দাঁড় করিয়ে রাখাও এক প্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ছিলো।

স্কুল জীবনের ছয় বছরে আমার পিতা বর্ধমানের মহারাজা বাহাদুরের পরিবারের

একটি বড় বাগান বাড়িতে মুসলমান ছাত্রদের জন্য একটি ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা করেন। অন্যান্য অভিভাবকরা যাতে উৎসাহিত হয়ে তাঁদের ছেলেদের সেই ছাত্রাবাসে প্রেরণ করেন সেজন্য আমার পিতা আমায় ও আমার থেকে চার ও দুই বছরের বয়োজ্যেষ্ঠ দুই চাচা আবুল খয়রাত ও আবুল হাসনাতেরও সেখানে থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। ছাত্রাবাসের তত্ত্বাবধায়ক মৌলবী আবুল কাসেম ছাত্রদের পড়াশোনার ব্যাপারে খুবই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। তিনি খুবই যোগ্য শিক্ষক ছিলেন এবং তাঁর ছাত্রদের পুত্রবৎ স্নেহ করতেন। নিয়মানুবর্তিতার অভাব ও কর্তব্যে অবহেলায় তিনি কঠোর শাস্তি প্রদানে কুণ্ঠিত হতেন না। স্কুলের পাঠ ছাড়াও নামাজ পড়া ছিলো অবশ্য পালনীয়। মৌলবী আবুল কাসেম মাঠে নিজ হস্তে কাজ করার জন্য ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করতেন এবং ছাত্রাবাসের উন্মুক্ত জমি শাকসব্জি ফলনের জন্য খণ্ড খণ্ডভাবে প্রত্যেক ছাত্রকে ভাগ করে দিতেন। তিনি চাষাবাদের কিছু যন্ত্রাংশ সংগ্রহ করে সেগুলোর ব্যবহার পদ্ধতি আমাদের শিখিয়েছিলেন। এর ফলে গ্রামের প্রতি আমার আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। পরবর্তীকালে গ্রামে যখন বাড়ি তৈরী করি তখন কিছু জমি আমি ক্রয় করেছিলাম এবং গ্রামের বাড়িতে অবকাশ যাপনের জন্য যখন থাকতাম তখন মাঠে কর্মরত চাষীদের সঙ্গে নিজ হস্তে আমিও কাজে লাগতাম।

আমি ১৯২৩ সালে বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল ইংরেজি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হই এবং টেলর ছাত্রাবাসে অবস্থান শুরু করি। কলকাতার ছাত্রাবাস আমার মনঃপূত হয়নি। বাড়ির পরিবেশ আমার ভালো লাগত, কাজেই আই. এ. দ্বিতীয় বর্ষে পড়ার সময় আমি কলকাতা থেকে চলে আসি এবং বর্ধমান রাজ কলেজে ভর্তি হয়ে সেখান থেকে ১৯২৫ সালে আই. এ. পাশ করি। কিন্তু পুনরায় আমাকে কলকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি করানো হয়। এবারও আমি কলকাতা থেকে চলে আসি এবং বর্ধমান রাজ কলেজ থেকে ১৯২৮ সালে ডিগ্রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই।

আমার নানা রকমের শখ ছিলো। ছবি সংগ্রহ ছিলো আমার প্রথম শখ। স্বভাবত এর থেকে আলোকচিত্র গ্রহণের কৌশল ও পদ্ধতির প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ি। এরপর স্থিরচিত্র থেকে আমি চলচ্চিত্রের দিকে ঝুঁকে পড়ি। বিবাহ উৎসব, চড়ুইভাতি ও বন্যাত্রাণ ইত্যাদি কার্যের উপর কিছু চলচ্চিত্র আমার সংগ্রহের মধ্যে রয়েছে। আমার পরবর্তী শখ ছিলো কুকুর পোষা ও গরু ছাগল হাঁস মুরগীর খামার করা। আমার এসব শখের বস্তুর প্রত্যেকটির ব্যাপারে প্রাপ্ত তথ্যের জন্য আমাকে কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছিলো। আবার যখন হাঁস মুরগী ইত্যাদির শখ হলো তখন এসব ব্যাপারে ভালোভাবে পড়াশোনা করতে হয়েছে। হাঁস মুরগীর ডিম দেওয়ার ব্যাপারে এক বই পড়তে গিয়ে জীববিদ্যা সম্পর্কীয় বেশ কিছু নির্দিষ্ট শব্দের সঙ্গে পরিচিত হলাম। এরপর শুরু হলো জীববিদ্যার উপর

পড়াশোনা। ডারউইনের বিখ্যাত বই *Origin of specis*-থেকে এই ধারণায় উপনীত হলাম, জন্মগত ঐতিহ্য ও পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব থেকে কোনো জীবেরই পরিত্রাণ নেই। এর থেকে সমাজ বিজ্ঞান ও তার অন্যান্য শাখা,অর্থনীতি, রাজনীতি-শাস্ত্র, ইতিহাস ও আইনশাস্ত্র পড়াশোনা শুরু করি। সমাজ বিজ্ঞান পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দর্শনশাস্ত্রও পড়তে হয়েছে। এসব পড়তে গিয়ে বুঝলাম যে কোরানকে ভালোভাবে বুঝতে গেলে দর্শনশাস্ত্র, সমাজ বিজ্ঞান ও জীববিদ্যার উপর একটা সুষ্ঠু ধ্যান ধারণা থাকা প্রয়োজন। এরপর আমি ইসলাম ও কম্যুনিজমের তুলনা-মূলক পড়াশোনায় উৎসাহী হয়ে পড়ি।

জীবন গঠনের প্রারম্ভে আমি আমার মাতামহ নবাব আবদুল জব্বার, আমার পিতা মৌলবী আবুল কাসেম, খালা নাসিবা খাতুন, আমার মায়ের মামা মৌলবী আবদুর রাজ্জাক আনসারী এবং শিক্ষকদের মধ্যে মৌলবী গিয়াসউদ্দীন আহমদ ও মৌলবী আবুল কাসেম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলাম। নবাব আবদুল জব্বার ছিলেন একজন খাঁটি মুসলমান। তিনি কখনও সীমা লংঘন করতেন না এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রেখে চলতেন। ক্রোধ ও রূঢ় বাক্য ব্যবহার থেকে তিনি নিজেকে যথেষ্ট সংযত রাখতেন। আমার পিতা বলতেন যে, কোনো সৎ ও সেই সঙ্গে ছিমছাম ব্যক্তির ব্যাংকে আমানত থাকতে পারে না। তিনি বোঝাতে চাইতেন যে, যে ব্যক্তির কিছুটা ব্যাংক আমানত রয়েছে, তিনি যদি সৎ হন তবে তাঁকে হতে হবে নোংরা গোছের। আবার যাঁর কিছুটা ব্যাংক আমানত রয়েছে, তিনি যদি ছিমছাম হন তাহলে তাঁকে হতে হবে একজন অসৎ ব্যক্তি। নোংরা বলতে তিনি বোঝাতেন কৃপণতা। আমার পিতা আয় করতেন যথেষ্ট কিন্তু কোনো ব্যাংক আমানত রাখেননি। তিনি তাঁর পিতার ন্যায় ছিলেন অমিতব্যয়ী ও উদার। আমার খালা নাসিবা খাতুন বর্ধমানে দয়াশীলা মহিলা বলে পরিচিত ছিলেন। তিনি খুবই সরল জীবন-যাপন করতেন ও ধন-সম্পত্তি থেকে অপরকে অকাতরে বিতরণ করতেন। আমাকেও প্রায়ই বলতেন, আয় করবে ব্যয় করার জন্য জমা করার জন্য নয়। আমার প্রতি তাঁর অপরিসীম স্নেহ মমতা ছিলো। তিনি বিশ্বাস করতে পারতেন না যে, আমি কোনো অন্যায় করতে পারি। আমি যখনই আমার কোনো অন্যায় কার্যের স্বীকারোক্তি তাঁর কাছে করেছি তিনি তৎক্ষণাৎ তা অবিশ্বাস করেছেন।

আমার খালা নাসিবা খাতুন আমার মেজো বোন হাবিবা খাতুনকে কন্যার মতো প্রতিপালন করেন এবং তাঁর বাড়ি ও অন্যান্য যাবতীয় সম্পত্তি তাঁকে দান করেন। মৌলবী আবদুর রাজ্জাক (মাতার মামা) আনসারী অবিবাহিত অবস্থায় ঋষিতুল্য জীবন-যাপন করতেন। তিনি বর্ধমান জেলার সাব রেজিস্ট্রার হিসাবে সরকারী চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। অভাবগ্রস্ত আত্মীয়-পরিজন ও বন্ধু বান্ধবদের ভরণপোষণের জন্য তিনি অকাতরে দান করতেন। মৌলবী

আবুল কাসেম আমার স্কুলের প্রধান মৌলবী ও পিতার প্রতিষ্ঠিত মুসলিম ছাত্রাবাসের প্রথম তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। ইংরেজি ও আরবীর উপর তাঁর খুব একটা ভালো দখল ছিলো না; কিন্তু তিনি আমাদের কায়িক শ্রমের মর্যাদা শিখিয়েছিলেন।

১৯২৮ সালে ৭ই সেপ্টেম্বর শাহ্ সৈয়দ জিয়াউদ্দীনের কন্যা মাহমুদা আখতার মেহেরবানু বেগমের সঙ্গে আমার বিবাহ হয়। শাহ্ সৈয়দ জিয়াউদ্দীন আমাদের বিবাহের পূর্বেই মারা যান। তিনি হুগলী জেলার শাহ্‌বাজার গ্রামের বিখ্যাত দরবেশ শাহ্ গোলাম আলীর বংশজাত ছিলেন। আমার স্ত্রী পিতামাতার কনিষ্ঠা সন্তান ছিলেন। তাঁর মাতা সৈয়দা আজিজা আখতার বানু ছিলেন আরবী ও ইসলামের সুপণ্ডিত মাওলানা ওবায়দুল্লাহ্ ওবায়দীর কন্যা। ওবায়দুল্লাহ্ ওবায়দীর পুত্রদের মধ্যে ডক্টর আবদুল্লাহ্ সুহ্‌রাওয়ার্দী, লেফটেন্যাণ্ট কর্নেল হাসান সুহ্‌রা-ওয়ার্দী ও প্রফেসর আমীন সুহ্‌রাওয়ার্দী ছিলেন বাংলাদেশের সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। প্রফেসর আমীন সুহ্‌রাওয়ার্দী ছিলেন একজন বিখ্যাত যাদুকর। মাওলানা ওবায়দীর কন্যা খোজিস্তা আখতার বানু ছিলেন হোসেন শহীদ সুহ্‌রাওয়ার্দীর মাতা। মাওলানা ওবায়দীর মৃত্যুর পর তাঁর পরিবারের সদস্যরা তাঁদের পরিবারের নতুন নামকরণ করেন সুহ্‌রাওয়ার্দী। ওবায়দুল্লাহ্ ওবায়দী মেদিনীপুরের অধিবাসী ছিলেন কিন্তু তিনি ঢাকায় কর্মরত ছিলেন ও সেখানে বসবাস করেছিলেন। ঢাকাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। লালবাগে তাঁর সমাধি রয়েছে।

আমার বিবাহের অব্যবহিত পরে বর্ধমান থেকে আলীগড় রওয়ানা হলাম এবং সেখানে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. ও আইন ক্লাসে ভর্তি হলাম। এখানের পরিবেশও আমার কাছে অনুকূল মনে না হওয়ায় কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আমার বন্ধু বর্ধমান নিবাসী ওহাজুর রসুলকে সঙ্গে নিয়ে আগ্রার পথে আলীগড় ত্যাগ করলাম। আগ্রায় দেখলাম তাজমহল, মোগল দুর্গ এবং সেকেন্দ্রায় আকবরের সমাধি। আগ্রা থেকে আমি সরাসরি বর্ধমান পৌঁছে পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজে ভর্তি হয়ে গেলাম। কলকাতায় আমি ও আমার বন্ধু আলী হোসেন আমার পিতার বাসভবনে অবস্থান করতে লাগলাম। সৈয়দ আলী হোসেন ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের ছাত্র। প্রথম বছরের কোর্স শেষ করে আমি সান্ধ্য ক্লাশে নাম লিখিয়ে কলকাতা থেকে চলে এলাম। আইনের নির্ধারিত বইপত্র আমি খুব মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করেছিলাম। ১৯৩১ সালে ২৯শে ডিসেম্বর আইন পরীক্ষা শেষ হয় এবং ২০শে ডিসেম্বর আমার প্রথম সন্তান বদরুদ্দীন মহম্মদ উমরের জন্ম-সংবাদ পাই। চেপেনডাল নামে প্রেসিডেন্সী কলেজে আমার পিতার সহপাঠী একজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোক আমাদের ক্লাশে মুসলিম আইন পড়াতেন। এক সন্ধ্যায় তিনি যখন উত্তরাধিকার আইনের উপর

পড়াচ্ছিলেন তখন আমি মন্তব্য করলাম যে স্যার, অনাথ দৌহিত্রেরা যে উত্তরাধিকার আইনে বঞ্চিত এটা আমি অন্যায় বলে মনে করি। চেপেনডাল সাহেব বললেন, দেখো যুবক, বর্তমান আইনে যা রয়েছে, আমার কর্তব্য হলো সেটাই তোমাদের পড়ানো। তোমরা যদি সক্ষম হও তো ভবিষ্যতে এ আইন পরিবর্তন করতে পারো। আল্লার এমন ইচ্ছা যে, ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের ইসলামী আদর্শের উপদেষ্টা সভার আমি একজন সভ্য মনোনীত হলাম এবং প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের মুসলমান পরিবার আইন বিধির উপর সভায় যখন এ বিষয় নিয়ে আলোচনা চলে তখন আমি অনাথ দৌহিত্রদের উত্তরাধিকারের উপর আমার প্রস্তাব পেশ করলাম। আমার সেই প্রস্তাব তৎক্ষণাৎ গৃহীত হয়েছিলো এবং ১৯৬১ সালে অনাথ দৌহিত্রদের উত্তরাধিকার স্বীকার করে আইন তৈরী ও পাশ করা হয়। আইনের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গোলাম মূর্তজা নামে একজন দক্ষ আইনজীবীর কাছে শিক্ষানবীশ হলাম এবং পরবর্তী সময়ে বর্ধমানের আইনজীবী সমিতিতে নিজের নাম তালিকাভুক্ত করলাম।

## আইনজীবী হিসাবে

আমার প্রথম মোকদ্দমা ছিলো ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৪ ধারার অধীনে। খান বাহাদুর নাজিরউদ্দীন আহমদ তখন ছিলেন বর্ধমানের পাবলিক প্রসিকিউটর। আমার মক্কেলকে দণ্ড প্রদানের ব্যাপারে হামিদুল হক চৌধুরীর বড় ভাই বর্ধমান পুলিশের সুপারিনটেনডেন্ট আজিজুল হক চৌধুরী খুবই উদগ্রীব ছিলেন। নিহত ব্যক্তিটি একজন পুলিশ অফিসারের আত্মীয় ছিলেন। বিচারক নরনারায়ণ মুখার্জী বললেন, দেখুন আমি কি করতে পারি, আজিজুল হক আপনার মক্কেলকে শাস্তি প্রদানের জন্য আমাকে খুবই পীড়াপীড়ি করছেন। সে সময় বিচারকবর্গের পদোন্নতি নির্ভর করত পুলিশ রিপোর্টের উপর।

যাই হোক, পয়লা রমজান সরকার পক্ষীয় মামলা শেষ হয় এবং সূর্যাস্তের কিছু পূর্বে জুরিবৃন্দ পরামর্শের জন্য পার্শ্ববর্তী কক্ষে মিলিত হন। আমার স্ত্রী আমার জন্য কোর্টে ইফতার পাঠিয়েছিলেন, সূর্যাস্তের পর আমি ইফতার করলাম। জুরিবৃন্দ তাঁদের কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে একবাক্যে রায় প্রদান করলেন যে, আসামী নির্দোষ। আমার মক্কেল সসম্মানে খালাস পেল এবং এভাবেই আইনজীবী পেশায় আমার শুভ সূচনা হয়।

আমার সমবয়সী জুনিয়ার আইনজীবীদের মধ্যে আমিই প্রথম স্বাধীনভাবে একটি ফৌজদারী মামলা পরিচালনা করি। এরপর ফৌজদারী কোর্টে বিচারাধীন বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর মামলায় আমাকে নিযুক্ত করা হয়।

আমার তৃতীয় ভগ্নী সুফিয়া খাতুনের বিবাহ হয়েছিলো আমার পিতামহ ও মাতামহের জীবদ্দশায়। আমার পিতা বর্ধমান জেলার কুলুট গ্রামের জনৈক যুবক

মহম্মদ কাসেম চৌধুরীর সঙ্গে আমার ভগ্নীর বিবাহের সম্বন্ধ ও কথাবার্তা পাকা করেছিলেন। এই বিবাহটি ছিলো খুবই দুর্ভাগ্যজনক। আমার পিতামহ, মাতামহ ও পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যরা আমার পিতার এ সিদ্ধান্তের বিপক্ষে ছিলেন কিন্তু পরিশেষে পিতার সিদ্ধান্তই বলবৎ থাকে। এই ভদ্রলোকের ছোটভাই যক্ষায় আক্রান্ত হয়ে মারা যায় এবং তাঁকেও যক্ষাক্রান্ত বলে সন্দেহ করা হয়, কিন্তু আমার পিতা সেকথা বিশ্বাস করতে পারেননি। বিবাহের তিন মাস পর আমার এই ভগ্নীপতি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কয়েক মাস এভাবে অসুস্থ থাকার পর যক্ষায় তাঁর মৃত্যু ঘটে এবং আমার ভগ্নী বিধবা হন। তিনি পরবর্তীকালে আর বিবাহ না করে তাঁর মৃত স্বামীর আত্মীয় বর্গের সঙ্গেই থেকে যান।

আমার চতুর্থ ভগ্নী হাফসা খাতুনের বিবাহ হয়েছিলো আমার পিতামহ ও মাতামহের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পর মুর্শিদাবাদ জেলার সালার গ্রামের শুকুরুল হোসেনের সঙ্গে যিনি ছিলেন কলকাতা পুলিশের একজন সাব ইনস্পেকটর। স্বামী ও তিনপুত্র রেখে আমার ভগ্নী মারা যান।

কুলুর্ট গ্রামের জমিদার জোতদাররা ছিলো খুবই উগ্র, নৃশংস ও অনমনীয় মহাজন। এই জোতদাররা ছিলো তিন ভাই। জোতদারদের পাপাচারের মূলে ছিলো তাদের দ্বিতীয় ভ্রাতাটি এবং এই দ্বিতীয় ভ্রাতাটিকে হত্যা করা হয়েছিলো। পুলিশ গ্রামের বেশ কিছু বিশিষ্ট প্রজাদের আটক করে তাদের বিরুদ্ধে ৩০১/১২০ ধারায় অর্থাৎ হত্যা এবং হত্যার চক্রান্ত এই অভিযোগ খাড়া করে আটক করলেন। এই মোকদ্দমাটি জেলা জজকোর্টে বিচারাধীন ছিলো। দু'জন প্রবীণ কৌঁসুলি সৈয়দ গোলাম মহিউদ্দীন ও সৈয়দ গোলাম মূর্তজার অধীনে একজন নবীন উকিল হিসাবে এ মোকদ্দমায় আমাকে নিযুক্ত করা হয়েছিলো।

আসামীদের অন্যতম আবদুল খানকে আটক করার পর স্বীকারোক্তি করায় সে রাজসাক্ষী হয়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সে তার স্বীকারোক্তি অস্বীকার করে। অন্যান্য আসামীদের বিচারের সময় আবদুল খানকে একজন বিগড়ে যাওয়া সাক্ষী হিসাবে দাঁড় করানো হয় এবং পাবলিক প্রসিকিউটর তাকে জেরা করেন। জজকোর্টে বিচারাধীন আসামীদের প্রধান অংশের সকলকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়, কিন্তু তারপর কলকাতা হাইকোর্টে তারা খালাস পেয়ে যায়।

আবদুল খানের বিচার পৃথকভাবে হয় এবং স্বাধীনভাবে আমি তার পক্ষ সমর্থন করি। জজকোর্টে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হলেও পরবর্তী সময় কলকাতা হাইকোর্টের বিচারকরা তার পক্ষে রায় প্রদান করেন। আমি পাঁচ বছর আইন পেশায় নিযুক্ত ছিলাম। আইন পেশায় আমার শুভ সূচনা হয়েছিলো এবং পাঁচ বছরের মধ্যে আমি প্রতিবাদী উকিল হিসাবে জজকোর্টে বেশ কয়েকটি চাঞ্চল্যকর ফৌজদারী মামলা পরিচালনা করেছিলাম। ১৯৩৬ সালের শেষ পর্বে আমি রাজনীতিকে আমার পেশা হিসাবে গ্রহণ করি।

আমাদের বর্ধমানের বাড়ি ২নং পার্কার রোড ছিলো জেলা রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু। আমার আত্মীয়দের মধ্যে হিন্দু মহাসভা ছাড়া অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতা ও কর্মী ছিলেন। আমার পিতার কংগ্রেস পরিত্যাগের পর আমার চাচা মৌলবী আবুল হায়াৎ কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং বর্ধমান জেলা কংগ্রেস কমিটির অন্যতম নেতা হিসাবে পরিগণিত হন। ছাত্রাবস্থায় এবং ওকালতির সময় আমি রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ নেওয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখি। বই ও বিভিন্ন প্রকার শখের চর্চা ছিলো আমার ব্যস্ততার অবলম্বন স্বরূপ। বন্যাত্রাণ ইত্যাদি সমাজ সেবামূলক কাজেও আমি খুবই উৎসাহী ছিলাম। আমাদের বর্ধমান জেলা তখন প্রায়ই দামোদরের বন্যায় প্লাবিত হতো। বর্ধমান শহরে মেয়েদের জন্য খৃস্টান মিশনারী ইংরেজি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিলো এবং শহরের মুসলমানদের আমি বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলাম যাতে তাঁদের কন্যাদের তাঁরা সেই স্কুলে দেন। আমার বিয়ের পর আমি নিজেও আমার স্ত্রীকে উক্ত স্কুলে ভর্তি করেছিলাম। ১৯২৮ সালে আমি 'যুব মুসলিম সমিতি', গঠন করি। আমি এই সমিতিকে প্রথমে সংগঠিত করে তার প্রাদেশিক সম্মেলনও করেছিলাম। উক্ত সম্মেলনের উদ্বোধন করেন স্যার আবদুর রহিম এবং সভাপতিত্ব করেন বাংলার মুসলমানদের একমাত্র ইংরেজি সাপ্তাহিক মুখপত্র 'দি মুসলমান'-এর সম্পাদক মৌলবী মুজিবুর রহমান। আমি আমার স্কুল জীবন থেকে শুরু করে সব সময়ই মুসলমান মেয়েদের ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ রাখার যে প্রথা ছিলো তার ঘোর বিরোধী ছিলাম। যুব মুসলিম সমিতির সম্মেলনে মুসলমান মেয়েদের গৃহে অন্তরীণ রাখার প্রথার বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

আমার পিতা ১৯২১ সাল থেকে রক্তের উচ্চ চাপে ভুগছিলেন। মাওলানা মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে খেলাফত ডেপুটেশনে তিনি যখন ইংল্যাণ্ড গমন করেন তখন সেখানে তাঁর এই অসুখ ধরা পড়ে। তিনি কখনও তাঁর শরীরের যত্ন নিতেন না। চিকিৎসকদের পরামর্শ মতো ওষুধ ও পথ্য ব্যবহার তিনি অগ্রাহ্য করতেন। ১৯৩২ থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত তিনি প্রায়ই অসুস্থ থাকতেন এবং অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও তিনি স্বাভাবিক কাজকর্ম চালিয়ে যেতেন। ১৯৩৬ সালের মাঝামাঝি ঘন ঘন রক্তক্ষরণের ফলে তিনি সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন এবং তাঁকে বর্ধমানে নিয়ে আসা হলো। আমারা বুঝেছিলাম যে তাঁর দিন শেষ হয়ে এসেছে। তাঁর মৃত্যুর সময় মৃত্যুশয্যাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর সন্তান-সন্ততি, ভাই-বোনেরা ও অন্যান্য নিকট আত্মীয় পরিজন। ঐ দিন সন্ধ্যায় বর্ধমানের ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড ময়দানে তাঁর জানাজা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর তাঁর লাশ আমাদের গ্রামে নিয়ে আসা হয়। সেখানে পারিবারিক সমাধি ক্ষেত্রে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। ( তাঁর মৃত্যু ঘটে ১৯৩৬-এর ১০ই অক্টোবর বেলা দুটোর সময় —অনুবাদক )। তাঁকে সমাধিস্থ করার পূর্বে পুনর্বার জানাজা হয়েছিলো কেন না

পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল থেকে কয়েক হাজার লোক তাঁর জানাজায় শরিক হওয়ার জন্য সেখানে সমবেত হয়েছিলেন। আমার পিতাকে সমাধিস্থ করার পর সেখানে এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় তাঁরা স্থির করেন যে, আমার পিতার মতো আমাকে বর্ধমানের মুসলমানদের নেতৃত্ব প্রদান করতে হবে এবং বঙ্গীয় আইনসভায় আমাকে তাঁরা নির্বাচিত করবেন। বর্ধমানে এসে দেখলাম, শহরের মুসলমানরাও সেই একই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। তাঁরা নিজেদের সিদ্ধান্ত আমাকে জানালেন এবং আমি বর্ধমান মুসলমান নির্বাচন কেন্দ্র থেকে সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সিদ্ধান্ত নিলাম। সাধারণ নির্বাচন নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হলো। ম্যাকডোন্যাল্ড এ্যাওয়ার্ড-এর অধীনে এটাই ছিলো প্রথম সাধারণ নির্বাচন। মর্লে-মিণ্টো এ্যাওয়ার্ডে বর্ধমান, বীরভূম ও বাঁকুড়া এই তিন জেলা থেকে মুসলমানদের জন্যে ছিলো একটি মাত্র আসন। ম্যাকডোন্যাল্ড এ্যাওয়ার্ডে এই জেলা তিনটির প্রত্যেকটি থেকে মুসলমানদের জন্যে ছিলো একটি করে আসন।

আমি বর্ধমান থেকে এবং আমার মামাতো ভাই, খান বাহাদুর মহাম্মদ আবদুল মোমেনের জ্যেষ্ঠপুত্র আবদুর রশিদ, বীরভূম থেকে বঙ্গীয় আইনসভায় নির্বাচিত হয়েছিলাম। আসলে আমার পিতার জীবনব্যাপী জনকল্যাণমুখী কার্যের স্বীকৃতি ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ জনসাধারণ আমাদের পক্ষে ভোট প্রদান করেন। এভাবে ১৯৩৬ সালে নভেম্বর মাসে আমি রাজনীতিতে প্রবেশ এবং আইন ব্যবসা থেকে অবসর গ্রহণ করলাম। কেন না, আমি উপলব্ধি করেছিলাম, রাজনীতি ও আইন ব্যবসা উভয়ই হলো সার্বক্ষণিক কাজ। আমি এটাও উপলব্ধি করেছিলাম যে, রাজনীতি ও আইন ব্যবসায় উভয় কাজে যদি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করি তাহলে কোনোটির প্রতিই সুবিচার করা সম্ভব হবে না। সুতরাং দু'য়ের মধ্যে একটিকে আমার বেছে নেওয়া দরকার ছিলো এবং আমি রাজনীতিকেই বেছে নিয়েছিলাম।

আইনসভায় আমি দল নিরপেক্ষ প্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলাম। খাজা নাজিমুদ্দীন বরিশাল জেলার পটুয়াখালী থেকে নির্বাচনে অংশ নেন এবং কৃষক প্রজা পার্টির নেতা এ. কে. ফজলুল হক খাজা নাজিমুদ্দীনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। বাংলার ছোট লাট স্যার জন এণ্ডারসন খাজা নাজিমুদ্দীনকে সমর্থন করার জন্য জনসাধারণের নিকট আবেদন করেন এবং সরকারী কর্মকর্তাদের উপর নির্দেশ জারি করেন খাজাকে সক্রিয় সমর্থন প্রদান করার জন্য। এই বিশেষ নির্বাচনী এলাকাটি ছিলো নবাব পরিবারের জায়গীরভুক্ত অঞ্চল। সারা বাংলার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিলো এই নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। ফজলুল হক খাজা নাজিমুদ্দীনকে পরাজিত করেছিলেন। হোসেন শহীদ সুহরাওয়ার্দী নির্বাচিত হয়েছিলেন দুটি নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে। তিনি একটি আসন ছেড়ে দেওয়ায় সেখান থেকে উপনির্বাচনে খাজা নাজিমুদ্দীন নির্বাচিত হন। এটা সুস্পষ্ট যে,

আইনসভায় মুসলিম লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে সমর্থ ছিলো না। অন্যদিকে ফজলুল হকের দলীয় পার্টির অবস্থানও ছিলো তদ্রূপ। সুতরাং মুসলিম লীগ ও ফজলুল হকের পার্টির মধ্যে জোট গঠন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ঢাকার নবাব খাজা হাবিবুল্লাহর বাড়িতে মুসলিম লীগ সংসদীয় দল ও ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টির এক যুক্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো এবং ফজলুল হক সভাপতি নির্বাচিত হলেন। ফজলুল হকের বিজয় সম্পন্ন হলো এবং তিনি ও তাঁর দল আনুষ্ঠানিকভাবে মুসলিম লীগে যোগদান করলেন। সুতরাং ফজলুল হকের নেতৃত্বে ম্যাকডোন্যাল্ড এ্যাওয়ার্ডের অধীনে প্রথম সরকার গঠিত হলো।

১৯৩৭ সালে কলকাতায় এম. এ. ইস্পাহানীর বাসভবনে আমি মহাম্মদ আলী জিন্নাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। জিন্নাহ আমাকে বললেন যুবক, আমার পতাকাতলে এসো। উত্তরে আমি বলেছিলাম, স্যার, আমি কেন প্রত্যেক নারী ও পুরুষ আপনার পতাকাতলে আসবে যদি আপনি তাদের জন্যে উপযুক্ত লক্ষ্য নির্দেশ করতে সক্ষম হন। যুবকরা চায় উন্মাদনা, আবেগ ও চাঞ্চল্য। কংগ্রেস তার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে সেটা দিতে সক্ষম হয়েছে। কারার লৌহ-কপাটের পিছনে রয়েছে যথেষ্ট আবেগ, উন্মাদনা। জিন্নাহ বললেন, এসো আমরা নিজেদের এমনভাবে সংগঠিত করি, যেন বাংলা ও পাঞ্জাবের সুযোগ সন্ধানীদের উপর ২৪ ঘণ্টার নোটিশ জারি করতে পারি।

আমার ধারণা হলো সুযোগ সন্ধানী বলতে তিনি খাজা নাজিমুদ্দীন ও স্যার সেকেনদার হায়াৎ খানকে বুঝিয়েছিলেন। আমি এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তাঁর নিকট থেকে বিদায় নিলাম যে, জিন্নাহ মুসলিম লীগকে একটি পূর্ণাঙ্গ গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল হিসাবে গঠন করতে ইচ্ছুক এবং জিন্নাহর সে কথায় বিশ্বাস করে আমি মুসলিম লীগে যোগদান করলাম। কিন্তু আমি প্রতারিত হয়েছিলাম। পরবর্তীকালে আমি দেখেছি যে নবাব এবং প্রভাবশালী ব্যবসায়ী ছাড়া অন্যদের মূল্য তাঁর কাছে ছিলো না।

ঐ একই বছরে আমার গ্রাম কাশিয়াড়ায় বর্ধমান কৃষক-সম্প্রদায়ের ও বর্ধমান মুসলমান নেতৃবর্গের এক সম্মেলন আহ্বান করা হয়। ফজলুল হক, খাজা নাজিমুদ্দীন, এইচ. এস. সুহরাওয়ার্দী এবং স্যার বিজয় প্রসাদ সিংহ রায় সম্মেলনে যোগদান করেন। সে সময় দামোদর ক্যানেল তৈরীর পরিকল্পনার কাজ সমাপ্ত হয় এবং পূর্ববর্তী সরকার বর্ধমান জেলায় উপদ্রুত অঞ্চলে ক্যানেল-কর আরোপ করেন। কৃষক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি এক তরুণ আইনজীবী কিরণচন্দ্র দত্ত জোরের সঙ্গে দাবী করেন যে, লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্তানুযায়ী বাঁধ তৈরী এবং পূর্তকার্যে সহায়তা দান জমিদারদের দায়িত্ব এবং সেহেতু খাজনা যদি আরোপ করতে হয় তাহলে জমিদারদের জমি চাষের জন্য যারা খাজনা দেয় তাদের উপর না করে জমিদারদের উপরই সেটা আরোপ করা উচিত। তদানিন্তন রাজস্ব-

মন্ত্রী স্যার বিজয় প্রসাদ সিংহ রায় সে প্রস্তাব গ্রহণ করতে সম্মত হলেন না। কিন্তু কথা দিলেন যে, খাজনার ভার লাঘব করা হবে এবং তা করাও হয়েছিলো।

বর্ধমানে আমার পিতা বর্ধমান মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশন সংগঠিত করেন যেটা বর্ধমানের মুসলমানদের একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করত এবং তিনি ছিলেন তার সভাপতি।

আমার গ্রামে বর্ধমান মুসলিম নেতৃবৃন্দের সম্মেলনে মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশনকে বর্ধমান জেলা মুসলিম লীগে রূপান্তরিত এবং আমাকে তার সভাপতি নির্বাচিত করা হয়েছিলো।

আমার একটা বিরাট ভুল সিদ্ধান্তের কারণে ১৯৩৮ সালে বর্ধমান জেলা মুসলিম লীগের নেতৃত্বে ফাটল ধরে। বর্ধমানে একজন সরকারী উকিল নিয়োগের প্রয়োজন ছিলো। ফজলুল হক সাহেব আমাকে সেই পদটি প্রদানের প্রস্তাব করেন। আমার উচিত ছিলো ধন্যবাদ জ্ঞাপনপূর্বক সে প্রস্তাব নাকচ করে সে পদের জন্য বর্ধমান মুসলিম লীগের প্রবীণ ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁরা যোগ্য এবং ১৯৩৭-এর সাধারণ নির্বাচনে আমাকে নিরঙ্কুশ সমর্থন দান করেছিলেন তাঁদের সমর্থন করা। কিন্তু খান বাহাদুর নজিরুদ্দীন আহমদ সহ ( যিনি তখন বর্ধমানের পাবলিক প্রসিকিউটর ) অন্যান্য প্রবীণ মুসলমানদের আমি বিরোধিতা করে বসলাম। যদিও উক্ত পদের জন্য সরাসরিভাবে কোনো চেষ্টা করিনি। সৈয়দ গোলাম মূর্তজা ছিলেন প্রকৃতপক্ষে এ পদের জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি। এ. কে. ফজলুল হক প্রতিজ্ঞা করার ব্যাপারে খুবই উদার ছিলেন কিন্তু সেই প্রতিজ্ঞা কার্যে পরিণত করার জন্য বিশেষ দৃষ্টি দিতেন না। আমার মতো একজন নবীন আইনজীবীকে সরকারী উকিল পদের জন্য সুপারিশ করা জেলা কর্তৃপক্ষের পক্ষে ন্যায়সঙ্গতভাবে অসুবিধাজনক ব্যাপার ছিলো। বেশ কিছুকাল নথি-পত্রাদি নিষ্পত্তির কাজে বিলম্ব ঘটল এবং আমি এ ব্যাপারে একদমই উদাসীন থাকলাম। সৈয়দ গোলাম মূর্তজা এ পদের জন্য ভূদেব মুখার্জী নামক একজন হিন্দু আইনজীবীর নাম প্রস্তাব করলেন এবং আমি সে প্রস্তাব গ্রহণ করলাম। ভূদেব মুখার্জী সরকারী উকিল নিযুক্ত হলেন। কিন্তু খুব দেরী হয়ে গিয়েছিলো, কেন না, ইতোমধ্যে আমি বর্ধমানের প্রবীণ মুসলমান নেতৃবর্গ তথা আইনজীবী, চিকিৎসক ও জমিদারদের শত্রুতে পরিণত করেছিলাম।

বর্ধমান জেলার প্রবীণ আইনজীবী সৈয়দ আবদুল গণি ছিলেন বর্ধমান জেলা মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক। বঙ্গীয় আইনসভায় বাংলার রায়তি শর্ত আইন বিবেচনার জন্যে পাঁচ মাসের এক দীর্ঘ অধিবেশন চলছিলো এবং এই পাঁচ মাস আমি প্রকৃতপক্ষে বর্ধমানের বাইরে ছিলাম। ১৯৩৮ সালে জেলা মুসলিম লীগের সংগঠনের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিলো সম্পাদক সৈয়দ আবদুল গণির উপর। সৈয়দ আবদুল গণি বর্ধমানের পাবলিক প্রসিকিউটর খান বাহাদুর

নজিরুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে মুসলিম লীগের (বর্ধমান মুসলিম লীগ) অভ্যন্তরে আমার বিরুদ্ধে পাল্টা সংগঠন করেন। তিনি কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ও কর্মকর্তা নির্বাচনের জন্য জেলা মুসলিম লীগের বার্ষিক সাধারণ সভার তারিখ ও সময় নির্ধারণ করেছিলেন। আমি নির্বাচনের পূর্বদিন সন্ধ্যায় কলকাতা থেকে বর্ধমান পৌছলাম এবং পরের দিন বেলা দুই ঘটিকায় বর্ধমান টাউন হলে সভা অনুষ্ঠিত হলো। ব্যালটে ভোট গ্রহণ করা হলে আমি তিন ভোট বেশি লাভ করে নির্বাচনে জয়ী হয়ে বর্ধমান মুসলীম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হলাম।

সৈয়দ আবদুল গণি সেক্রেটারী পদপ্রার্থী ছিলেন। তিনি এগারো ভোটে পরাজিত হন। বর্ধমান জেলায় আমার বিরোধিতার ক্ষেত্রে সৈয়দ গণি ছিলেন মূল পরামর্শদাতা ও পরিচালক। পরবর্তী দুই বৎসর যাবৎ তাঁরা তাঁদের বিরোধী কার্যকলাপ অব্যাহত রাখেন। তৃতীয় বছর তাঁরা সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত হয়েছিলেন। তাঁরা জেলা মুসলিম লীগের সভা থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন এবং স্বাধীনতা অর্জনের দিন থেকে বাংলা বিভক্ত হওয়া অবধি আমার নিষ্ক্রিয় রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হিসাবে ছিলেন।

মৌলবী মহাম্মদ ইয়াসিন ছিলেন বর্ধমানের একজন বিখ্যাত ফৌজদারী মামলার উকিল। তাঁর পুত্র জনাব মহাম্মদ আজম বর্তমানে ঢাকার অন্যতম বিখ্যাত ফৌজদারী মামলার উকিল। মৌলবী ইয়াসিন সম্পর্কে আমাদের আত্মীয় ছিলেন এবং তিনি ও আমার পিতা বর্ধমান জেলার দু'জন প্রসিদ্ধ নেতা ছিলেন। আমার পিতা যখন কংগ্রেস ত্যাগ করে স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর সঙ্গে যোগ দিলেন তখন মৌলবী মহাম্মদ ইয়াসিন কংগ্রেসেই থেকে গেলেন এবং বর্ধমান জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হলেন। ১৯২১ সালের সাধারণ নির্বাচনে মৌলবী মহাম্মদ ইয়াসিন আমার পিতার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়ে তাঁকে পরাজিত করে কেন্দ্রীয় আইনসভার সভ্য মনোনীত হন। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে মৌলবী মহাম্মদ ইয়াসিন আমার বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং পরাজিত হন। প্রকৃতপক্ষে এই নির্বাচনে জনসাধারণ যে আমার পক্ষে ও মৌলবী মহাম্মদ ইয়াসিনের বিপক্ষে ভোটদান করেছিলেন সেকথা সত্য নয়। তাঁরা ভোটদান করেছিলেন আমার প্রয়াত পিতাকে স্মরণ করে।

১৯৩৮ সালে আমি সর্বপ্রথম এলাহাবাদে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে যোগদান করি। নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সভাপতি জিন্নাহ অধিবেশনে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং মাওলানা হসরত মোহানী তার বিরোধিতা করেন। মাওলানা হসরত মোহানী যুক্তি প্রদান করেন যে, জিন্নাহর প্রস্তাব ইসলামী আদর্শের পরিপন্থী। সভাপতির অনুমতিক্রমে আমি নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কাউন্সিলে বক্তৃতা দ্বারা দলীয় প্রস্তাবকে সমর্থন করে যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করলাম যে, জিন্নাহ তাঁর বক্তব্যে ইসলামের নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায়

রেখেছেন এবং হসরত মোহানী যা বলতে চেয়েছেন তা ইসলামী আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সভা আমার পক্ষ সমর্থন করল এবং দলীয় প্রস্তাবটি গৃহীত হলো। ঐদিন থেকে জিন্নাহ আমাকে 'মৌলানা সাহেব' বলে সম্বোধন করতেন।

আইন সভার বাইরে বর্ধমান জেলার মধ্যেই আমার রাজনৈতিক কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ ছিলো। অন্য কোনো জেলায় তখনো আমি সফর বা বর্ধমানের বাইরে কোনো জনসভা করিনি। বর্ধমান জেলা মুসলিম লীগ ভালোভাবেই সংগঠিত করা হয়েছিলো। ইংরেজ সরকারকে অচল করার লক্ষ্যে গান্ধী যখন কর-রোহিত অভিযান শুরু করলেন তখন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল জয়ের শিরোপা লাভ করেছিলেন। সারা ভারত তাঁর যোগ্যতাকে স্বীকৃতি দিয়েছিলো এবং তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। এর থেকে আমি এক শিক্ষা লাভ করেছিলাম। পরিধি যতই সীমাবদ্ধ অথবা ক্ষুদ্র হোক যদি কোনো ব্যক্তি সেই পরিধির মধ্যে থেকে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে সক্ষম হন তাহলে তিনি সেই পরিধি অতিক্রম করে বৃহত্তর ক্ষেত্রে যোগ্যতার স্বীকৃতি লাভ করতে পারবেন। ১৯৩২ সালে সিরাজগঞ্জে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্মেলনে আমি কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য নির্বাচিত হলাম।

১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ লাহোরে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অধিবেশনে আমি যোগদান করি। এই অধিবেশনের পূর্বদিনে খাকসারদের সঙ্গে পুলিশের প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। পুলিশের গুলিতে বহুসংখ্যক খাকসার নিহত ও আহত হয়েছিলো। ১৯৪০-এর মুসলিম লীগের অধিবেশনের প্রাক্কালে লাহোরের জনপদ খাকসারদের রক্তে সিক্ত হয়েছিলো। খাকসাররা আল্লামা এনায়েতুল্লাহ মাশরেকীর জঙ্গী সংগঠন হিসাবে পরিচিত ছিলো। আল্লামা মাশরেকী, জিন্নাহ ও তাঁর দলের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা পোষণ করতেন না। তাঁদের অভিমত ছিলো যে, জিন্নাহ ও নওবাব নাইটদের সমন্বয়ে গঠিত তাঁর প্রতিনিধিরা ছিলেন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অনুচর। কথায় ও কাজে ভারতে খাকসারদের আদর্শ ছিলো প্রকৃত অর্থে মদিনার খোলাফায়ে রাশেদীনের ন্যায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। সম্মেলনের জন্যে একটি জমকালো প্যাণ্ডেল তৈরী করা হয়েছিলো। ভারতের কোনো দেশীয় রাজ্য থেকে নিয়ে আসা একটি সিংহাসন মঞ্চের উপর রাখা হয় সভাপতির উপবেশনের জন্যে। প্রধান প্রবেশ পথ থেকে কয়েক শত ফুট দূরে মঞ্চটি তৈরী করা হয়েছিলো। অতিথিদের আসনোপযোগী স্থান এক লক্ষের অধিক ছিলো। প্রবেশ পথে এ. কে. ফজলুল হককে দেখামাত্র চতুর্দিকে ধ্বনি উঠল 'শেরে বাংলা জিন্দাবাদ, বাংলার বাঘ দীর্ঘজীবী হউন।' এ. কে. ফজলুল হক মঞ্চাভিমুখে রাজকীয় ভঙ্গীমায় ধীরে ধীরে সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মতো ডান ও বামে হেলতে-দুলতে অগ্রসর হয়ে দশ থেকে পনেরো মিনিটের মধ্যে মঞ্চের নিকট পৌছলেন। ফজলুল হক আসন গ্রহণ না করা পর্যন্ত হর্ষধ্বনি চলতে লাগল।

জিন্নাহ বললেন : "থামুন, থামুন, বাঘকে এখন খাঁচায় তোলা হয়েছে।" তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে ফজলুল হক মঞ্চে এসে ১৯৩০-এর বিখ্যাত প্রস্তাব উত্থাপন করলেন যা ইতিহাসে পাকিস্তান প্রস্তাব নামে পরিচিত। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ একের পর এক মাইক্রোফোনে এসে ফজলুল হকের উত্থাপিত প্রস্তাব সমর্থন করলেন। জিন্নাহর সভাপতির ভাষণের পর প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হলো। এইভাবে ১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ লাহোরে পাকিস্তান সংগ্রামের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিলো এবং ১৯৪১ সালের মাদ্রাজ সম্মেলনে ১৯৪০-এর লাহোর প্রস্তাব নিখিল ভারত মুসলিম লীগের মূল লক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হয়। ১৯৪০-এর লাহোর প্রস্তাবের মূল ভাষ্য নিম্নরূপ :

"সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইল ইহা নিখিল ভারত মুসলিম লীগের বিবেচিত অভিমত যে নিম্নের মূলনীতি ব্যতিরেকে কোনো সাংবিধানিক ব্যবস্থা এদেশে কার্যকর করা সম্ভব নহে; অথবা মুসলমানদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নহে যথা : ভৌগোলিকভাবে পার্শ্ববর্তী ইউনিটগুলিকে এক একটি অঞ্চল হিসাবে প্রয়োজন অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে এমনভাবে গঠন করিতে হইবে যাতে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা যেমন ভারতের উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্বাঞ্চলগুলিকে সংঘবদ্ধ করিয়া এক একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত করা, যার শাসনতন্ত্র হবে স্বাধীন ও সার্বভৌম। এই সমস্ত ইউনিট ও অঞ্চলের সংখ্যালঘুদের পর্যাপ্ত কার্যকর এবং আইনানুগ নিরাপত্তার ব্যবস্থা সংবিধানে রাখিতে হইবে যাতে ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থ নৈতিক, প্রশাসনিক এবং অন্যান্য অধিকারও তাহাদের পরামর্শ অনুযায়ী সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে যেখানে মুসলমানরা সংখ্যালঘু সেখানেও তাহাদের পরামর্শ সাপেক্ষে তাহাদের জন্য সংবিধানে ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।"

লাহোর প্রস্তাব ছিলো ভারতীয় মুসলমানদের আবাসভূমি হিসাবে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহ গঠনের জন্য আন্দোলনের ভিত্তি। ভারতীয় মুসলমানদের আবাসভূমি হিসাবে দুটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের একটি হলো, পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও কাশ্মীর নিয়ে গঠিত উত্তর-পশ্চিম ভারতে, অন্যটি বাংলা ও আসাম নিয়ে গঠিত উত্তর-পূর্ব ভারতে। একজন মুসলমান ও বাঙালী হিসাবে আমি নিজের স্বাধীনতা দেখেছিলাম লাহোর প্রস্তাবে এবং ১৯৪০-এর লাহোর প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে আমি আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলাম।

জিন্নাহ দ্বিজাতিতত্ত্ব প্রচার করেছিলেন এবং এ তত্ত্বকে তিনি তাঁর রাজনীতির ধুয়ো হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। আমি জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলাম না এবং বাংলায় আমি সেটা প্রচারও করিনি। আমি প্রচার করেছিলাম বহুজাতিতত্ত্ব। আমি মনে করি ভারতবর্ষ কোনো একটি দেশ নয়। এ হলো একটি উপমহাদেশ।

ভারতবর্ষ বিভিন্ন দেশ ও জাতির সমন্বয়ে গঠিত। আমার কাছে ইউরোপ বলতে যা বোঝায় ভারতবর্ষ বলতেও তাই বোঝায়। ফ্রান্সের নাগরিক যখন বলে সে একজন ফরাসী সেটাও যেমন সত্য, আবার যখন বলে সে একজন ইউরোপীয় সেটাও তেমনি সত্য। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও সেই একই ব্যাপার।

বাংলার নাগরিক যখন বলে সে একজন বাঙালী সেটাও যেমন সত্য আবার সে যখন বলে সে একজন ভারতীয় সেটাও তেমনি সত্য। ভারতবর্ষ মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা হিসাবে পৃথিবীর কাছে সুপরিচিত। প্রদেশসমূহে মুসলমানদের পৃথক আবাসভূমির জন্য ভারতীয় মুসলমানদের প্রতিনিধি মুসলিম লীগ দাবী উত্থাপন করেছিলো। আসামের বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থানের কথা বিবেচনা করে মুসলিম লীগ আসামের এবং সেই সঙ্গে বাংলারও স্বাধীনতা দাবী করেছিলো। মুসলিম লীগ ভারতবর্ষের কোনো দেশকে বিভক্ত অথবা পাঞ্জাব বা পাঞ্জাবীদের এবং বাংলা বা বাঙালীদের বিভক্ত করার কথা চিন্তা করেনি। কাজেই ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে সাম্প্রদায়িক কিছু ছিলো না।

## ফজলুল হকের মুসলিম লীগ পরিত্যাগ

১৯৪২ সালে ফজলুল হক মুসলিম লীগ পরিত্যাগ করেন এবং হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেসের সঙ্গে একত্রিত হয়ে তাঁর নেতৃত্বে গঠন করেন এক নতুন মন্ত্রিপরিষদ। ডঃ. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে মন্ত্রিত্বে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং এই মন্ত্রিপরিষদ 'শ্যামা-হক মন্ত্রিপরিষদ' নামে পরিচিত হয়। ফজলুল হকের মুসলিম লীগ ত্যাগ এবং কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার সঙ্গে যোগদানের প্রতিবাদে আমার মাতুল খান বাহাদুর আবদুল মোমিনের সভাপতিত্বে কলকাতা মনুমেণ্ট ময়দানে এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। আমি এই সভায় বক্তৃতা প্রদান করি। এটাই ছিলো জেলার বাইরে কোনো জনসভায় আমার প্রথম আবির্ভাব। মুসলিম লীগ মন্ত্রিত্বের পতনের পর খাজা নাজিমুদ্দীন আইনসভায় বিরোধী দলের নেতৃত্বের কার্য সম্পাদন করেন। একের পর এক মুসলিম লীগের সদস্যরা মুসলিম লীগ ত্যাগ করে ফজলুল হকের জোটভুক্ত দলে যোগদান করলেন এবং আইনসভায় কেবলমাত্র চল্লিশজন সদস্য মুসলিম লীগের অনুগত রইলেন। এঁরাই 'নির্ভীক চল্লিশ' নামে পরিচিত হন। ১৯৩৭ সালে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে ফজলুল হক শেরে বাংলা বা বাংলার বাঘ নামে অভিনন্দিত হন। সেখানে তিনি বলেছিলেন যে, কংগ্রেস যদি ভারতের অন্যত্র কোথাও মুসলমানদের প্রতি অশোভন আচরণ করে তাহলে তিনি বাংলায় হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর তার প্রতিশোধ গ্রহণে কুণ্ঠিত হবেন না। কিন্তু এরপর তাঁকে মুসলিম লীগের নেতা ও সমর্থকরা 'গাদ্দার' বা 'বিশ্বাসঘাতক' বলে অভিহিত করল এবং 'বাংলার শৃগাল' নামেও চিহ্নিত করল।

বাংলায় মুসলিম লীগ সরকারের পতনের কয়েক সপ্তাহ পূর্বে বর্ধমান জেলা বোর্ডের সদস্য নির্বাচন শেষ হয়।

বোর্ডের নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে কংগ্রেস সংখ্যালঘু ছিলো এবং জেলা মুসলিম লীগ লাভ করেছিলো পাঁচটি আসন। শ্যামা-হক মন্ত্রিত্ব গঠনের অব্যবহিত পরই সরকার কংগ্রেস পার্টি থেকে বোর্ডে পাঁচজন সদস্য মনোনীত করল। এতদসত্ত্বেও কংগ্রেস সংখ্যালঘুই থেকে যায় এবং মুসলিম লীগের পাঁচজন সদস্য ভারসাম্য বজায় রাখে। অতঃপর কংগ্রেস মুসলিম লীগের সঙ্গে আলোচনা শুরু করল। এই শর্তে আমি কংগ্রেসকে সমর্থন করতে রাজি হলাম যে, জেলা বোর্ডের শাসনকার্যে মুসলিম লীগের পাঁচজন সদস্যকে কংগ্রেস জেলা বোর্ডের প্রশাসনে তাদের দলীয় ক্ষমতার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে গ্রহণ করবে। কংগ্রেস রাজি হলো। দলিলের একটি খসড়া তৈরী করা হলো এবং যথারীতি কংগ্রেস নেতা শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ও মুসলিম লীগের পক্ষে আমি তাতে স্বাক্ষর করলাম। স্থির হলো যে, জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান হবেন শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মিত্র ও ভাইস চেয়ারম্যান হবেন মৌলবী আবুল হায়াৎ যিনি ছিলেন কংগ্রেস নেতা ও আমার চাচা। অফিস কার্যনির্বাহকদের নির্বাচনের তারিখ ও সময় নির্ধারিত হলো এবং শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মিত্র চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলেন। কিন্তু বোর্ডের হিন্দু সদস্যরা মৌলবী আবুল হায়াৎকে ভোট দিতে সম্মত হলেন না। ফলে ভাইস চেয়ারম্যানের নির্বাচন কিছুসময়ের জন্য স্থগিত রইল। শ্রীপ্রণবেশ্বর সরকার, যিনি টোগো সরকার নামে অধিক পরিচিত, জেলা বোর্ড অফিস থেকে আমার বাসভবনে ছুটে এসে তাঁর গাড়িতে করে আমাকে সঙ্গে নিয়ে বোর্ড অফিসে উপস্থিত হলেন। এভাবে হিন্দুদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হলো এবং তারা নির্বিঘ্নে মৌলবী আবুল হায়াৎকে বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত করল। জেলা বোর্ডের অফিস নির্বাহকের নির্বাচনে কংগ্রেসের বিজয় উদযাপনের জন্য একটি সভা আহ্বান করা হয়। বর্ধমান জেলা কংগ্রেসের অন্যতম হোমরা চোমরা শ্রীবিজয় ভট্টাচার্য ঘোষণা করলেন যে, মুসলিম লীগের সঙ্গে জোটবদ্ধ হওয়া কংগ্রেসের নীতি বিরুদ্ধ কারণ মুসলিম লীগ কংগ্রেসের নীতির বিরুদ্ধে এবং সেহেতু জেলা বোর্ডের মুসলিম লীগের সদস্যদের সভায় উপস্থিত থাকায় তাঁর আপত্তি রয়েছে। মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্রকে কোনো গুরুত্ব না দিয়ে তা বাজে কাগজের ঝুড়িতে নিক্ষেপ করা হলো এবং এভাবেই কংগ্রেস মুসলিম লীগ জোটের অবসান ঘটল। আমার চাচা মৌলবী আবুল হায়াৎ সব সময় অনুযোগ করতেন যে, বোর্ডের পাঁচজন মুসলিম লীগ সদস্য সর্বদা তাঁদের সমস্যার সৃষ্টি করত। মুসলিম লীগের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে আমি যত শীঘ্র সম্ভব কংগ্রেসকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার সিদ্ধান্ত করলাম।

কয়েক মাস পর জেলা স্কুল বোর্ডের ভাইস প্রেসিডেন্ট-এর পদ শূন্য হওয়ায় কংগ্রেস আমার চাচা মৌলবী আবুল হায়াৎকে উক্ত পদে নির্বাচনের জন্য মনোনীত

করে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পদাধিকার বলে বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। আমার বন্ধু টোগো সরকার এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। আমি তাঁকে সমর্থন করি। আমার চাচা, কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী নির্বাচনে পরাজিত হয়েছিলেন। আমার আত্মীয়বর্গ আমার এই দৃষ্টিভঙ্গীতে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। কিন্তু আমি রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে কখনও ব্যক্তিগত আবেগ প্রবণতা, অনুভূতি, আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের প্রশ্রয় দিতাম না। এক সময় আমি বর্ধমান মহামেডান এ্যাসোসিয়েশনের মধ্যে বিবাদ নিষ্পত্তির উদ্যোগে এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নির্বাচনে আমার পিতার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে সমর্থন করে তাঁর বিরোধিতা করেছিলাম। মৌলবী মহাম্মদ ইয়াসিন সভাপতি ও গোলাম মুর্তজা সম্পাদক নির্বাচিত হন। পরের বছরে আমার পিতা সভাপতি এবং গোলাম মুর্তজা সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। সৈয়দ গোলাম মুর্তজা ছিলেন মৌলবী মহাম্মদ ইয়াসিনের অনুসারী।

টোগো সরকার বর্ধমানের হিন্দুদের অন্যতম নেতা এবং জেলার হিন্দু যুবকদের নায়ক ছিলেন। তিনি মোটামুটি অবস্থাপন্ন এবং জেলা আইনজীবী সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান সদস্য ও সুবক্তা ছিলেন। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, যদি তিনি হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার দিকে ঝুঁকে পড়েন তাহলে মুসলমানদের জন্য যথেষ্ট অনিষ্টের কারণ হবে। টোগো সরকার বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল রাজনীতিতে আগ্রহী ছিলেন। এর জন্য তাঁর বর্ধমান শহরের মুসলমানদের সমর্থন প্রয়োজন হয়ে পড়ে এবং আমি তাঁকে সে সমর্থন দিতে থাকি। এর ফলে বর্ধমান মুসলিম লীগের পক্ষে টোগো সরকার ও তাঁর দলের সহযোগিতা লাভে আমি সমর্থ হয়েছিলাম। টোগো সরকার বর্ধমান মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন।

এ. কে. ফজলুল হক এমন এক রাজনৈতিক সমাজ ব্যবস্থায় জন্মেছিলেন ও রাজনৈতিক জীবনের প্রথম ভাগ অতিবাহিত করেছিলেন যেখানে জনগণের নেতৃত্ব নির্ভর করত, ব্যক্তিগত গুণাবলী এবং যাঁরা চাকুরী কিংবা অন্যান্য সুযোগ সুবিধে আদায়ের জন্য প্রভাবশালী রাজনীতিবিদদের সহানুভূতি ও সমর্থনের উপর নির্ভরশীল তাঁদের ক্ষেত্রে কি ধরনের কাজ-কর্ম করেছেন তার উপর। এ ক্ষেত্রে ফজলুল হক ছিলেন মোটামুটিভাবে উদার ও দক্ষ। সে সময় প্রত্যেক খ্যাতিসম্পন্ন নেতা ছিলেন একটি প্রতিষ্ঠানের সমতুল্য। পার্লামেণ্টারী পার্টির রাজনীতি তখন সবেমাত্র সূচনা হয়েছিলো কিন্তু তা তাদের পার্টির সদস্যদের শৃঙ্খলাগতভাবে বাধ্য রাখার মতো তেমন শক্তিশালী হয়নি। এটাও অন্যতম কারণ যার জন্য ফজলুল হক কোনো পার্টির প্রতি অনুগত ছিলেন না।

ফজলুল হক ছিলেন একজন খাঁটি বাঙালী। তিনি জানতেন যে, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীরা বাংলার অধিবাসীদের খুব একটা পছন্দ করে না। ইংরেজ শাসনকালে বহুকাল বাংলাদেশ ছিলো ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের চারণ ক্ষেত্র।

ফজলুল হক কখনও অবাঙালীদের বশ্যতা স্বীকার করেননি। কিন্তু সুহরাওয়াদ ও খাজা নাজিমুদ্দীন জিন্নাহর লেজুড়বৃত্তি করতেন। যার ফলে বাংলা সরকারের প্রধান হিসাবে থাকাটা ফজলুল হকের পক্ষে অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। এটাই ছিলো দ্বিতীয় কারণ যার জন্যে তাঁর পক্ষে বেশি দিন মুসলিম লীগের প্রতি অনুগত থাকা সম্ভব হয়নি।

শ্যামা-হক মন্ত্রিত্ব ও প্রগতিশীল কোয়ালিশন পার্টি গঠনের এগারো মাস পর ফজলুল হক মুসলিম লীগে পুনরায় যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করে জিন্নাহর সঙ্গে পত্রালাপ শুরু করেন। ফজলুল হক ও জিন্নাহর মধ্যে যেসব পত্র আদান প্রদান হতো সেগুলি সংবাদপত্রে দেওয়া হতো। ১৯৪৩ সালে ১৭ই ফেব্রুয়ারীতে ফজলুল হক তাঁর শেষ চিঠিতে লিখলেন: "প্রধানমন্ত্রিত্বের পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে আমি প্রগতিশীল কোয়ালিশন পার্টিকে সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করতে পারি। এ কাজ করতে যাওয়ার অর্থ এই নয় যে, বর্তমান পার্টির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা। এর অর্থ প্রথমত, মুসলিম সংহতি রক্ষা এবং দ্বিতীয়ত, একটি পরিপূর্ণভাবে জাতীয় সরকার গঠন, যেখানে বর্তমান সংকট-মুহূর্তে সর্বদলীয় প্রতিনিধিত্ব বজায় থাকবে।" মুসলিম লীগের প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলার জাতীয় সরকার গঠনের চিন্তা জিন্নাহর রাজনৈতিক চিন্তাধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিলো না, কাজেই ফজলুল হকের পরিকল্পনা ব্যর্থ হলো। ফজলুল হক তাঁর রাজনৈতিক চিন্তায় কখনও স্থিরতা বজায় রাখতে পারেননি।

কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে মুসলিম লীগে যোগদান করার পর তাঁর নেতৃত্বে জাতীয় সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত ছিলো সম্পূর্ণ সঠিক। ফজলুল হকের এই পরিকল্পনা তিনি যদি কার্যকর করতে পারতেন তাহলে হয়ত বঙ্গভঙ্গ রোধ সম্ভব হতো। শ্যামা-হক মন্ত্রিত্ব ১৯৪১-এর ১১ই অক্টোবর গঠিত হয়েছিলো। সেই মন্ত্রিপরিষদ ইস্তফা দান করেছিলো ১৯৪৩-এর ২৭শে মার্চ।

মুসলিম লীগকে যখন ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করা হলো এবং ফজলুল হক যখন কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে নতুন মন্ত্রিত্ব গঠন করলেন তখন খাজা নাজিমুদ্দীনের বাসভবনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। সেই সভায় যোগদান করতে আমি কলকাতায় এসেছিলাম। সন্ধ্যা সাতটায় সে সভার সময় নির্ধারিত হয়। দুপুরের আগেই ৪০ নং থিয়েটার রোডের বাসভবনে সুহরাওয়ার্দীর সঙ্গে আমি দেখা করলাম। আমি তাঁর বাসভবন থেকে বের হয়ে রাস্তার উল্টো দিকের ফুটপাতে কম্যুনিস্ট পার্টির তিনজন বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য বঙ্কিম মুখার্জী, মৌলানা আকরম খাঁর জামাতা আবদুর রাজ্জাক এবং ভুপেশ গুপ্ত নামে এক যুবক ব্যারিস্টারের দেখা পেলাম। বঙ্কিম মুখার্জীকে আমি চিনতাম। তাঁরা বললেন যে তাঁরাও খাজা নাজিমুদ্দীনের কাছে যাচ্ছেন। আমাকে তাঁরা সঙ্গে নিলেন। যখন আমরা খাজা

নাজিমুদ্দীনের কক্ষে প্রবেশ করলাম তখন আমার মনে হলো তিনি আমাকে দেখে বিস্মিত হলেন। তাঁরা যুক্তভাবে ফজলুল হক মন্ত্রিত্বের বিরোধিতার জন্যে মুসলিম লীগ ও কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে একটি চুক্তিপত্রের ওপর আলোচনা করলেন। খাজা নাজিমুদ্দীন বললেন, তিনি দলিলটি কার্যনির্বাহী কমিটিতে অনুমোদনের জন্য পেশ করবেন। বঙ্কিম মুখার্জী বললেন যে, চুক্তির শর্তগুলো ব্যাখ্যা করার জন্য যদি প্রয়োজন হয় তাহলে মিস্টার অধিকারী, তৎকালীন কম্যুনিস্ট পার্টির তাত্ত্বিক, যিনি তখন কালকাতায় ছিলেন তাঁকে পাওয়া যাবে। স্থির হলো আমার ভাগিনেয় সৈয়দ শাহেদুল্লাহ্ আমাকে সঙ্গে নিয়ে কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় যাবেন ও সভাকক্ষের পাশের বারান্দায় অপেক্ষা করবেন। যদি প্রয়োজন হয় তবে তিনি মুসলিম লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় চুক্তিপত্র ব্যাখ্যার জন্য অধিকারীকে নিয়ে আসবেন। আমি আশা করেছিলাম খাজা নাজিমুদ্দীন দলিলটি কমিটিতে পেশ করবেন কিন্তু তিনি সেটা করলেন না। আমি আশ্চর্য হলাম যখন সুহরাওয়ার্দী বললেন, "সভাপতি, কম্যুনিস্ট পার্টি সম্বন্ধে আবুল হাশিমের কিছু বক্তব্য রয়েছে।" আমি বোকামি করে আমার উপস্থিতিতে খাজা নাজিমুদ্দীন ও কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে যে মতৈক্য হয়েছিলো সে বিষয়ে প্রস্তাব করে বসলাম। আমাকে একেবারে অবাক করে দিয়ে খাজা নাজিমুদ্দীন ও হোসেন শহীদ সুহরাওয়ার্দী দারুণভাবে সেই প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন। যেহেতু প্রস্তাবিত চুক্তির ব্যাপারে আমার কোনো কিছু করার ছিলো না তাই আমি সে বিষয়ে আর কিছু করলাম না এবং প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে গেলো। খাজা নাজিমুদ্দীন সম্ভবত বিস্মৃত হয়েছিলেন, কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি সৈয়দ শাহেদুল্লাহ্ বারান্দায় বসেছিলেন। সভা শেষে খাজা নাজিমুদ্দীন তাঁকে দেখলেন। খাজা সাহেবের অপ্রত্যাশিত আচরণ ফাঁস হয়ে যাওয়ায় তাঁর প্রতি করুণার উদ্রেক হলো। কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে এটাই ছিলো আমার প্রথম যোগাযোগ।

মুসলিম লীগের পার্লামেণ্টারী পার্টির নেতৃবৃন্দ একটি শক্তিশালী কার্যনির্ধারণ প্রণালী অবলম্বন করেছিলেন। তাঁরা দলত্যাগীদের নির্বাচন কেন্দ্রগুলিতে জনসভার আয়োজন করেছিলেন। বাংলার মুসলমানরা মুসলিম লীগের প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত ছিলো এবং এই আন্দোলন আশানুরূপ ফলপ্রসূ হয়েছিলো। জনমতের চাপে পড়ে দলত্যাগীরা পুনরায় মুসলিম লীগ পার্লামেণ্টারী পার্টিতে যোগদান করতে লাগল এবং মুসলিম লীগ পার্লামেণ্টারী পার্টি পুনরায় তার পুরাতন ক্ষমতা লাভ করল। ফজলুল হকের অনুগামীরা ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হলেন এবং তৎকালীন বাংলার ছোটলাট জন হার্বার্ট ফজলুল হককে আহ্বান করে তাঁকে ইস্তফা দিতে অনুরোধ করলেন। ফজলুল হক ইস্তফা দিলেন এবং ১৯৪৩ সালে ২৪শে এপ্রিল, খাজা নাজিমুদ্দীনের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ সরকার পুনর্বহাল হলো।

## বাংলার মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত

১৯৪৩ সালে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রস্তাব গ্রহণ করল যে, যাঁরা মন্ত্রী বা পার্লামেণ্টারী ইত্যাদি পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন তাঁরা মুসলিম লীগ পার্টি সংগঠনে কোনো প্রকার পদে বহাল থাকতে পারবেন না। বাংলায় হোসেন শহীদ সুহরাওয়ার্দী বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সিভিল সাপ্লাই মন্ত্রী ছিলেন। তাঁকে স্থির করতে হলো যে, তিনি মন্ত্রী থাকবেন অথবা মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক পদেই বহাল রইবেন। তিনি স্থির করলেন মন্ত্রী হিসাবেই থাকবেন। কাজেই মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদকের পদটি শূন্য হলো।

১৯৪৩ সালে অক্টোবর মাসে মৌলানা আজাদ সোবহানী বর্ধমানে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং আমার আতিথ্য গ্রহণ করলেন। মৌলানা আমাকে জানালেন তিনি আমার কাছে বিশেষ এক উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছেন। তিনি বললেন, "আপনাকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক হতে হবে এবং বাংলায় মুসলিম লীগের মঞ্চ থেকে ইসলামের প্রায়োগিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে হবে।" মৌলানার এ রকম প্রস্তাব আমার কাছে অদ্ভুত বলে মনে হলো। বঙ্গীয় আইনসভার আলোচনায় আমি অংশ নিয়েছি এবং কলকাতার সংবাদপত্রে তার প্রতিবেদনও ছাপা হয়েছে। এইসব প্রতিবেদনের মাধ্যমে জেলার বাইরে কিছু লোকের কাছে আমি পরিচিত হয়েছিলাম। কিন্তু এটা অচিন্তনীয় ব্যাপার ছিলো যে, বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কাউন্সিল সদস্যরা আমার পক্ষে ভোট দেবেন যাদের সঙ্গে আমার কখনও কোনো ব্যক্তিগত যোগাযোগই ছিলো না। ইসলামের প্রায়োগিক তাৎপর্য ব্যাখ্যার ব্যাপারেও আমি নিজেকে উপযুক্ত বলে মনে করিনি।

আমার ব্যক্তিগত জীবনের প্রতি আমি শ্রদ্ধাশীল ছিলাম না এবং আমার ত্রুটি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলাম। মৌলানার কাছে আমি স্পষ্টভাবে সেগুলো জানিয়েছিলাম। মৌলানা একটু চুপচাপ থেকে বললেন, "তবু আমি বলছি, আপনাকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হতে হবে এবং মুসলিম লীগের মঞ্চ থেকে ইসলামের প্রায়োগিক ব্যাখ্যা করতে হবে। যদি পরিস্থিতির উপর নিয়ন্ত্রণ না থাকার কারণে আপনি যাকে নিজের সীমাবদ্ধতা বলছেন তা কাটিয়ে উঠতে অক্ষম হন তাহলে আপনি অন্তত এমন কিছু করবেন না যা একটা কেলেংকারিতে পরিণত হতে পারে। ইসলাম সম্বন্ধে আমার কিছু জ্ঞান আছে এবং আপনাকে এটুকু বলতে পারি যে, আমি একজন অপদার্থ ব্যক্তিকে সমর্থন করছি না।"

মৌলানা আজাদ সোবহানী গোরখপুর জেলার অধিবাসী ছিলেন। এই মহান্ মৌলানা ছিলেন একজন প্রথিতযশা দার্শনিক ও বিশ্লেষণমুখী চিন্তাবিদ। ইসলামের বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিলো সুগভীর এবং দৃষ্টিভঙ্গী ছিলো যুক্তিসঙ্গত। এই মহান্ বুদ্ধিজীবীর সংস্পর্শ ইসলাম সম্পর্কে আমার চিন্তাধারাকে সুসংগঠিত ও দৃঢ় করতে

অনেকটা সহায়ক হয়েছিলো। ১৯৪২ সালে আসানসোল ডাকবাংলায় তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে। সেখানে মানব জীবনের অস্তিত্ব ও বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে অর্জিত জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামী চিন্তাধারার পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তার উপর তিনি আলোচনা করেছিলেন। কলকাতা মুসলিম লীগের কর্ণধার ও উপদেষ্টা রাগিব আহসান, সেক্রেটারী ওসমান এবং দৈনিক উর্দু পত্রিকা 'আখবার জাদিদ'-এর সম্পাদক মৌলানা আবদুল জব্বার ওয়াহিদি প্রশ্ন করছিলেন এবং মৌলানা আজাদ সোবহানী তার উত্তর দিচ্ছিলেন। সেই প্রথম সাক্ষাতে আমরা পরস্পরের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। তিনি যখনই বাংলায় আসতেন তখনই আমার সঙ্গে দিন কয়েক থাকতেন। তিনি যদি বর্ধমান বা কলকাতায় আমার দেখা না পেতেন তাহলে আমার গ্রামের বাড়িতে গিয়ে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে আমাকে বাংলার জেলাসমূহে ভ্রমণ করতে হতো। মৌলানা যদি কলকাতায় আমার দেখা না পেতেন তাহলে আমার সফরসূচী থেকে জানতে পারতেন কোথায় আমার দেখা পাবেন। আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ব্যতিরেকে তিনি বাংলা ত্যাগ করতেন না এবং আমরা ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা আলাপ-আলোচনায় রাত্রি অতিবাহিত করতাম।

তিনি আমাকে রব্বানী দর্শনে দীক্ষিত করেছিলেন। রব্বানিয়াৎ শব্দটি স্রষ্টার গুণবাচক 'রব' থেকে উদ্ভুত যার অর্থ বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং বিবর্তক। বাস্তব অর্থে রব্বানিয়াৎ বলতে বোঝায় স্রষ্টার নিয়ম অনুসারে বিশ্বের সৃষ্টি, পালন এবং বিবর্তনে মানব জাতির দৈহিক, মানসিক এবং বুদ্ধিবৃত্তির উন্নয়ন ; যেগুলি প্রকৃতির মধ্যে, আল কোরানে এবং পয়গম্বর হযরত মহম্মদের ( দঃ ) জীবনে লক্ষণীয় ছিলো, আল কোরান এবং হযরত মহম্মদ ( দঃ ) কোনো এক অদ্ভুত ও অসার জীবন পদ্ধতি শিক্ষা দেননি, বরং অন্যান্য পয়গম্বর, ঋষি ও দার্শনিকরা যা শিক্ষা দিয়েছিলেন সেগুলির সঠিকতাই তুলে ধরেছিলেন। রব্বানিয়াৎ ইসলামী মূল্যবোধের মূলতত্ত্ব। 'রব' আল্লাহর সর্বোচ্চ গুণবাচক নাম এবং তাঁর অন্যান্য গুণাবলী হলো এই মূল গুণের পরিপূরক ও সম্পূরক। যে ব্যক্তি তত্ত্ব ও বাস্তবে রব্বানিয়াৎকে গ্রহণ করে তাকে বলা হয় 'রব্বানী'। লোকে গালভরা বুলি হিসাবে ইসলামী রাষ্ট্রের কথা বলে কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রের প্রকৃত অর্থ কি সে সম্বন্ধে তাদের ন্যূনতম ধারণা নেই। যে রাষ্ট্র তার নাগরিকের ব্যক্তি ও সমষ্টিগত জীবনে বিশ্বস্ততার সঙ্গে রব্বানিয়াৎকে কার্যে পরিণত করে তাকেই বলা হয় ইসলামী রাষ্ট্র। বর্তমান পৃথিবীতে কোথাও ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রচলিত নেই।

১৯৪৩ সালে অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে আমি হোসেন শহীদ সুহরাওয়ার্দীর সঙ্গে কলকাতায় সাক্ষাৎ করলাম। তখন তিনি সিভিল সাপ্লায়ের মন্ত্রী। আমি তাঁকে বললাম যে, বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদকের নির্বাচনে

আমি প্রার্থী হতে চাই। তিনি বললেন, "তা কিভাবে সম্ভব আপনার দৃষ্টিশক্তি খুবই ক্ষীণ।" আমি বললাম, আপনি কি মনে করেন যে, রাজনীতি পাখী শিকার, যার জন্যে তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন হতে হবে। তিনি বললেন, "ঠিক আছে, চিন্তা করে দেখি।" অবশেষে সুহরাওয়ার্দী আমার পদপ্রার্থিতা সমর্থন করলেন। ১৯৪৩ সালে আমি সম্পূর্ণভাবে দৃষ্টিশক্তি হারাইনি এবং সব কিছু দেখতে, পড়তে ও লিখতে পারতাম, কিন্তু সাহায্য ব্যতিরেকে রাত্রিতে নিশ্চিন্তে চলাফেরা করতে পারতাম না।

আমি, খাজা নাজিমুদ্দীন, শাহাবুদ্দীন ভ্রাতৃদ্বয় ও তাঁদের সহচরবর্গ মৌলানা আকরাম খাঁ, হামিদুল হক চৌধুরী প্রভৃতির কাছে গ্রহণযোগ্য হইনি। যখন নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নওবাবজাদা লিয়াকত আলী খান কলকাতা সফরে এসেছিলেন তখন খাজা নাজিমুদ্দীন বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদকের জন্যে অন্য কাউকে মনোনীত করার জন্য লিয়াকত আলী খানকে প্ররোচিত করার আপ্রাণ চেষ্টা করলেন। খাজা যুক্তি প্রদর্শন করলেন যে, যদি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাহলে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সুখী পরিবার দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়বে। খাজা নাজিমুদ্দীন প্রকৃতপক্ষে পকেট মুসলিম লীগের সুখী পরিবারের নেতা ছিলেন। নওবাবজাদা বঙ্গীয় মুসলিম লীগের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করলেন। সে সময় বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ বিরাজমান ছিলো।

নওবাবজাদা লিয়াকত আলী খানকে আমি বর্ধমান সফরে আমন্ত্রণ জানালে তিনি আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। খাজা নাজিমুদ্দীন ও এইচ. এস. সুহরাওয়ার্দীকেও আমি আমন্ত্রণ জানালাম। খাজা তখন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, ১লা নভেম্বর তাঁরা বর্ধমান সফরে এলেন এবং একদিনের জন্য আমার অতিথি হলেন। তাঁরা সকলে কয়েকটি লঙ্গরখানা পরিদর্শন করলেন। মধ্যাহ্নভোজে আমি ধর্ম, বর্ণ ও রাজনৈতিক মতাদর্শ নির্বিশেষে বর্ধমানের সকল গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ও রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম এবং নওবাবজাদার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় করিয়েছিলাম। হিন্দু মহাসভার নেতাদেরও আমি নিমন্ত্রণ করেছিলাম। মধ্যাহ্নভোজের পর নওবাবজাদা বর্ধমান টাউন হলে বুদ্ধিজীবীদের সমাবেশে বক্তৃতা প্রদান করলেন। খাজা নাজিমুদ্দীন, সুহরাওয়ার্দী এবং তাঁদের লোকজন সন্ধ্যায় কলকাতা রওয়ানা হলেন। লিয়াকত আলী রাত্রির আহারের পর দিল্লী যাত্রা করলেন। নওবাবজাদার বর্ধমান সফর ২রা নভেম্বর মর্নিং নিউজের প্রতিবেদনে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছিলো।

বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদকের নির্বাচনের দিন ১৯৪৩ সালের ৭ই নভেম্বর ধার্য করা হয়েছিলো। ২রা নভেম্বর আমি কলকাতা পৌঁছে পার্ক সার্কাসে আমার এক বন্ধু কাজী ফজলুল করিমের ঝাউতলা রোডস্থ বাসায় অবস্থান

করলাম। ডাঃ. এ. এম. মল্লিক তাঁর বাড়িতে আমাকে চায়ের নিমন্ত্রণ করলেন এবং সেখানে নূরুল আমিনের সঙ্গে আমার দেখা হলো। তাঁরা বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদকের জন্যে প্রার্থী হতে আমাকে অনুরোধ করলেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কাউন্সিলের সব থেকে বড় গ্রুপ ছিলো নূরুল আমিনের জেলা ময়মনসিংহ। ৩রা নভেম্বর সন্ধ্যায় মৌলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, হাবিবুল্লাহ বাহার এবং কুষ্টিয়ার এম. এস. আলী আমার সঙ্গে দেখা করে তাঁদের ঐকান্তিক সমর্থনের কথা জানালেন। পরবর্তীকালে মৌলানা তর্কবাগীশ আমাকে বলেছিলেন যে, সুহরাওয়ার্দী তাঁদের আমার সঙ্গে দেখা করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন।

খাজা নাজিমুদ্দীন বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি পদের জন্যে আমার মামা খান বাহাদুর আবদুল মোমিনের নাম প্রস্তাব করেছিলেন এই চিন্তা করে যে, মুসলিম লীগ কাউন্সিল মামা-ভাগিনেয়কে যুগপৎ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করতে রাজি হবে না। খাজা শাহাবুদ্দীনের পরামর্শক্রমে এটা ছিলো রাজনৈতিক দাবার একটি চতুর চাল। কিন্তু নাজিমুদ্দীন হতাশ হয়েছিলেন। কারণ আমার মামা আবদুল মোমিন যখন জানতে পারলেন যে, সাধারণ সম্পাদকের জন্য আমি পদপ্রার্থী তখন তিনি খাজার প্রস্তাবে অসম্মত হলেন। নাজিমুদ্দীন তখন হামিদুল হক চৌধুরীকে আমার বিরুদ্ধে নিযুক্ত করার কথা চিন্তা করলেন। হামিদুল হক চৌধুরী বাংলার রাজনীতিজ্ঞদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি ছিলেন যিনি নিজের জনপ্রিয়তা কিভাবে ক্ষুণ্ণ করতে হয় সে কৌশল জানতেন। তাই মুসলিম লীগের যুব নেতাদের মতিগতি লক্ষ্য করে খাজা সে চিন্তা ত্যাগ করে সাতক্ষীরার আবুল কাসেমকে নির্বাচন করলেন। কাউন্সিলের অধিবেশনের কয়েক ঘণ্টা পূর্বে ফজলুর রহমান, ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া) ও পাবনার আবদুল্লাহ আল মাহমুদ আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জানালেন যে, তাঁরা আমাকে সমর্থন করবেন স্থির করেছেন।

কলকাতা মুসলিম ইনস্টিটিউটের সভায় আমি বিকেলে উপস্থিত হলাম। নির্বাচনী সভায় সভাপতিত্ব করেন খান বাহাদুর আবদুল মোমিন। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মৌলানা আকরাম খান সভাপতি নির্বাচিত হলেন। সাধারণ সম্পাদকের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলাম আমি এবং খাজাদের মনোনীত আবুল কাসেম। সকল প্রশংসা আল্লাহর প্রাপ্য। আবুল কাসেম পেলেন মাত্র এগারোটি ভোট এবং আমি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে নির্বাচিত হলাম। অধিকাংশ কাউন্সিল সদস্যরা যাঁরা আমাকে ভোট দিয়েছিলেন তাঁদের কাছে ব্যক্তিগতভাবে আমি অপরিচিত ছিলাম। আমি মঞ্চের পেছনের দিকে একটি চেয়ারে বসেছিলাম। তাঁরা চাইলেন নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদককে তাঁরা দেখবেন। নওবাব হাবিবুল্লাহর ছোট ভাই নাসরুল্লাহ আমাকে মাইক্রোফোনের কাছে নিয়ে এলেন।

আমি কাউন্সিল সদস্যদের ধন্যবাদ জানিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলাম এবং ঘোষণা করলাম যে, আমি বাংলার মুসলিম লীগকে আমার সাধ্যমতো একটি ব্যাপক গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে সংগঠিত করব। নাজিমুদ্দীন এবং তাঁর মোসাহেবদের বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়নি যে, আমার বক্তৃতা ছিলো খাজাদের পকেট মুসলিম লীগকে নিশ্চিহ্ন করার সংকেত। নির্বাচনে আমার সাফল্য ছিলো একটা আশ্চর্য ব্যাপার।

## প্রাদেশিক মুসলিম লীগের দপ্তর ও পার্টি হাউস

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর আমি কলকাতায় আমার প্রধান কর্মকেন্দ্র স্থানান্তর করলাম কিন্তু আমার পরিবারের সদস্যরা পূর্বের ন্যায় বর্ধমানে রয়ে গেলেন। আমি ৬৪ নং লোয়ার সার্কুলার রোডের নীচের তলায় একটি কামরা ভাড়া নিলাম। এই বাড়িটি ছিলো আমার বড় বোন ও তাঁর সন্তানদের। আবদুস সামাদ নামক আমার এক বন্ধু ও আত্মীয় আমাকে স্বেচ্ছাপূর্বক সাহায্য করবার জন্য আমার সঙ্গে একই বাসায় থাকতেন এবং অবৈতনিক একান্ত সচিবের দায়িত্ব পালন করতেন। আমি কলকাতায় নিজের খরচায় থাকতাম, মুসলিম লীগ তহবিল থেকে কোনো ভাতা নিতাম না। কেবল আমার সফরের জন্য যেটুকু খরচ হতো শুধু সেইটুকুই আমি মুসলিম লীগের তহবিল থেকে গ্রহণ করতাম। আবদুস সামাদ আমার প্রতি খুবই অনুরক্ত ছিলেন, কলকাতায় থাকতে আমার যাতে কোনো অসুবিধা না হয় সে ব্যাপারে তিনি খুবই মনোযোগী ছিলেন এবং এতে তিনি খুব আনন্দ পেতেন। বর্ধমান জেলার শেকরতোড় গ্রামে তাঁর বাড়ি ছিলো। আমি সে সময় দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ হারাইনি তবে আমার দৃষ্টিশক্তির খুবই অবনতি হওয়ায় চলাফেরার ব্যাপারে অন্যের সহায়তার প্রয়োজন হতো। ১৯৪৩ সালের মাঝামাঝি আমি লেখাপড়ার কাজ করতে পারতাম না ফলে অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন হতো। কর্নেল কিরম্যান নামক একজন সুযোগ্য চক্ষু শল্যচিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করে জানলাম Retinitis pigmentosa নামক চক্ষুস্নায়ুর এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আমি ভুগছি। তিনি উপদেশ দিলেন লেখাপড়া যেন নিজে না করি এবং এ কাজের জন্য একজন সচিব রাখি।

প্রাদেশিক মুসলিম লীগের অফিস ছিলো ৩ নং ওয়েলেসলী ফার্স্ট লেনে। পূর্বে এটি সুহরাওয়ার্দীদের পারিবারিক বাসস্থান ছিলো এবং তাঁর পিতা বিচারপতি জাহিদুর রহিম জাহিদ সুহরাওয়ার্দী এই বাড়িতে থাকতেন। ১৯৩৭ সালে ফজলুল হক সাহেবের মন্ত্রিসভার সদস্য থাকার সময় সুহরাওয়ার্দী বাড়ি বদল করে ৪০ নং থিয়েটার রোডের বাড়িতে আসেন এবং ৩ নং ওয়েলেসলীর বাড়িটিতে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের অফিস হয়। বাড়িটি দ্বিতল বিশিষ্ট ছিলো।

মুসলিম লীগ অফিস দেখতে গিয়ে দেখলাম যে, নীচের তলায় একটি কামরায় মুসলিম লীগের অফিস এবং উপর তলায় একটি কামরায় অফিস সেক্রেটারী ফরমুজুল হক তাঁর পরিবার নিয়ে থাকেন। অবশিষ্ট ৮টি কামরা মুসলিম লীগের পার্লামেণ্টারী পার্টির কয়েকজন সদস্য দখল করে বাস করছিলেন। এঁরা উপর তলার বড় কামরাটিকে খাবার ঘর হিসাবে ব্যবহার করতেন। নীচের তলার অফিস ঘরটিতে দেখলাম দুটি টেবিল, কয়েকটি চেয়ার, একটি টাইপ মেশিন এবং নথিপত্র ইত্যাদির জন্য একটি আলমারি রয়েছে। অফিস সেক্রেটারীকে সাহায্য করার জন্য ছিলেন একজন কেরানী ও একজন টাইপিস্ট। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের এই ছিলো অফিস। বরিশাল জেলার ভোলার অধিবাসী ফরমুজুল হক ছিলেন একজন উচ্চশিক্ষিত ভদ্র যুবক।

প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন মির্জা আহমদ ইস্পাহানীর ছোট ভাই মির্জা হাসান ইস্পাহানী। তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য ছিলেন। মুসলিম লীগের একজন কোষাধ্যক্ষ ছিলেন বটে কিন্তু কোষাগার ছিলো না, কেন না তহবিল বলতে মুসলিম লীগের কিছুই ছিলো না।

মুসলিম লীগের পার্লামেণ্টারী নেতারা অর্থাৎ খাজা নাজিমুদ্দীন, খাজা শাহাবুদ্দীন, সুহরাওয়ার্দী, ফজলুর রহমান, এঁরা ব্যক্তিগতভাবে মুসলিম লীগের চাঁদা আদায় তার তত্বাবধান ও ইচ্ছানুযায়ী ব্যয় করতেন। মাসের প্রথমে অফিস সেক্রেটারী ফরমুজুল হক সুহরাওয়ার্দীর দ্বারস্থ হয়ে তাঁর নিজের খোরাকির টাকা, টেলিফোন, ইলেকট্রিক বিল, টাইপিস্ট ও কেরানীর বেতন এবং অন্যান্য খুচরা খরচের অর্থ প্রার্থনা করতেন। আমার পূর্বসূরী হোসেন শহীদ সুহরাওয়ার্দীকে মুসলিম লীগ অফিস রক্ষণাবেক্ষণের জন্য টাকার ব্যবস্থা করতে হতো। আমার সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের এটাই ছিলো প্রকৃত অবস্থা।

টেলর হোস্টেলের বোর্ডাররা আমার সম্মানে এক অভ্যর্থনার আয়োজন করেন, খাজা নাজিমুদ্দীন ও কবি গোলাম মোস্তফা সেই অভ্যর্থনায় উপস্থিত ছিলেন। হোস্টেলের সুপারিনটেনডেন্ট মৌলানা খালেক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। বিচারপতি আবদুল হাকিম খান তখন ছিলেন ছাত্র ও টেলর হোস্টেলের বোর্ডার। তিনি বোর্ডারদের তরফ থেকে অভ্যর্থনার জন্য যথাবিধি আমাকে আমন্ত্রণ জানান।

১৯৪৩ সালে ১৮ই নভেম্বর বর্ধমানের মুসলিম সম্প্রদায় টাউন হলে একটি সভা করে আমাকে বেশ কিছু মানপত্র প্রদান করেন। প্রত্যুত্তরে আমি আন্তরিকভাবে ও গুরুত্ব সহকারে বলেছিলাম যে, মুসলিম লীগ মুসলমানদের প্রতিষ্ঠান, কিন্তু ধর্ম, বর্ণ ও রাজনৈতিক মতবাদ নির্বিশেষে সকলের সুযোগ-সুবিধা রক্ষণাবেক্ষণে মুসলিম লীগ বদ্ধপরিকর। মুসলমানদের তাগিদ জানিয়ে বলেছিলাম যে,"আপনারা শহর নগর-গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ুন এবং আপনাদের ভাই বোনদের সংগঠিত করে তাদের

অন্তরে ইসলামের মৌলিক বিষয়ের উপর আলোকপাত করুন। মানবতার কল্যাণে ও সত্যের পথে নিজেদের নিয়োজিত রেখে সকল নারী পুরুষের অন্তর জয় করুন এবং আপনাদের সমস্ত সম্পদ আল্লাহর উদ্দেশে উৎসর্গ করুন।" ১৯৪৩-এর ১৯শে নভেম্বরের মর্নিং নিউজে এই অনুষ্ঠানের খবর প্রচারিত হয়েছিলো।

বাংলার কোনো জেলাতে মুসলিম লীগের কোনো অফিস ছিলো না। কলকাতা মুসলিম লীগের কর্ণধার ছিলেন রাগিব আহসান এবং সাধারণ সম্পাদক ছিলেন ওসমান। পরবর্তীকালে ওসমান সাহেব কলকাতা করপোরেশনের মেয়র হয়েছিলেন। বর্ধমান মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন আলী হোসেন বি. এল., আমার মাতুল মৌলবী আবদুস সামাদের দ্বিতীয় পুত্র এম. এ. বাসেত ছিলেন সহকারী সম্পাদক ও আমি ছিলাম সভাপতি। আসানসোলে মুসলিম লীগের একটি ভালো অফিস ছিলো এবং মৌলবী মহাম্মদ ইয়াসিন ছিলেন সম্পাদক ও মৌলানা আবদুস সাত্তার সভাপতি। অন্যান্য জেলা ও মহকুমায় বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি ও কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যরা আঞ্চলিক নেতৃবর্গের বৈঠক-খানাতেই নির্বাচিত অথবা মনোনীত হতেন।

ঢাকা মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন খাজা শাহাবুদ্দীন এবং তাঁর মামাতো ভাই সৈয়দ আবদুস সেলিম ছিলেন সম্পাদক। ঢাকা জেলা মুসলিম লীগ প্রকৃত অর্থে ঢাকা নওবাব পরিবারের প্রধান নিবাসস্থল আহসান মনজিলের চার দেওয়ালের গণ্ডীতে আবদ্ধ ছিলো। আরও স্পষ্টভাবে বলতে গেলে, বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ আহসান মনজিলের খাজাদের পকেটভুক্ত ছিলো। ঢাকা নওবাব পরিবারের ন'জন সদস্য ছিলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য। এঁরা হলেন নওবাব হাবিবুল্লাহ ও তদীয় ভ্রাতা নাসরুল্লাহ,খাজা নাজিমুদ্দীন, খাজা শাহাবুদ্দীন ও তাঁর স্ত্রী ফরহাদ বানু, খাজা নূরুদ্দীন, সৈয়দ আবদুল হাফিজ, সৈয়দ আবদুস সেলিম এবং সৈয়দ সাহেবে আলম। পূর্ববঙ্গে ঢাকার নওবাব পরিবার এক অনন্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

মুসলিম লীগের মধ্যে সুহ্‌রাওয়ার্দী সব চেয়ে বেশি যোগ্যতাসম্পন্ন নেতা ছিলেন। তথাপি তাঁকে এমন পরিস্থিতির মধ্যে কাজ করতে হতো যা তাঁকে খাজাদের প্রতি রাজনৈতিক আনুগত্য বজায় রাখতে বাধ্য করত। খাজা পরিবারে খাজা শাহাবুদ্দীন সব চেয়ে চতুর ব্যক্তি ছিলেন। শ্যামা-হক মন্ত্রিত্বের পতনের পর মুসলিম লীগ সরকার খাজা নাজিমুদ্দীনের নেতৃত্বে পুনর্বহাল হলো এবং তিনি ছোট ভাই খাজা শাহাবুদ্দীনকে তাঁর মন্ত্রিপরিষদে অন্তর্ভুক্ত করলেন। আমি সুহ্‌রাওয়ার্দীকে অনুরোধ করলাম তিনি যাতে তাঁর প্রভাব খাটিয়ে মন্ত্রিপরিষদ থেকে নিজের ভাইকে বাদ দেওয়ার জন্যে খাজা নাজিমুদ্দীনকে রাজি করান। আমি খুবই মর্মাহত ও আশ্চর্য হলাম যখন সুহ্‌রাওয়ার্দী বললেন, "তুমি বল কি? আমি খাজা শাহাবুদ্দীনকে বাদ দিয়ে পার্লামেণ্টারী রাজনীতির কথা চিন্তাই করতে পারি না।"

সেই মুহূর্তে আমি স্থির করলাম যে, যদি কখনো সুযোগ পাই তাহলে খাজা শাহাবুদ্দীনের তথাকথিত প্রতিভা যাচাই করব।

বঙ্গীয় আইনসভার কক্ষে একদিন আমি মেকিয়াভেলির 'প্রিন্স' পড়ছিলাম। খাজা শাহাবুদ্দীন জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি পড়ছি? যখন তিনি শুনলেন আমি 'প্রিন্স' পড়ছি তখন তিনি বললেন, মেকিয়াভেলিতে আমি কিভাবে আকৃষ্ট হতে পারি। তখনই বুঝলাম আমি ঠিকই অনুমান করেছিলাম যে, মেকিয়াভেলির 'প্রিন্স' খাজার নিকট আল কোরান এবং খাজা মেকিয়াভেলিকে তার দিগ্‌দর্শন হিসাবে ব্যবহার করে থাকেন। এটা ছিলো আমার বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার কিছুকাল আগের কথা। আমি ভালোমতো মেকিয়াভেলি পড়লাম, যা পরবর্তীকালে রাজনৈতিক বিরোধিতায় খাজা শাহাবুদ্দীন কি পন্থা অবলম্বন করতে পারেন সেটা অনুমান করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিলো।

আমি গভীর আগ্রহের সঙ্গে মুসলিম লীগকে একেবারে গোড়া থেকে সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করলাম। শুরুতেই আমি বিজ্ঞপ্তি ও ইস্তাহার ছাপিয়ে জেলা নেতৃত্বকে নির্দেশ দিতে লাগলাম কিভাবে তাঁদের জেলাসমূহে মুসলিম লীগকে সংগঠিত করতে হবে। প্রত্যেকটি জেলার নেতৃবর্গকে জেলা ও মহকুমায় মুসলিম লীগ অফিস ও পার্টি হাউস স্থাপন করার জন্যে নির্দেশ দিলাম। আমি পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিলাম যে, কোনো জেলা মুসলিম লীগ, প্রাদেশিক মুসলিম লীগের অন্তর্ভুক্তির অনুমোদন পাবেন না যদি তাঁরা আমার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ না করেন।

সে সময় কাগজের খুবই ঘাটতি ছিলো। সদস্য রশিদ বই ছাপানোর জন্যে মন্ত্রিপরিষদ আমাকে কাগজ সংগ্রহের অনুমতি প্রদানে অনীহা প্রকাশ করেন। আমার জনৈক কম্যুনিস্ট বন্ধু দৈনিক আজাদ থেকে কালোবাজারে প্রয়োজন মতো কাগজ ক্রয় করার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করলেন। প্রতিদিন কুড়ি হাজার পত্রিকা ছাপার জন্য দৈনিক আজাদের প্রচুর কাগজের অনুমতিপত্র ছিলো। আজাদের প্রকৃত বিক্রির সংখ্যা ছিল পাঁচ হাজারের মতো এবং অবশিষ্ট (উদ্বৃত্ত) কাগজ কালো বাজারে বিক্রি করা হতো। যাই হোক, পাঁচ লক্ষাধিক সদস্য পদের রশিদ বই ছাপানো ও সেগুলো সারা বাংলাদেশে বিলি করা হয়। প্রাদেশিক মুসলিম লীগের অফিস থেকে প্রতিটি কর্মীকে সদস্য পদের তালিকাভুক্তির জন্যে রশিদ বই দেওয়া হতো। প্রাদেশিক মুসলিম লীগের অফিস থেকে যাঁরা রশিদ বই সংগ্রহ করতেন তাঁদের নাম প্রতিটি জেলার জেলা মুসলিম লীগকে জানিয়ে দেওয়া হতো। সদস্য চাঁদা থেকে প্রাদেশিক অংশের পাওনা মিটিয়ে সকলকে প্রাদেশিক অফিস থেকে রশিদ বই সংগ্রহ করতে হতো।

আইনসভায় মুসলিম লীগ সদস্যরা যাঁরা প্রাদেশিক মুসলিম লীগ অফিসে

থাকতেন তাঁদের অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে আমি পার্লামেণ্টারী পার্টির নেতা খাজা নাজিমুদ্দীনকে অনুরোধ করলাম। মুসলিম লীগ অফিস ও পার্টি হাউসের জন্যে সব কামরাগুলি আমার প্রয়োজন ছিলো। তাঁরা আমার অনুরোধ রক্ষা করেন এবং মুসলিম লীগ পার্লামেণ্টারী পার্টির ভদ্রমহোদয়গণ মুসলিম লীগ অফিস খালি করে দেন।

১৯৪৪ সালে জানুয়ারী মাসের এক সন্ধ্যায় মৌলানা আকরাম খান ও তাঁর পুত্র খায়রুল আনম আমার বাসভবনে এসে আমাকে তাঁদের গাড়িতে করে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক অফিসে নিয়ে গেলেন। সেখানে সি. পি. আই.-এর সাধারণ সম্পাদক মিঃ. পি. সি. যোশীকে আমি প্রথম দেখলাম। মৌলানা কম্যুনিস্ট পার্টির নেতার সঙ্গে হৃদ্যতার সঙ্গে আলাপ করলেন। কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে এটি ছিলো আমার দ্বিতীয় যোগাযোগ। বঙ্গীয় কম্যুনিস্ট পার্টির নেতারা মুসলিম লীগকে ব্যাপক গণতান্ত্রিক এবং প্রগতিশীল রাজনৈতিক পার্টি হিসাবে সংগঠিত করার ব্যাপারে তাঁদের সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করলে আমরা তা ধন্যবাদের সঙ্গে গ্রহণ করলাম। এভাবে কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে আমার যোগাযোগ শুরু হলো। পরবর্তীকালে ঐ বছরই দৈনিক আজাদে মৌলানার লিখিত 'আবুল হাসিম' শীর্ষক একটি সম্পাদকীয়তে তিনি আমাকে কম্যুনিস্ট ও কাদিয়ানী বলে উল্লেখ করেন।

খাজা নাজিমুদ্দীন ও তাঁর মোসাহেবরা একাধারে আমার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করতেন এবং মুসলিম লীগের তিনটি পত্রিকা 'আজাদ' 'মর্নিং নিউজ' ও 'স্টার অব ইণ্ডিয়া' প্রতিদিন আমার উপর অগ্নিবর্ষণ করত। এটা ছিলো ভাগ্যের পরিহাস। মুসলিম লীগ সরকার এবং পত্রিকাগুলি বঙ্গীয় মুসলিম লীগের এমন একজন সাধারণ সম্পাদকের বিরুদ্ধাচারণ করত যে মুসলিম লীগকে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক পার্টি হিসাবে সংগঠিত করতে আন্তরিক নিষ্ঠার সঙ্গে সচেষ্ট ছিলো। ১৯৪৩-এর ৭ই নভেম্বর আমি সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার পর যে নীতি ঘোষণা করেছিলাম সেই অনুসারে মুসলিম লীগকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে প্রতিরোধ সৃষ্টির ব্যাপারে সুহরাওয়ার্দী সক্রিয়ভাবে খাজা নাজিমুদ্দীন ও তাঁর দলের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে নিজেকে জড়িত রাখেননি। খাজা নাজিমুদ্দীন ও তাঁর প্রধান উপদেষ্টা খাজা শাহাবুদ্দীন পার্টি গভর্নমেণ্ট পছন্দ করতেন না। অন্যভাবে বলা যায় তাঁরা চাইতেন না যে, সরকার পার্টির নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলুক। নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁরা চাইতেন একটি গভর্নমেণ্ট পার্টি, যে পার্টি পার্লামেণ্টারী নেতৃত্বের অধীনস্থ থাকবে। কারণ তাঁরা চাইতেন, রাজনৈতিক বক্তৃতাবাজির দ্বারা মুসলিম লীগ সরকারের পক্ষে মুসলিম জনমতকে নিয়ন্ত্রণ করতে। কিন্তু তাঁরা একটি সংগঠিত মুসলিম লীগ পছন্দ করতেন না, এটাই ছিলো আমার এবং খাজাদের মধ্যে দ্বন্দ্বের মূল কারণ। যখন এই অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে দেখা দিলো তখন

ডাঃ. এ.এম. মল্লিক, ফজলুর রহমান ও ইউসুফ আলী চৌধুরী আমাকে ত্যাগ করে মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন ও তাঁর দলে যোগদান করলেন। আমি মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এমনভাবে সংগ্রাম পরিচালনার কথা স্থির করলাম যা মুসলিম লীগকে দুর্বল করার পরিবর্তে অধিক শক্তিশালী করে তুলবে। আল্লাহর অপার মহিমায় আমি কৃতকার্য হয়েছিলাম।

পার্লামেণ্টারী ক্ষমতার রাজনীতিতে আমি একেবারেই আগ্রহী ছিলাম না এবং কখনও খাজা নাজিমুদ্দীনের পার্লামেণ্টারী নেতৃত্বে হস্তক্ষেপ করিনি। বঙ্গীয় আইনসভার প্রতিটি অধিবেশনে মন্ত্রিত্বের রদবদলের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত চলত। গভর্নমেণ্ট পার্টির কিছুসংখ্যক ব্যক্তি কোনো না কোনো ব্যক্তির সমর্থনে মন্ত্রিত্বের রদবদলের ব্যাপারে কানাঘুষা প্রচারণায় সবসময় নিজেদের লিপ্ত রাখতেন। গভর্নমেণ্ট পার্টির কিছুসংখ্যক ব্যক্তিকে নগদ টাকা উৎকোচ দেওয়া হতো এবং অন্য প্রকারে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা হতো। স্বজনপ্রীতি ও অনুগ্রহ খাজা নাজিমুদ্দীনের ক্ষমতার রাজনীতিতে কার্যনির্বাহের পদ্ধতি ছিলো। কংগ্রেসের বিরোধী দলের আশীজন সদস্য এই পরিস্থিতি খুবই মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করেন এবং সরকারী দলের শৃঙ্খলা বিনষ্ট করার জন্যে উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষায় থাকতেন।

কানাঘুষা প্রচারণার ব্যাপারে ইউসুফ আলী চৌধুরী ছিলেন অদ্বিতীয়। যাই হোক, তিনি তাঁর প্রতিভাকে খাজা নাজিমুদ্দীন ও তাঁর দলের অনুকূলে কাজে লাগাতেন। সরকারী সমর্থন বজায় রাখার জন্যে পার্লামেণ্টারী পার্টির কিছুসংখ্যক অবাধ্য ও উচ্ছৃঙ্খল লোকজনদের সুযোগ সুবিধা বিতরণ করার দায়িত্ব ছিলো খাজা শাহাবুদ্দীন ও ফজলুর রহমানের। মুসলিম লীগের পার্লামেণ্টারী দলের নেতৃবর্গের মধ্যে খাজা শাহাবুদ্দীন, মেসার্স ফজলুর রহমান, ইউসুফ আলী চৌধুরী এবং নোয়াখালীর হামিদুল হক চৌধুরীদের জনগণের সঙ্গে কোনো সংযোগ ছিলো না। কিন্তু তাঁরা খাজা নাজিমুদ্দীনকে ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপে সহায়তা প্রদানের দ্বারা নিজেদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রেখেছিলেন এবং দলীয় সংহতি বজায় রাখতে গিয়ে দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে খাজা সাহেবের পরামর্শদাতা ও পথপ্রদর্শক হিসাবে কাজ করতেন। ক্ষমতার রাজনীতির এই খেলায় আমার কোনো উৎসাহ ছিলো না। সংসদভবনের অন্তরালে আমি নিশ্চিন্তে খাজা নাজিমুদ্দীন ও তাঁর মন্ত্রিপরিষদকে সমর্থন করতাম। খাজা নাজিমুদ্দীনের পার্লামেণ্টারী ক্ষমতার রাজনীতিতে আমার পক্ষ থেকে অসুবিধে বা আশঙ্কার কোনো কারণ ছিলো না।

আমার কাজ ছিলো মাতৃসংগঠন মুসলিম লীগকে সংগঠিত ও শক্তিশালী করা। আমার বক্তৃতা ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবৃতিতে আমি কোনো দিন আমাদের অন্তর্দ্বন্দ্বকে প্রকাশ করতাম না। আমার প্রতিপক্ষরাও একই নীতি অনুসরণ করতেন। ফলে আমাদের মুসলিম লীগ দলীয় রাজনীতিতে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিলো তা কখনও

প্রকাশ্য কেলেঙ্কারিতে পরিণত হয়নি এবং আমাদের পারস্পরিক ব্যক্তিগত সম্পর্কও অটুট ছিলো। সর্বসাধারণের কাছে আমি ১৯৪০-এর লাহোর প্রস্তাবের যথার্থতা ও যৌক্তিকতা প্রচার করতাম এবং মুসলিম লীগকে একটি গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল হিসাবে গড়ে তুলতে তাগিদ জানাতাম। লাহোর প্রস্তাবের উপর আমার বক্তব্যে কোথাও সাম্প্রদায়িকতার আভাস ছিলো না। ইসলামের একজন অতি উৎসাহী প্রচারক হিসাবে আমি মুসলিম লীগ মঞ্চ থেকে ইসলামের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক মূলনীতিসমূহ এবং সেগুলো হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর নেতৃত্বে ইসলামের খেলাফতে কিভাবে সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিফলিত হয়েছিলো তা প্রচার করতাম। এর দ্বারা বাংলার মুসলিম যুবসমাজ উদ্বুদ্ধ হয়েছিলো এবং তারা ১৯৪৪ সালে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের পাঁচ লক্ষাধিক দুই আনার সদস্য তালিকাভুক্ত করতে সমর্থ হয়েছিলো। এ বছরে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ তার সদস্য পদের ফি বাবদ নগদ পনেরো হাজারেরও অধিক টাকা জনসাধারণের নিকট থেকে সংগ্রহ করেছিলো।

প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির সভা আহুত এবং অনুষ্ঠিত হতো খাজা নাজিমুদ্দীনের বাসভবনে। মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার পর সর্বপ্রথম আমি কার্যনির্বাহী কমিটির সভা আহ্বান করি মুসলিম লীগের অফিস ৩ নং ওয়েলেসলী ফার্স্ট লেনে।

এবার মুসলিম লীগ অফিসের উপর তলার বড় কামরাটার দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। পূর্বেই বলেছি, এই বড় কামরাটিতে ছিলো একটি টেবিল, ছ'টি ফোল্ডিং চেয়ার ও কামরার এককোণে উপরের ছাদ থেকে ঝোলানো পনেরো পাওয়ারের বিজলী বাতি। এ কামরাটি আইনসভার মুসলিম লীগ সদস্যরা, যাঁরা সেখানে থাকতেন, খাবার ঘর হিসাবে ব্যবহার করতেন। তাঁরা দৈনিক আজাদের পুরাতন কপিসমূহকে টেবিলের আচ্ছাদন হিসাবে ব্যবহার করতেন। বর্তমানে এই ঘরটি কমিটি কক্ষে পরিণত হলো। কার্যনির্বাহী কমিটির সভা এই কক্ষেই অনুষ্ঠিত হতো। সাতাশজন সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের বসবার ব্যবস্থা করতে অফিস সেক্রেটারী ফরমুজুল হককে প্রতিবেশীদের নিকট থেকে চেয়ার ধার করে আনতে হতো। যখন সদস্যদের নিকট কোনো নথিপত্র অথবা কাগজপত্র পড়ে শোনাতে হতো তখন হামিদুল হক চৌধুরী সেটা পনেরো পাওয়ারের বিজলী বাতির কাছে নিয়ে গিয়ে পড়ে শোনাতেন।

বাগেরহাটের মোতাহরুল হক, যিনি সম্পর্কে আমার এক রকম আত্মীয় হতেন, তখন রংপুরের সাব ডিভিশনাল অফিসার ছিলেন। আমি তাঁকে মুসলিম লীগ অফিসের কমিটি কক্ষটিকে সজ্জিত করার জন্য কিছু অর্থ সংগ্রহের অনুরোধ করলাম। তিনি তিন হাজার টাকা সংগ্রহ করে সেই অর্থ থেকে তিনটি ভালো পালিশ করা সেগুনকাঠের টেবিল, বই রাখার জন্যে দুটি আলমারি

ও সাতাশটি চেয়ার তৈরী করিয়েছিলেন। বেনজীর আহমদ যিনি কবি বেনজীর নামে সমধিক পরিচিত, তিনি ছ'টি সুন্দর আবরণ বিশিষ্ট বিজলী বালবের ঝাড় বাতি (chandelier) দান করেছিলেন। অফিস সেক্রেটারী ফরমুজুল হক দান করেছিলেন একটি ঘড়ি। ইসলামের উপর বিখ্যাত বইপত্র, খোলাফায়ে রাশেদীনের ইতিহাস এবং মুসলিম আরবদের ইতিহাস সম্বলিত পুস্তিকা সংগ্রহ করে কামরাটিতে রাখা হয়েছিলো। মুসলিম লীগের সভাপতি, যিনি কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করতেন, তাঁর জন্যে তৈরী করা হয়েছিলো একটি সুন্দর উঁচু গদিচেয়ার। কমিটি কক্ষটি দেখতে এবার বেশ মর্যাদাপূর্ণ হলো। টেবিল চেয়ার ছাড়াও আমরা কিছুসংখ্যক কাঠের তক্তপোষ ক্রয় করেছিলাম এবং সেগুলো পূর্বে পার্লামেণ্টারী দলের সদস্যরা যে ঘরগুলিতে থাকতেন সেখানে রাখা হয়েছিলো। জেলা থেকে যেসব মুসলিম লীগ কর্মীরা কলকাতায় আসতেন কামরাগুলি তাঁদের জন্যে খোলা রাখা থাকত। এভাবে মোটামুটি সজ্জিত মুসলিম লীগের একটি অফিস ও পার্টি হাউস করা হলো। এখানে বলে রাখা দরকার যে, যখন থেকে আমি মুসলিম লীগ সংগঠনের দায়িত্ব নিয়েছিলাম তখন থেকেই মুসলিম লীগের জন্যে পার্লামেণ্টারী নেতৃবৃন্দের নিকট অথবা তাঁদের মারফৎ কোনো অর্থ আদায় করিনি। মুসলিম লীগ পার্টিকে সত্যিকার গণতান্ত্রিক রূপ দিতে গেলে তাকে পার্লামেণ্টারী নেতৃ-বৃন্দের থেকে অর্থ নৈতিক দিক দিয়ে স্বাধীন রাখার প্রয়োজন ছিলো।

আমার স্কুল জীবন থেকে আমি কখনও ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলাম না। সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার পরও আমি সেই একই দৃষ্টিভঙ্গী বজায় রেখেছিলাম।

মুসলিম ছাত্র লীগ নামে মুসলিম ছাত্রদের একটি প্রতিষ্ঠান ছিলো। আমি বাংলার মুসলিম যুবকদের মুসলিম লীগের পতাকাতলে মুসলমানদের সংগঠিত করার কাজে আমাকে সাহায্য প্রদানের আবেদন জানালাম। এই আবেদন সাধারণভাবে ছিলো শিক্ষিত যুবকদের প্রতি, যারা ছাত্র শুধু তাদের প্রতি নয়। ধীরে ধীরে হাজার হাজার মুসলিম যুবক মুসলিম লীগের কর্মীদলে যোগদান করে, এদের অধিকাংশই ছিলো ছাত্র। মুসলিম ছাত্র লীগ বিভিন্ন শিবিরে বিভক্ত ছিলো এবং প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা দখল করার জন্যে তারা পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকত। নীতিগতভাবে মুসলিম ছাত্র লীগের অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে আমি নিজেকে পৃথক রেখেছিলাম।

তখন বাংলায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেবলমাত্র এই দুটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিলো। স্বাভাবিকভাবে কলকাতা ও ঢাকা বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের কেন্দ্রস্থল ছিলো। কলকাতায় যেসব মুসলিম যুবকরা শিক্ষাদীক্ষা সংক্রান্ত অথবা অন্যান্য পেশায় নিযুক্ত ছিলেন পশ্চিম ও উত্তর বাংলার রাজনীতি-সচেতন মুসলিম যুবকদের উপর তাঁদের যথেষ্ট প্রভাব ছিলো, অনুরূপভাবে ঢাকার মুসলিম

যুবকদের প্রভাব ছিলো পূর্ববঙ্গের যুবকদের উপর। প্রাদেশিক মুসলিম লীগ অফিস ও পার্টি হাউস বাংলার সেইসব মুসলিম যুব নেতৃবৃন্দের মিলনকেন্দ্র ছিলো যাঁরা আমার কর্মী হিসাবে যোগদান করেছিলেন। মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ ও কর্মী যাঁরা মুসলিম লীগে আমার প্রবর্তিত গণমুখী নীতিকে গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা বিভিন্ন জেলা থেকে কলকাতায় এলে পার্টি হাউসেই থাকতেন।

নূরুদ্দীন আহমেদ, সালেহ আহমেদ, বরিশালের আবদুর রহমান, খুলনার মহাম্মদ ইকরামুল হক ও শেখ আবদুল আজিজ, যশোহরের আবদুল হাই ও মোশারফ খান, রাজশাহীর আবুল হাসনাত, মহাম্মদ কামরুজ্জামান, আতাউর রহমান, মোজাম্মেল হক, মহাম্মদ মহবুবুল হক ও আবদুর রশীদ খান, ফরিদপুরের শেখ মুজিবর রহমান, বগুড়ায় বি. এম. ইলিয়াস ও শাহ আবদুল বারি, রংপুরের আবুল হোসেন, পাবনার মহাম্মদ আবদুর রফিক চৌধুরী, নদীয়ার ফকির মহাম্মদ ও মহাম্মদ সোলায়মান খান, দিনাজপুরের মহাম্মদ দবিরুল ইসলাম, চট্টগ্রামের মাহবুব আনোয়ার, ইসলামিয়া কলেজ ইউনিয়নের সহ-সভাপতি শাহাবুদ্দীন এবং কলকাতার জহীরুদ্দীন এঁরা কলকাতা কেন্দ্রের যুব মুসলিম কর্মীদের নেতা ছিলেন। কামরুদ্দীন আহমেদ, টাঙ্গাইলের শামসুল হক, ঢাকার কাজী মহাম্মদ বশির, ইয়ার মহাম্মদ, শামসুদ্দীন আহমেদ, মহাম্মদ শওকত আলী, এ কে. আর. আহমেদ, মসিহুদ্দীন আহমেদ (রাজা মিয়া), আলমাস আলী, আউয়াল এবং তাজউদ্দীন আহমেদ, কুমিল্লার খন্দকার মোস্তাক আহমেদ ও অলি আহাদ এবং নোয়াখালীর মহাম্মদ তোয়াহা ও নজমুল করিম, এঁরা ঢাকা কেন্দ্রের নেতা ছিলেন। কামরুদ্দীন আহমেদ আরমানিটোলা সরকারী উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ঢাকার মুসলিম যুবকদের নেতা ছিলেন।

বর্তমানে পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি হামুদুর রহমানের নেতৃত্বে ২৪ পরগণার আনোয়ারুল হক, শাহ আজিজুর রহমান এবং বাংলার কিছুসংখ্যক স্বার্থপর, প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম যুবক খাজা নাজিমুদ্দীন এবং তাঁর গোষ্ঠীকে সমর্থন করতেন। শাহ আজিজুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। আমি তাঁকে প্রথম দেখি ১৯৪৪ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে ঢাকায়, ডাঃ. মইজউদ্দীনের বাড়িতে। ঢাকায় শিক্ষা শেষ করে তিনি রাজনীতিকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করে কলকাতায় কর্মকেন্দ্র স্থানান্তর করেন। কানাঘুষা প্রচারণার মাধ্যমে তিনি আমাকে কম্যুনিস্ট বলে দোষারোপ করতেন কিন্তু আমার সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনায় আমার আদর্শের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করতেন। খুলনার আবদুস সবুর খান এই যুবদলের মধ্যে ছিলেন এবং শাহ আজিজুর রহমানের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

যাই হোক, আবদুস সবুর খান শহীদ সুহরাওয়ার্দীরও অন্যতম প্রিয়পাত্র ছিলেন। আবদুস সবুর খানের মতে আমি ছিলাম একজন কম্যুনিস্ট ও বাংলার

সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে আমার গোপন সম্পর্ক ছিলো। খাজা নাজিমুদ্দীন মনে করতেন, আমি ইসলামকে আশ্রয় করে কম্যুনিজম প্রচার করি। আমার মতাদর্শের সঙ্গে সুহরাওয়ার্দীর কোনো সম্পর্ক ছিলো না। একবার তিনি আমাকে বলেছিলেন, "হাশেম আদর্শের প্রতি এত নিষ্ঠা আমার মনঃপূত নয়; আদর্শ আমার কর্ম-জীবনে কখনও কোনো কাজে আসেনি।" আর একবার বলেছিলেন, "হাশেম তুমি ভাগ্যবান, তুমি কোনো একটা আদর্শে বিশ্বাস কর, কিন্তু আমি কোনো আদর্শে বিশ্বাস করি না।" ক্ষমতার রাজনীতির জন্য যা প্রয়োজন সেটাই করা ছিলো সুহরাওয়ার্দীর রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের মূল নীতি। খাজা নাজিমুদ্দীনের মতো সুহরাওয়ার্দী প্রতিহিংসাপরায়ণ ছিলেন না। সাধারণভাবে তিনি খুবই উদারপন্থী ছিলেন এবং অন্যের মতের প্রতি অসহিষ্ণু ছিলেন না। খাজা নাজিমুদ্দীন একজন অতীব ভদ্রলোক ছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিনি বুদ্ধিমান ছিলেন না এবং তাঁর মধ্যে দয়া মমতা বলতে কিছু ছিলো না। খাজা শাহাবুদ্দীন ছিলেন তাঁর ভালোমন্দের বিচারক, পথপ্রদর্শক ও জ্ঞানদাতা। খাজা নাজিমুদ্দীনকে যেসব যুবক ও ছাত্ররা সমর্থন করত, যারা মুসলিম লীগকে জনসাধারণের একটি রাজনৈতিক দল হিসাবে গড়ার আন্দোলনের বিরোধিতা করত ফজলুর রহমান তাদের তত্ত্বাবধান করতেন।

## প্রাদেশিক মুসলিম লীগের আর্থিক নীতি

কিছুদিন পর পর আমার সার্কুলার ও বুলেটিনে আমি এই মর্মে নির্দেশ দিতাম যে মুসলিম লীগের উপর থেকে নীচ পর্যন্ত প্রত্যেকটি স্তরকে তার উর্ধ্বতন স্তর থেকে আর্থিক দিক দিয়ে স্বাধীন থাকতে হবে। ইউনিয়ন লীগের প্রয়োজনীয় তহবিল এবং জিনিসপত্র মুসলিম লীগের স্থানীয় সদস্য, সমর্থক এবং বন্ধু-বান্ধবদের নিকট থেকে তাঁরা যেন সংগ্রহ করেন। জেলা ও মহকুমা মুসলিম লীগ ইউনিটও যেন একইভাবে কাজ করেন। তাঁরা যেন তহবিলের জন্যে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের মুখাপেক্ষী না থাকেন। তহবিল সংগ্রহের সময় সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যেন বিশেষ কোনো শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত কোনো গ্রূপ অথবা বিশেষ কোনো ব্যক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল না হতে হয়।

প্রাদেশিক মুসলিম লীগ একই পন্থা অবলম্বন করেছিলো। নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক মুসলিম পার্লামেণ্টারী পার্টির সদস্যকে মাসিক পাঁচ টাকা চাঁদা দিতে হতো। তাঁরা পদাধিকার বলে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সদস্য ছিলেন। পার্লামেণ্টারী পার্টির ভদ্রমহোদয়গণ তাঁদের এ দায়িত্ব পালন করতেন না। নিয়ম অনুসারে বরখেলাপকারিরা কাউন্সিলের সভায় উপস্থিত থাকতে পারতেন না। পার্লামেণ্টারী পার্টির সদস্য হিসাবে দেয় মাসিক চাঁদা ছাড়া অন্য কোনো চাঁদা তাঁদের কাছ থেকে আমি পাইনি। মাঝে মাঝে আমি প্রত্যেক পার্লামেণ্টারী পার্টির সদস্যদের দেয় চাঁদার কথা স্মরণ করিয়ে দিতাম। যখনই কাউন্সিলের সভা আহুত হতো তখনই

আমি টাঙ্গাইলের শামসুল হককে কিছুসংখ্যক সহকর্মীসহ কাউন্সিল সদস্যদের বকেয়া মাসিক চাঁদা সংগ্রহের জন্যে দাঁড় করিয়ে রাখতাম। বরখেলাপকারিদের সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্যে প্রবেশপত্র দেওয়া হতো না। শামসুল হক ও সহকর্মীরা সভাকক্ষের ঠিক প্রবেশ পথে বরখেলাপকারিদের তালিকা ও প্রবেশপত্র নিয়ে বসে থাকতেন।

প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কাউন্সিল সভা শুরু হওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগে আইনসভার কক্ষে মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন তাঁর সম্পূর্ণ বকেয়া টাকা আমাকে পরিশোধ করেছিলেন। মুসলিম ইনস্টিটিউটে, যেখানে কাউন্সিলের সভা শুরু হয়েছিলো সেখানে কিছুক্ষণ আগে আমি এসে পৌঁছেছিলাম। খাজা নাজিমুদ্দীন আমাকে যে টাকা দিয়েছিলেন সেটা আমি শামসুল হককে দিতে ভুলে গিয়ে সভাকক্ষে প্রবেশ করলাম। খাজা যখন সভায় উপস্থিত হলেন তখন প্রবেশ দ্বারে তাঁকে বাধা দেওয়া হলো। আমাকে বলা হয়েছিলো যে, শামসুল হক তাঁকে বলেন, "স্যার আপনি আপনার বকেয়া চাঁদা পরিশোধ করেননি।" খাজা বললেন, "না না, আমি আমার বকেয়া চাঁদা হাশেম সাহেবকে দিয়ে দিয়েছি।" শামসুল হক করজোড়ে বললেন, "স্যার রেকর্ডে তেমন কোনো কিছু নেই যা থেকে বোঝা যায় যে, আপনি আপনার বকেয়া চাঁদা পরিশোধ করেছেন।" যখন আমাকে জানানো হলো, আমি তখন তাড়াতাড়ি সভাকক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে খাজা নাজিমুদ্দীনের নিকট থেকে প্রাপ্ত টাকা জমা দিলাম এবং তারপর তাঁকে প্রবেশপত্র দেওয়া হলো। এভাবে আমি ঢাকার নবাব খাজা হাবিবুল্লাহর নিকট থেকেও কয়েক বছরের বকেয়া চাঁদা আদায় করেছিলাম। ব্যবসায়ী মহলের কোনো ব্যক্তির নিকট থেকে আমি বড় রকমের কোনো চাঁদা আদায় করিনি। ১৯৪৫-এর কোনো এক সময়ে আদমজীর নেতৃত্বে মুসলিম বণিক সমিতির নেতৃবৃন্দকে নিয়ে একটি অর্থ নৈতিক কমিটি গঠিত হয়েছিলো। মির্জা আহমেদ ইস্পাহানী ছিলেন কমিটির কোষাধ্যক্ষ এবং কমিটিতে আমি মুসলিম লীগের প্রতিনিধিত্ব করেছিলাম।

বিশেষ কোনো কারণে অর্থের প্রয়োজন হলে মুসলিম লীগ অফিসের বাইরের কোনো জায়গায় এই কমিটির সভা আহ্বান করা হতো। কি কারণে অর্থের প্রয়োজন তার একটা পরিকল্পনা প্রদান করতাম। যখন সেই পরিকল্পনা কমিটি গ্রহণ করতেন তখন কোষাধ্যক্ষ মির্জা আহমেদ ইস্পাহানী মুসলিম লীগের নামে আমাকে চেক দিতেন এবং তৎক্ষণাৎ আমি সেই চেক প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কোষাধ্যক্ষ মির্জা হাসান ইস্পাহানীর নিকট জমা দিতাম। কমিটি থেকে গৃহীত অর্থ কিভাবে ব্যয় করা হচ্ছে তার একটা রিপোর্ট কমিটির নিকট প্রদান করতাম। প্রাদেশিক মুসলিম লীগ যে সমস্ত অর্থ পেত সেগুলো সঙ্গে সঙ্গে কোষাধ্যক্ষের নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হতো এবং যখনই প্রয়োজন হতো তখনই আমি কোষাধ্যক্ষের নিকট থেকে অর্থ চেয়ে নিতাম। কোষাধ্যক্ষ মুসলিম লীগের বার্ষিক বাজেট পরীক্ষা করতেন

ও বাজেটে সেই খরচার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে কিনা দেখার পর যে কারণে ঐ অর্থের প্রয়োজন সেটা প্রদান করতেন। প্রত্যেক বছর কার্যনির্বাহী কমিটিতে আমি যথারীতি বাজেট উপস্থাপন করতাম। কার্যনির্বাহী কমিটি প্রয়োজন মতো কিছু কিছু যোগবিয়োগ করে বাজেট অনুমোদন করতেন।

সাধারণ নিয়ম এই যে, রাজনৈতিক দল তাদের তহবিলের হিসাব প্রকাশ করে না কিন্তু আমি সে নিয়ম অনুসরণ করতাম না। মুসলিম লীগ কাউন্সিলের ছ'মাস অন্তর যে সভা হতো তাতে কাউন্সিলের কাছে তহবিলের প্রধান আয় ও ব্যয়ের হিসাব যথাযথভাবে হিসাস-পরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষা নিরীক্ষার পর কিভাবে মুসলিম লীগের হিসাব পরিচালিত হচ্ছে আমি তা দাখিল করতাম। জিন্নাহর সঙ্গে এক বিশেষ সাক্ষাৎকালে আমি প্রাদেশিক মুসলিম লীগের আর্থিক কার্যনীতি ও পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করেছিলাম। জিন্নাহ খুবই খুশী হয়ে বলেছিলেন, মৌলানা সাহেব মুসলিম লীগের তহবিল সংগ্রহ ও খরচ সম্পর্কিত আপনার পদ্ধতি আমি সম্পূর্ণভাবে অনুমোদন করি। পূর্বে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ তৎকালীন লীগ সেক্রেটারী সুহরাওয়ার্দীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিলো। সুহরাওয়ার্দী মুসলিম লীগের নামে তহবিল সংগ্রহ করতেন এবং নিজের ইচ্ছেমতো সংগৃহীত তহবিলের খরচ-খরচা পরিচালনা করতেন।

### সফর শুরু

১৯৪৪ সালে জানুয়ারীর শেষ দিকে মুসলিম লীগকে সংগঠিত করার প্রাথমিক কাজগুলো শেষ হয়েছিলো। দেশের নেতা ও জনগণের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের জন্যে জেলার বিভিন্ন অঞ্চলগুলিতে ব্যাপক সফরের প্রয়োজন ছিলো। মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বের প্রধান ঘাঁটি ঢাকা থেকে আমি সফর শুরু করলাম। বরিশালের নূরুদ্দীন আহমেদ আমার সফরসূচী তৈরী করেছিলেন। চট্টগ্রামের মাহবুব আনোয়ার তখন কাজ করতেন আমার অবৈতনিক একান্ত সচিব হিসাবে। মুসলিম লীগের ডায়েরীতে আমার সফরসূচী ছাপা হতো। তার এক কপি মুসলিম লীগ অফিসে থাকত, এক কপি আমার কাছে রাখতাম এবং আর এক কপি আমি আমার স্ত্রীকে বর্ধমানে পাঠিয়ে দিতাম। দীর্ঘ একটানা সফর চলাকালে আমি কখনও কোনো নির্ধারিত কর্মসূচীর ক্ষেত্রে অনুপস্থিত থাকতাম না। কাজেই আমি যখন সফরে থাকতাম তখন যাঁরা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ইচ্ছা করতেন তাঁরা সঠিকভাবে জানতে পারতেন কোথায় আমি রয়েছি। একবার মৌলানা আজাদ সোবহানী আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে কলকাতা এসে দেখলেন আমি তখন সফরে রয়েছি। সফরসূচী দেখে তিনি কলকাতা থেকে চট্টগ্রামে এসে দেখলেন মুসলিম লীগ অফিসে আমি কর্মব্যস্ত। যে অঞ্চলগুলিতে আমি সফরের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম সেখানকার নেতৃবৃন্দের কাছেও আমার সফরসূচী পাঠানো হতো।

৩রা ফেব্রুয়ারী আমি কলকাতা থেকে রওয়ানা হয়ে ফেব্রুয়ারীর ৪ঠা তারিখ বৈকালে নারায়ণগঞ্জ পৌছলাম। নারায়ণগঞ্জের পথে টাঙ্গাইলের শামসুল হক ও মুন্সীগঞ্জের শামসুদ্দীন এই দু'জন যুবক তারপাশায় স্টীমারে আরোহণ করে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। এই সফরে ফরিদপুরের মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী (লাল মিয়া) এবং কবি বেনজীর আহমেদ আমার সঙ্গে ছিলেন। বাংলা বিভাগের পর মোয়াজ্জম হোসেন চৌধুরী তাঁর নিজের নতুন নামকরণ করেন আবদুল্লাহ জাহিরুদ্দীন। শামসুল হক ও শামসুদ্দীন তখন ছাত্র ছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে আমি নেতৃত্বের গুণাবলী লক্ষ্য করে ভালোভাবে তাঁদের চিহ্নিত করি। নারায়ণগঞ্জ স্টীমার ঘাটে ঢাকার কামরুদ্দীন আহমেদ ও নারায়ণগঞ্জের আলমাস আলী, আবদুল আউয়াল এবং শামসুজ্জোহা আমাদের অভ্যর্থনা জানান।

নারায়ণগঞ্জে আমরা খান সাহেব ওসমান আলীর অতিথি হলাম। খান সাহেব ওসমান আলী একজন অতি ভদ্র এবং উদারচেতা ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিলো বামপন্থী। সন্ধ্যেবেলায় আমরা মুসলিম ইনস্টিটিউটে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের সমাবেশে বক্তৃতা দিলাম। বক্তৃতায় আমার আদর্শ এবং মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী যাঁরা আমাদের পার্টিকে তাঁদের উচ্চাভিলাষের সিঁড়ি হিসাবে ব্যবহার করতেন তাঁদের আধিপত্য থেকে মুসলিম লীগকে মুক্ত করে সংগঠিত করার বিষয়ে আমার পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করলাম। খান সাহেব ওসমান আলীর বাসায় আমরা এক বিরাট ভোজ খেলাম। রাতের আহার শেষে নারায়ণগঞ্জের বিশিষ্ট মুসলিম যুবকদের সঙ্গে বেশ কয়েক ঘণ্টা বৈঠক হলো এবং তাঁদের সঙ্গে বিশদভাবে আমার নীতি ও কর্মপদ্ধতি কি হবে সে বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করলাম। ফেব্রুয়ারীর পাঁচ তারিখ বৈকালে ট্রেন যোগে আমরা ঢাকা রওয়ানা হলাম।

প্রেসে যখন আমার সফরসূচী ছাপা হলো তখন কলকাতা থেকে খাজারা ঢাকায় তাঁদের বন্ধুবান্ধবদের নির্দেশ পাঠালেন সেখানে যাতে আমার উপস্থিতির কোনো গুরুত্ব না দেওয়া হয়। ঢাকায় পৌছে দেখলাম, স্টেশনে কোনো ব্যক্তি আমাদের অভ্যথনার জন্যে উপস্থিত নেই। রেলস্টেশন থেকে পায়ে হেঁটে আমরা জিন্দাবাহারে ডাঃ. মইজউদ্দীনের বাড়িতে গিয়ে উঠলাম এবং ঢাকা সফরকালে সেখানে তাঁর অতিথি হলাম। বোধহয় কামরুদ্দীন আহমেদ সে ব্যবস্থা করেন। লাল মিয়া ও কবি বেনজীর তাঁদের বন্ধুদের কোনো বাসায় উঠেছিলেন। ডাঃ. মইজউদ্দীন ছিলেন একজন চিকিৎসক এবং তাঁর রোগী দেখার কক্ষের এক পাশে আমার জন্যে বিছানার ব্যবস্থা করেছিলেন। ফেব্রুয়ারীর ছ'তারিখে ডাঃ. মইজউদ্দীনের বাড়িতে ঢাকা জেলার মুসলিম লীগের তথাকথিত সেক্রেটারী সৈয়দ আবদুস সেলিম আমার সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে সাক্ষাৎ করেন। তিনি কিন্তু জেলার মুসলিম লীগ সংগঠন সম্পর্কে কোনো আলাপ-আলোচনা করলেন না। ফেব্রুয়ারীর

ছ'-তারিখ সন্ধ্যায় বাবরি চুলওয়ালা এক যুবক আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শাহ আজিজুর রহমান। তাঁকে দেখে তাঁর প্রতি আমার কোনো আস্থা জন্মাল না। ঢাকায় কিছু দিনের অবস্থানকালে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের বেশ কিছুসংখ্যক যুবকদের সংস্পর্শে এসেছিলাম, তাঁরা আমার সঙ্গে ইসলামকে আদর্শ হিসাবে আমি যেভাবে দেখি সে সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করেন। জেলায় খাজাদের বিরোধিতার মুখে মুসলিম লীগকে একটি গণতান্ত্রিক দল হিসাবে গড়ে তোলার প্রস্তুতি কিভাবে গ্রহণ করা যায় সে বিষয়েও আলোচনা হয়। আমি তাঁদের উপদেশ দিলাম, সুবিধাজনক কোনো এলাকায় মুসলিম লীগ অফিস ও পার্টি হাউসের জন্যে তাঁরা যেন একটি বাড়ির খোঁজ করেন। তাঁরা সিরাজউদ্দৌলা পার্কে একটি জনসভার আয়োজন করলেন এবং সেখানে আমি বক্তৃতা দিলাম। এভাবে ঢাকা অবস্থানকালে আমি কিছুসংখ্যক সৎ ও যোগ্য মুসলিম লীগ কর্মীকে সংগঠিত করতে সক্ষম হলাম। সপ্তাহের শেষ দিকে কলকাতা রওয়ানা হলাম।

১৯৪৪ ও ১৯৪৫ এই দু'বছর আমাকে কঠোর পরিশ্রম করে পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলাগুলিতে ক্রমাগত সফর করতে হয়েছিলো। আমি কেবলমাত্র জেলা ও মহকুমা সফরে গিয়েছিলাম তা নয়। এর বাইরে গুরুত্বপূর্ণ গ্রাম এলাকাতেও সফর করি। পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়ায় এবং পূর্ববঙ্গের নোয়াখালী জেলার উপকূলবর্তী এলাকা, সন্দ্বীপ, হাতিয়া ও রামগতি আমি যেতে পারিনি।

১৯৪২-৪৩ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পুরাদমে শুরু হয়ে যায়। জাপানীরা কলকাতায় বোমাবর্ষণ করায় সকলে কলকাতার বাইরে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যায় এবং জনাকীর্ণ কলকাতা নগরী পরিণত হয় একটি পরিত্যক্ত নগরীতে। হাজার হাজার লোক নিজেদের জিনিসপত্র নিয়ে শহর ছেড়ে গ্র্যাণ্ড ট্রাংক রোডের উপর দিয়ে চলে যেতে শুরু করে। এ সময় বাংলা ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হয় এবং নিজের ও সন্তানদের অন্ন সংস্থান না করতে পারায় গ্রামাঞ্চলের লোকেরা তাদের পুত্র কন্যাদের বিক্রি করে দেয়। হাজার হাজার নরনারী ও শিশু অনাহারে মৃত্যুবরণ করে। এর মোকাবেলা করার জন্যে সিভিল সাপ্লাই (civil supply) মন্ত্রিত্ব গঠন করা হয় এবং হোসেন শহীদ সুহরাওয়ার্দীকে সিভিল সাপ্লাইয়ের মন্ত্রী করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মানবিক মূল্যবোধের অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করে এবং মানুষের অর্থ লালসা সকল সীমা অতিক্রম করেছিলো। দুর্ভিক্ষের এহেন পরিস্থিতি কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করেছিলো রক্তলোলুপ মুনাফাখোর মজুতদার ও কালোবাজারীর দল। পদাতিক সৈন্য ও যুদ্ধসম্ভার বহন করার জন্যে সকল যোগাযোগ ব্যবস্থার সুযোগ সুবিধাকে অগ্রাধিকার দেওয়ায় স্বাধীনভাবে খাদ্য বহনের ক্ষেত্রে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিলো। সরকার দেশব্যাপী লঙ্গরখানা খোলার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। দেশের সম্পদের উপর কোনো আধিপত্য না থাকায়, সরকারের এছাড়া অন্য কিছু করার

উপায় ছিলো না। দেশ যখন স্বাধীন ও সার্বভৌম থাকে তখন জনসাধারণের যথাযথ ভরণপোষণের জন্য সম্পদ ব্যবহারের পূর্ণ অধিকার সেই রাষ্ট্রের থাকা উচিত। দুর্ভিক্ষ থেকে এই মূল্যবান শিক্ষাটি আমি লাভ করেছিলাম। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে এটা আমি সাধ্যমতো প্রচার করেছিলাম।

ভারত শাসনের দায়িত্বভার গ্রহণের পর রানী ভিক্টোরিয়া তাঁর ঘোষণায় প্রতিশ্রুতি দেন যে, ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ও কাজকর্মে কোনো হস্তক্ষেপ করা হবে না। বৃটিশ সরকার রানী ভিক্টোরিয়ার অঙ্গীকারকে রক্ষা করেছিলো কেবলমাত্র ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আনুষ্ঠানিক এবং ব্যক্তিগত আইনের ক্ষেত্রে। একথা বোঝার কোনো অসুবিধে ছিলো না যে, ব্রিটিশ কর্তৃত্বে কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পক্ষেই সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নিজ ধর্মের মৌলিক নীতি অনুসারে জীবন গঠন করা সম্ভব ছিলো না।

আঠারো বছর বয়সে বারো বছর বয়সের একটি বালিকার প্রতি আমার প্রগাঢ় আসক্তি জন্মায়। আমি তাকে বিবাহ করতে চেয়েছিলাম কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি। যখন বালিকাটি কয়েক মাসের শিশু তখন সে আমার বোনের ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় কয়েক ফোঁটা স্তন-দুগ্ধ পান করে ফেলেছিলো। গোঁড়া পন্থী মুসলিম শাস্ত্রজ্ঞদের মতে আমার বোন হলেন বালিকাটির পালিতা মাতা। মুসলিম শাস্ত্রজ্ঞদের এমন প্রকার রায় আমার কাছে অসঙ্গত বলে মনে হয়েছিলো। আরবদের প্রাক-ইসলামী যুগের আচার ব্যবহার যেগুলো ইসলামের দৃষ্টিতে অসঙ্গত অথবা গর্হিত নয় সেগুলো ইসলাম পালন করত। প্রাক্-ইসলামী আরব সমাজের ব্রাহ্মণ সদৃশ কোরায়েশ পরিবারে যখন সন্তান জন্ম লাভ করত তখন শিশুটিকে কয়েক বৎসর লালন-পালনের জন্য মরুভূমিতে কোনো বেদুইন মহিলার কাছে দেওয়া হতো এবং সেই বেদুইন মহিলা হতো পালিতা মাতা। পালিতা মাতার সন্তানদের সঙ্গে বিবাহ আইন সঙ্গত ছিলো না। এই আচার অনুযায়ী হযরত মহম্মদ (দঃ) তাঁর পালিতা মাতা হালিমা কর্তৃক মরুভূমিতে লালিত হয়েছিলেন। হালিমার স্থান মুসলিম জগতে এখনও অনেক উর্ধ্বে। ঘুমন্ত অবস্থায় থাকা কোনো মহিলার স্তন-দুগ্ধ যদি কোনো শিশু পান করে তাতে মহিলাটি তার পালিতা মাতার মর্যাদা লাভ করতে পারে না। শাস্ত্রজ্ঞদের মতামত ভ্রান্ত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এ বিষয়ে হতাশার কারণে আমার মধ্যে ইসলামকে ভালোভাবে জানবার একটা আগ্রহ সৃষ্টি হয় যা পরবর্তীকালে আমার চিন্তা ও কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করে।

ইসলামের মৌলিক অর্থনৈতিক বিষয়ে বক্তৃতা দেবার জন্য একবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের প্রভোস্ট আমাকে আমন্ত্রণ জানান। সন্ধ্যের সময় মুনীর চৌধুরী, সরদার ফজলুল করিম এবং কিছুসংখ্যক যুবক পার্টি হাউসে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ছাত্র বলে

তাঁরা নিজেদের পরিচয় দেন। সলিমুল্লাহ হলে আমার বক্তৃতায় যেসব বিষয় উল্লেখ করেছিলাম সেগুলি নিয়ে তাঁরা আমার সঙ্গে আলাপ করতে চাইলেন। তাঁরা চাইলেন, আমার আলোচনায় যেন কোনো উদাহরণ না দেওয়া হয়। তাঁদের মতে আলোচনা করতে গিয়ে আমি যে উদাহরণগুলি দিই সেগুলি এতই নির্দিষ্টভাবে প্রাসঙ্গিক ( to the point ) যে বিতর্কের কোনো অবকাশ থাকে না। ইসলামের অর্থনীতি আলোচনার পূর্বে উদাহরণ দেবার প্রয়োজনীয়তার উপর আলোচনা করলাম। আল 'কোরানে যে সমস্ত উদাহরণ রয়েছে সেগুলোর উপর পরিহাস করে ইসলামের সমালোচকদের জবাবে যে সমস্ত আয়াত নাজেল হয়েছিলো সেখান থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি দিলাম। আমার জানা ছিলো না যে, ঐ যুবকরা কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য এবং দেখলাম তাঁরা কম্যুনিজমের দ্বারা ভালোভাবে প্রভাবিত। আমি ভালোভাবেই জানতাম ইসলাম কোথায় কম্যুনিজমের সঙ্গে একমত এবং কোথায় তার অমিল রয়েছে। কম্যুনিস্টদের সঙ্গে আমার ভালো সম্পর্ক ছিলো। মুসলমান হিসাবে পর-মতে আমি অসহিষ্ণু হতে পারি না এবং তা ছিলামও না। কম্যুনিজমের প্রতি আমার এই মনোভাব ছিলো যে, "যেখানে প্রয়োজন মনে করবে সেখানে সমর্থন করো এবং যেখানে বিরুদ্ধাচরণ করার প্রয়োজন হবে সেখানে অবশ্যই তা করতে হবে।"

সেইবার ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যাবার প্রাকালে কলকাতা থেকে ফরমুজুল হক ঢাকায় এসেছিলেন চট্টগ্রাম সফরে আমার সঙ্গী হওয়ার জন্য। চট্টগ্রাম যাওয়ার পথে একদিনের জন্যে আমরা ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অবস্থান করলাম। আবদুর রউফ ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমা মুসলিম লীগের সম্পাদক। দিনটি আমি মুসলিম লীগ কর্মীদের সঙ্গে অতিবাহিত করলাম এবং মুসলিম লীগ সংগঠনের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা ও তাঁদের কাছে ১৯৪০-এর লাহোর প্রস্তাবের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করলাম। মধ্যরাতে আমরা স্টেশনে পৌছলাম। ঢাকা মেলও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পৌছল মধ্য রাত্রিতে। প্রথম শ্রেণীর কম্পার্টমেণ্ট যেটি আমাদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছিলো সেটিতে ছিলো দু'জন সামরিক অফিসার। তাদের একজন আমেরিকান অন্যজন শিখ। কম্পার্টমেণ্টটি ভিতর থেকে খিল দেওয়া ছিলো এবং তারা আমাদের জন্যে সেটি খুলতে অস্বীকার করল। আমেরিকানটিকে উদ্দেশ করে বললাম, আপনি কি মনে করেন না যে আপনার ব্যবহার দ্বারা আপনার দেশ ও জাতিকে আপনি হেয় প্রতিপন্ন করছেন। আমেরিকানটি তৎক্ষণাৎ দরজা খুলে দিলো।

ভোরের দিকে ট্রেনটি ফেণীতে পৌছল। ফেণীতে কিছুসংখ্যক ছাত্র কম্পার্টমেণ্টে ঢুকে শ্লোগান দিতে থাকায় আমেরিকান ও শিখ দু'জনেই খুব বিরক্তি বোধ করল। ভারতীয় হিসাবে শিখটির এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকায় সে নিঃশব্দে কম্পার্টমেণ্টটি ত্যাগ করে অন্য কম্পার্টমেণ্টে আশ্রয় নিল। আমেরিকানটি রেগে চিৎকার করে ছাত্রদের বলল, "কেন তোমরা এভাবে চিৎকার করছ?" ছাত্ররা বলল "এখানে

আমরা এসেছি আমাদের নেতাকে শ্রদ্ধা জানাতে।" আমেরিকানটি বিরক্ত হয়ে বলল,"আমাদেরও নেতা আছে তবে আমরা এভাবে চিৎকার করি না।"

ট্রেনটা চট্টগ্রাম পৌঁছলে আমরা আশা করেছিলাম, সেখানকার মুসলিম লীগ নেতারা কেউ কেউ স্টেশনে আমাদের অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত থাকবেন। কিন্তু কাউকে দেখলাম না। ট্রেন থেকে যখন আমরা অবতরণ করলাম তখন একটি দীর্ঘদেহী যুবককে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখলাম। তিনি ফজলুল কাদের চৌধুরী। রেলওয়ে স্টেশনে আমি তাঁকে প্রথম দেখলাম।

রফিউদ্দীন সিদ্দিকী ছিলেন চট্টগ্রাম জেলা মুসলিম লীগের সভাপতি এবং ফজলুল কাদের চৌধুরী ছিলেন সেক্রেটারী। আমার বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক হওয়ার কিছু পূর্বে সাধারণ সম্পাদক হিসাবে হোসেন শহীদ সুহরাওয়ার্দী চট্টগ্রাম মুসলিম লীগকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেন। প্রেসিডেণ্ট ও সেক্রেটারীর মধ্যে তীব্র সংঘর্ষের ফলে এক প্রকার অচল অবস্থার সৃষ্টি হওয়ায় এই বরখাস্তের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। অবস্থা সরজমিনে তদন্তের উদ্দেশ্যেই আমরা চট্টগ্রাম এসেছিলাম। কিন্তু কলকাতা পরিত্যাগের পূর্বে নাজমুল হক নামে চট্টগ্রামের এক যুবককে সেখানে পাঠিয়েছিলাম বিবদমান গোষ্ঠীর নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করে একটি প্রোগ্রাম তৈরী করার জন্যে।

ফজলুল কাদের চৌধুরী গাড়িতে করে আমাদের মুসলিম ইনিস্টিটিউটের কাছে একটি বাড়িতে নিয়ে গেলেন। এটি চট্টগ্রামের মেডিকেল ছাত্রদের মেস বাড়ি ছিলো। এর দোতলায় একটি ঘরে আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো। দেখলাম সেখানে একটি খাটিয়া, দুটি চেয়ার ও একটি টেবিল। চট্টগ্রাম অবস্থানকালে এখানেই আমরা ছিলাম। নাজমুল হক নামে যে যুবককে আমার আগে এখানে পাঠিয়েছিলাম তিনি এখানে এসে আমার সঙ্গে দেখা করলেন। মেসে পৌঁছনোর পনেরো মিনিটের মধ্যে ফজলুল কাদের চৌধুরী তাঁর শক্তি প্রদর্শন শুরু করে দিলেন। তিনি আমার নিকট জেলা বোর্ডের সদস্য, মিউনিসিপ্যালিটি স্কুল বোর্ডের সদস্য এবং চট্টগ্রামের মুসলিম ছাত্র লীগের সদস্যদের উপস্থিত করলেন।

তাঁরা সকলে দাবী করলেন যে, ফজলুল কাদের চৌধুরীকে মুসলিম লীগের সেক্রেটারী হিসাবে পুনর্বহাল করতে হবে। আমি ধৈর্যের সঙ্গে তাঁদের কথা শুনলাম কিন্তু কোনো প্রতিশ্রুতি দিলাম না। ফজলুল কাদের চৌধুরী কর্তৃক আয়োজিত সভায় মুসলিম ইনিস্টিটিউটে সন্ধ্যায় আমি বক্তৃতা দিলাম। মুসলিম ইনিস্টিটিউটে যখন আমি প্রবেশ করলাম তখন উপস্থিত সকলে ফজলুল কাদেরকে সমর্থন করে শ্লোগান দিতে লাগলেন। সভায় সভাপতিত্ব করলেন আবদুস সাত্তার নামে একজন প্রবীণ আইনজীবী। আমার বক্তৃতায় চট্টগ্রাম জেলা মুসলিম লীগের নেতৃত্বের অন্তর্দ্বন্দ্ব নিয়ে কোনো কথা বললাম না এবং সে বিষয়ে কোনো প্রতিশ্রুতিও দিলাম না। ফজলুল কাদের চৌধুরী খুবই হতাশ হলেন এবং উপলব্ধি করলেন যে,

শক্তি প্রদর্শন করে তিনি কোনো কিছু লাভ করতে পারবেন না। ফজলুল কাদের চৌধুরীর বিপক্ষ দল খুব সতর্কতার সঙ্গে পরিস্থিতি লক্ষ্য করলেন এবং দেখে সন্তুষ্ট হলেন যে আমি কোনো পূর্বসিদ্ধান্ত নিয়ে চট্টগ্রামে আসিনি। আমি দু'দিন চট্টগ্রামে থাকলাম। এই দু'দিন দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের আয়োজিত চা-চক্র এবং মধ্যাহ্ন ও নৈশভোজে যোগদান করলাম। যখন আমি চট্টগ্রামে আসি তখন কেবলমাত্র ফজলুল কাদের চৌধুরী স্টেশনে এসেছিলেন আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে কিন্তু তিন দিন পর যখন চট্টগ্রাম ত্যাগ করলাম তখন চট্টগ্রামের বেশ কিছুসংখ্যক মুসলিম ভদ্রলোক স্টেশনে আমাকে বিদায় জানাতে এসেছিলেন।

আমি বুঝতে পারলাম যে, ফজলুল কাদের চৌধুরীর সক্রিয় সমর্থন ব্যতিরেকে চট্টগ্রাম মুসলিম লীগকে ভালোভাবে সংগঠিত করা সম্ভবপর নয়। ট্রেন ছাড়ার সময় আমি ফজলুল কাদের চৌধুরীকে ডেকে বললাম, তিনি যেন পরের দিন ঢাকায় আমার সঙ্গে দেখা করেন। ঢাকায় পার্টি হাউসে তিনি আমার সঙ্গে দেখা করলে আমি তাঁর হাতে টাইপ করা একটি কপি দিয়ে আমার সিদ্ধান্ত তাঁকে জানিয়ে দিলাম। চট্টগ্রাম জেলা মুসলিম লীগের সাসপেনশন অর্ডার বাতিল ও তাঁকে পুনর্বহাল করে পরের দিন কলকাতার উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করলাম।

১৯৪৪ সালের এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ফরিদপুরে মুসলিম লীগ বেসামরিক প্রতিরক্ষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ( Civil Defence Training Centre ) সংগঠিত হয়েছিলো। পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহ থেকে মুসলিম লীগের কর্মীরা সেখানে সমবেত হয়। ইউসুফ আলী চৌধুরী ( মোহন মিয়া ), এবং ফরিদপুরের পাবলিক প্রসিকিউটর আবদুস সালাম ফরিদপুর মুসলিম লীগের প্রেসিডেণ্ট ও সেক্রেটারী ছিলেন এবং এই দু'জনেই ছিলেন মুসলিম লীগে খাজাদের দলভুক্ত। এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহে আমি ফরিদপুরে গেলাম। আমার পৌছনোর পূর্বেই ইউসুফ আলী চৌধুরী ফরিদপুর থেকে চলে যান। এ সময়ে বর্ধমানের আবদুস সামাদ আমার সঙ্গে ফরিদপুর সফরে ছিলেন। রেলস্টেশনে ফরিদপুর জেলা বোর্ডের ভাইস প্রেসিডেণ্ট আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন এবং জেলা বোর্ডের ডাকবাংলায় নিয়ে গিয়ে একটি ছোট কামরায় আমাদের থাকার ব্যবস্থা করলেন। জেলা লীগের সেক্রেটারী সেখানে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেননি। তাঁর সঙ্গে প্রত্যেক দিন সন্ধ্যায় আমার দেখা হতো প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। প্রতিদিন দুপুর ও সন্ধ্যায় একটি লোক ডাকবাংলায় মাটির পাত্রে আমাদের জন্য মোটা চালের ভাত ও মাছের তরকারী নিয়ে আসত। আমরা কোনোরকমে সেগুলো গলাধঃকরণ করতাম। প্রতিদিন সকালে আমি কোরান শরীফ পড়তাম এবং সন্ধ্যার জন্যে বক্তৃতা তৈরী করতাম। আবদুস সামাদ কোরানের নির্বাচিত অংশ থেকে আমাকে পড়ে শোনাতেন। ফরিদপুরে এক সপ্তাহ অবস্থান কালে আমি ইসলামের

প্রায়োগিক ( Pragmatic ) মূল্যবোধের উপর সাতটি বক্তৃতা দিয়েছিলাম। এক সপ্তাহের সফর শেষে কলকাতার উদ্দেশে ফরিদপুর ত্যাগ করলাম।

মে, জুন, জুলাই ও আগস্ট আমি প্রায় কলকাতার বাইরে উত্তর ও পূর্ববঙ্গের জেলাসমূহে বক্তৃতা সফর করে বেড়াতাম। এ সময়ের মধ্যে উত্তর ও পূর্ববঙ্গের মুসলিম লীগ কর্মীরা মোটামুটিভাবে সংগঠিত হতে পেরেছিলো। ফরিদপুর ও কুমিল্লা জেলা ছাড়া মুসলিম লীগের বামপন্থী কর্মীরা মুসলিম লীগকে গণতান্ত্রিক করে তোলার অভিযানে জনগণের সমর্থন লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলো। ফরিদপুরে ইউসুফ আলী চৌধুরী, আবদুস-সালাম খান এবং ওয়াহিদুজ্জামান খাজাদের প্রতিক্রিয়াশীল দলের সক্রিয় প্রতিনিধি ছিলেন। ফরিদপুর মুসলিম লীগের মধ্যে একটি শক্তিশালী বামপন্থী গ্রুপ সংগঠিত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিলো শেখ মুজিবর রহমানের উপর। শেখ মুজিবর রহমানকে খুবই কঠিন দায়িত্ব পালন করতে হয়েছিলো। উপরে উল্লিখিত এমন তিন ব্যক্তির কঠিন বিপক্ষতার বিরুদ্ধে তাঁকে কাজ করতে হতো যাঁদের প্রতি বাংলার মুসলিম লীগ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের পূর্ণ সমর্থন ছিলো।

কুমিল্লার জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান খান বাহাদুর আবিদ রেজা চৌধুরী, পাবলিক প্রসিকিউটর খান বাহাদুর আবদুল গণি, খান বাহাদুর ফরিদউদ্দীন আহমেদ ও মফিজুদ্দীন আহমেদ ছিলেন খাজাদের দলভুক্ত নেতা। কুমিল্লা জেলার বামপন্থীদের নেতা ছিলেন খোন্দাকার মোস্তাক আহমেদ এবং তখন তিনি ছাত্র ছিলেন। কুমিল্লার দক্ষিণপন্থীরা নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে বামপন্থীদের বিরুদ্ধাচরণ করত। কিন্তু ফরিদপুরে ইউসুফ আলী চৌধুরী, আবদুস সালাম খান এবং ওয়াহিদুজ্জামানের নেতৃত্বে প্রতিক্রিয়াশীলরা অনিয়মতান্ত্রিক এবং চরমপন্থা অবলম্বন করত। শেখ মুজিবর রহমানকে প্রয়োজন বোধে আক্রমণ মোকাবেলা করতে গিয়ে প্রতি আক্রমণ করতে হতো।

ময়মনসিংহ জেলা মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট ছিলেন নূরুল আমীন এবং গিয়াসুদ্দীন পাঠান ছিলেন সেক্রেটারী। আবদুল মোনেম খান ছিলেন সহ সম্পাদক। ১৯৪১ সালে যখন ফজলুল হক মুসলিম লীগ ত্যাগ করে শ্যামা-হক মন্ত্রিত্ব নামে পরিচিত মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন তখন তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য জেলা মুসলিম লীগ মোনেম খানকে বহিষ্কার করে। কয়েক মাস পর যখন মোনেম খান তাঁর কৃত-কর্মের জন্য অনুশোচনা করলেন তখন তাঁর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেওয়া হলো।

মুসলিম লীগ নেতাদের মধ্যে নূরুল আমিন এবং ডাঃ. এ. এম. মল্লিক এই দু'জনই প্রথম আমাকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক হওয়ার জন্য পরামর্শ দেন। নূরুল আমীন, মৌলানা আকরাম খান, নাজিমুদ্দীন এবং তাঁদের সহচরদের সঙ্গে ব্যক্তিগত ভালো সম্পর্ক বজায় রাখতেন, কিন্তু কাউন্সিল সভায় নূরুল আমীন এবং ময়মনসিংহ জেলার প্রতিনিধি কাউন্সিল সদস্যরা সকলে

বামপন্থীদের সমর্থন করতেন। প্রথম যখন আমি ময়মনসিংহ সফরে গিয়েছিলাম তখন স্টেশনে নূরুল আমীন এসেছিলেন এবং আমাকে জেলা বোর্ডের ডাকবাংলায় নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে আমার জন্যে একটি কামরা সংরক্ষিত রাখা হয়েছিলো। নূরুল আমীন স্বয়ং তাঁর বাড়ি থেকে ডাকবাংলায় আমার জন্যে দুপুর ও রাত্রির খাবার নিয়ে আসতেন। আমি ঢাকা থেকে ময়মনসিংহ গিয়েছিলাম এবং টাঙ্গাইলের শামসুল হক আমার সঙ্গে ছিলেন। ময়মনসিংহে আমরা দু'দিন অবস্থান করি। আমি যখনই সদর জেলাসমূহ সফর করতাম তখন মুসলিম লীগের আয়োজিত সভা ও অনুষ্ঠানে যোগদান শেষে সকল রাজনৈতিক দলের জেলা অফিসগুলোতে যেতাম এবং তাঁদের সঙ্গে ১৯৪০-এর লাহোর প্রস্তাবের উপর আলোচনা করতাম। ময়মনসিংহের কম্যুনিস্ট পার্টি অফিসে আমি কমরেড মণি সিংহের সঙ্গে দেখা করি এবং তাঁরা আমার জন্য ময়মনসিংহের লোকগীতি ও লোক নৃত্য প্রদর্শনের আয়োজন করেন। সফর চলাকালে মুসলিম লীগ আয়োজিত জনসভায় বক্তৃতা ছাড়াও রাত্রিতে কয়েক ঘণ্টা ব্যাপী যুব মুসলিম লীগ কর্মীদের সঙ্গে মুসলিম লীগের আদর্শ এবং পার্টিকে কিভাবে সংগঠিত ও সংঘবদ্ধ করতে হবে সে নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করতাম। আমি তাঁদের সঙ্গে রাজনৈতিক সংগ্রামের চার নীতি নিয়ে আলোচনা ছাড়াও তাঁদের উপদেশ দিতাম যে, তাঁরা তাঁদের বক্তব্য জনসাধারণের কাছে পেশ করার সময় যেন অবশ্যই লক্ষ্য রাখেন, যাঁরা তাঁদের সঙ্গে একমত নন তাঁদের অনুভূতি যাতে খর্ব না হয়। রাজনৈতিক সংগ্রামের যে চারটি নীতি শিক্ষা দিতাম সেগুলি হলো: নিজেদের সংঘবদ্ধ করা, যতটা সম্ভব মিত্র অন্বেষণ করা, যাদেরকে মিত্র হিসাবে পাবে না তাদেরকে নিরপেক্ষ রাখতে চেষ্টা করা এবং এভাবে শত্রুকে কোণঠাসা করে সরাসরি যুদ্ধে তাদেরকে পরাভূত করা। বিদ্বেষের উপর প্রতিষ্ঠিত যেকোনো আন্দোলনে তাৎক্ষণিক সাফল্য লাভ করলেও সেটা জনগণের মঙ্গলের জন্য স্থায়ী ফল লাভ করতে সক্ষম হয় না। আমি মুসলিম লীগ কর্মীদের ভালোবাসার যোগ্য করে তুলতে চেয়েছিলাম। সেজন্য ধর্ম এবং রাজনৈতিক ঐক্যমত নির্বিশেষে সকলের জন্য সমাজ সেবার কাজে নিয়োজিত থাকার জন্য তাদের উপদেশ দিতাম।

১৯৪৩ সালে নভেম্বর মাসে মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরীকে (লাল মিয়া) সেক্রেটারী করে মুসলিম লীগ দুর্ভিক্ষ ত্রাণ কমিটি গঠিত হয়েছিলো। মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের সক্রিয় সহযোগিতায় কমিটি সর্বসাধারণের কাছ থেকে নগদ টাকা ও জিনিসপত্র চাঁদা হিসাবে সংগ্রহ করে দুস্থ লোকদের সাহায্যার্থে সাধ্যমতো সেগুলি বিতরণ করত। ১৯৪৩ সালের ২১শে ডিসেম্বর করাচীতে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের বাৎসরিক অধিবেশন হয়। ১৮ই ডিসেম্বর আমি করাচীর উদ্দেশে কলকাতা ত্যাগ করি। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের প্রতিনিধিত্ব করে তিরিশ জন প্রতিনিধি মুসলিম লীগের করাচী অধিবেশনে

যোগদান করেছিলেন। বর্ধমান জেলা মুসলিম লীগের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন বর্ধমান জেলা মুসলিম লীগের সম্পাদক সৈয়দ আলী হোসেন, আমার মামাতো ভাই মহাম্মদ আবদুল বাসেত এবং মেমারীর ডাঃ. আবদুল খালেক। প্রতিনিধি ছাড়াও আমার সঙ্গে ছিলেন আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র বদরুদ্দীন মহাম্মদ উমর এবং আমার নাতি সৈয়দ আলী ইমাম। করাচীর পথে আমরা একদিনের জন্যে লাহোরে যাত্রা বিরতি করেছিলাম। বর্ধমানে মৌলানা আফতাবউদ্দীন আহমেদ লাহোর রেল-স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর বাড়িতে আমরা অতিথি হিসাবে একদিন অতিবাহিত করলাম। মৌলানা আফতাবউদ্দীন কাদিয়ানের হযরত মির্জা গোলাম আহমেদ-এর অনুসারীদের লাহোর শাখার একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। এই শাখার নেতা ছিলেন মৌলানা আহমেদ আলী এবং খাজা কামালউদ্দীন। মৌলানা আফতাবউদ্দীন ইংল্যাণ্ডের ওকিং মসজিদের ইমাম হিসাবে বেশ কয়েক বৎসর কর্মরত ছিলেন। বঙ্গীয় মুসলিম লীগের অফিস সেক্রেটারী ফরমুজুল হককে বাংলার প্রতিনিধিদের থাকার ব্যবস্থা করার জন্য আমাদের আগেই করাচীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিলো। অধিবেশনে যোগদানকারী প্রতিনিধিদের কাছ থেকে বঙ্গীয় মুসলিম লীগ ত্রাণ কমিটির সেক্রেটারী লাল মিয়া সাহেব করাচীতে তহবিল সংগ্রহ করেন এবং আমার পুত্র ও নাতি স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে লাল মিয়ার সঙ্গে যোগ দিয়ে তাঁকে দুর্ভিক্ষ ত্রাণ কমিটির জন্য চাঁদা সংগ্রহে সাহায্য করে। কলকাতা প্রত্যাবর্তনের সময় কয়েকদিনের জন্য আমরা আবার লাহোরে অবস্থান করেছিলাম।

শমশের আলী এ্যাডভোকেটের নেতৃত্বে বরিশালে বামপন্থীরা বরিশাল জেলা মুসলিম লীগকে সংগঠিত করার জন্যে কঠোর পরিশ্রম করেন। বরিশালের পাবলিক প্রসিকিউটর আজিজউদ্দীন আহমেদ তখন জেলা লীগের সভাপতি ছিলেন। বরিশালে আমার প্রথম সফর কালে অশ্বিণীকুমার হলে মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের সমাবেশে আমি বক্তৃতা দিয়েছিলাম। অশ্বিণীকুমার হল থেকে যে সমস্ত যুবক কর্মীবৃন্দ আমার থাকার জায়গা জেলা বোর্ড ডাকবাংলায় আমার সঙ্গে এসেছিলেন তাঁদের সঙ্গে বরিশালে আমার প্রথম রাত্রি অতিবাহিত হয়েছিলো। মুসলিম লীগের আদর্শের বিভিন্ন দিক নিয়ে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছিলো। আমার বরিশাল ত্যাগ করার পর বরিশালে তাঁরা মুসলিম লীগ অফিস এবং পার্টি হাউস স্থাপন করেছিলেন।

নোয়াখালী জেলার মুজিবর রহমান এবং আবদুল জব্বার খদ্দর জেলা সংগঠনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। আবদুল জব্বার খদ্দর প্রথম আমাকে দেখেন ৭ই নভেম্বর বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কাউন্সিল সভায় যখন আমি বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হই। তিনি আমাকে ধুতি-পরা অবস্থায় দেখে ভোট দেননি। পরবর্তীকালে তিনি যখন আমার সংস্পর্শে এলেন তখন আমার অন্যতম অনুগত সমর্থক হন। প্রবীণদের মধ্যে গোফরাণ সাহেব নোয়াখালী জেলায় বামপন্থী আন্দোলনকে সমর্থন করতেন।

## গঠনতন্ত্র সংশোধন

১৯৪৪ সালের মাঝামাঝি প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কার্যনির্বাহী কমিটিতে আমি প্রস্তাব করলাম, যে সংবিধানের অধীনে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ পরিচালিত হতো তার কিছু রদবদল করতে হবে। কার্যনির্বাহী কমিটি সাধারণভাবে আমার প্রস্তাব অনুমোদন করে এবং খাজা শাহাবুদ্দীনের সঙ্গে পরামর্শ করে একটি খসড়া গঠনতন্ত্র তৈরী করা হয়। কার্যনির্বাহী কমিটির পরবর্তী সভায় আমি খসড়াটি কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদনের জন্য পেশ করি এবং খসড়াটি কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদন লাভ করে। গৃহীত গঠনতন্ত্রটি ছাপা হয় ও প্রাদেশিক মুসলিম লীগের শাখা অফিসগুলিতে সেইগুলো বিলি করে নির্দেশ দেওয়া হলো নতুন গঠনতন্ত্রের আওতায় তারা যেন জেলাগুলোকে সংগঠিত করেন।

নতুন গঠনতন্ত্র অনুযায়ী জনসংখ্যা নির্বিশেষে প্রতিটি জেলাকে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিলে পঁচিশজন প্রতিনিধি রাখার ক্ষমতা দেওয়া হলো। আরও ব্যবস্থা হলো যে, প্রাদেশিক কার্যনির্বাহী কমিটির দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য কাউন্সিলার-দের দ্বারা নির্বাচিত হবে এবং অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ মনোনীত করবেন সভাপতি। কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য সংখ্যা করা হয় সাতাশজন। সহ-সভাপতি এবং সহ সম্পাদকের পদগুলি বাতিল করা হলো।

সংক্ষিপ্ত বিরতি দিয়ে আমি পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে এক ঝটিকা সফর করতাম। স্থির হলো, ১৯৪৪-এর নভেম্বরে কোনো এক সময় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের বাৎসরিক কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং জেলা মুসলিম লীগের সংগঠনের কাজ সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে সম্পূর্ণ করা হবে।

১৯৪৪ সালের ১৬ই জুলাই স্যার খাজা নাজিমুদ্দীন এবং হোসেন শহীদ সুহরাওয়ার্দী রংপুর জেলা মুসলিম লীগের সম্মেলনে যোগদান করতে রংপুর এসেছিলেন। জেলা বোর্ড অফিসের ময়দানে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিলো।

সুহরাওয়ার্দী সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। খাজা নাজিমুদ্দীন সম্মেলন উদ্বোধন করেন এবং আমি মুসলিম লীগের পতাকা উত্তোলন করি। মুসলিম লীগের বাম ও দক্ষিণ পন্থীরা সব সময় তাঁদের আভ্যন্তরীণ কলহে ব্যাপৃত থাকতেন কিন্তু প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে আমরা আমাদের মতপার্থক্য প্রকাশ করতাম না। খাজা নাজিমুদ্দীন তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে দাবী করলেন যে, কেবল মুসলিম লীগ ভারতের মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান। কংগ্রেসে বহুসংখ্যক মুসলমান রয়েছেন, কংগ্রেসের এ দাবী তিনি দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করলেন। পতাকা উত্তোলন করতে গিয়ে আমি বলেছিলাম যে, ১৯৪০ সালের প্রস্তাবে ভারত বিভক্তির কথা যেভাবে চিন্তা করা হয়েছিলো সেটাই গণতান্ত্রিক উপায়ে ভারতের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের একমাত্র পথ। সম্মেলনে বহু জনসমাবেশ হয়েছিলো। এরপর মুসলিম

লাগ নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা নতুন উদ্যমে তাঁদের জেলায় মুসলিম লীগকে সংগঠিত করার সংগ্রামে নিজেদের নিয়োজিত করেন।

১৯৪৪-এর ২৩শে জুলাই ইসলামিয়া কলেজে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র লীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নের সহ সভাপতি শামসুল হুদা সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। শামসুল হুদা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন এবং তিনিই প্রথম বাঙালী যিনি আলীগড় ছাত্র ইউনিয়নের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। সম্মেলন উদ্বোধন করার জন্যে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং আমার উদ্বোধনী ভাষণে মুসলিম যুবকদের মুসলিম লীগের সদস্য হওয়ার জন্যে আমি আহ্বান জানাই। আমি বলেছিলাম, ছাত্র হিসাবে আপনাদের ছাত্রদের সুযোগ সুবিধের দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। কিন্তু মুসলিম যুবক হিসাবে আপনারা ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগের শুধু বন্ধু নয়, আপনারা এর অংশবিশেষ। মুসলমান রাষ্ট্র বলতে কি বুঝায় সে বিষয়টি ছাত্রদের কাছে আমি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করি। ভাবপ্রবণ তরুণদের উপর মার্কসবাদের প্রচণ্ড আবেদন ছিলো। তাই ইসলামের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক মৌলিক বিষয়ের উপর আমি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করলাম। ১৯৪৪-এর ২৭শে জুলাই দৈনিক আজাদে এই সম্মেলনের রিপোর্ট ছাপা হয়েছিলো।

১৯৪৪-এর ১৯শে আগস্ট মির্জাপুর পার্কে হিন্দু ও মুসলমানদের একটি যুক্ত সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং কলকাতার মেয়র আনন্দলাল পোদ্দার তাতে সভাপতিত্ব করেন। সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা এ সভায় বক্তৃতা দেন। গান্ধী-জিন্নাহ আলোচনার প্রাক্কালে এই সভাটি হয়েছিলো। এর কিছুদিন পূর্বে ভারতের সামরিক বড়লাট লর্ড ওয়াভেল এক বক্তৃতায় হিন্দু মুসলিম মিলনের সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। উপমহাদেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি আমার বক্তৃতায় বলেছিলাম, গান্ধী-জিন্নাহর মতৈক্যকে ভারতের হিন্দু ও মুসলমানরা দৃঢ়ভাবে সমর্থন করবেন। ভারতের জনসাধারণ গান্ধী-জিন্নাহ আলোচনাকে অনেক গুরুত্ব দিয়েছিলো।

গান্ধীর আলোচনা করার বিষয় এবং কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তাঁর অঙ্গীকার করার এখতিয়ার আছে কিনা সে বিষয়ে জিন্নাহ প্রশ্ন রাখেন, কেন না গান্ধী কংগ্রেসের সদস্য পর্যন্ত ছিলেন না, যদিও তিনি কার্যত কংগ্রেসের একনায়ক ছিলেন। গান্ধী-জিন্নাহ আলোচনা শেষ পর্যন্ত নিষ্ফল হয়েছিলো।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি মৌলানা আকরাম খাঁর জেলা চব্বিশ পরগণায় পার্টির কোনো সংগঠন ছিলো না। ১৯৪৪-এর ২০শে আগস্ট মৌলানা আকরাম খাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র খায়রুল আনম খাঁর সভাপতিত্বে আজাদ অফিসে মুসলিম নেতৃবৃন্দের একটি সম্মেলন হলো। মৌলানা আকরাম খাঁ সভায় উপস্থিত

ছিলেন না। সম্ভবত তিনি তাঁর মধুপুরের বাড়িতে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। সম্মেলনে স্থির হলো যে, সাধারণ সম্পাদকের অনুমতি নিয়ে চব্বিশ পরগণা মুসলিম লীগের সাংগঠনিক কর্তৃত্ব মুসলিম লীগের মুসলিম ছাত্র লীগকে দেওয়া উচিত। আকরাম নাজিমুদ্দীন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত চব্বিশ পরগণার আনোয়ার তখন ছিলেন মুসলিম ছাত্র লীগের কর্ণধার। চব্বিশ পরগণার মুসলিম লীগের সংগঠন কিরূপ হবে সে বিষয়ে সম্পূর্ণ সজাগ থেকে সাধারণ সম্পাদক হিসাবে আমি সম্মেলনের সিদ্ধান্তে আমার মত দিলাম। বর্তমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাঙলাদেশে অবস্থিত জেলাগুলিকে সঠিকভাবে সংগঠিত করার কাজে আমি আমার মনোযোগ ও ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করেছিলাম।

## ঢাকার সংগ্রাম

ঢাকার মুসলিম লীগ পার্টি অফিসের স্থানীয় কর্মীদের নেতৃত্বে ঢাকা জেলার মুসলিম লীগের শাখাসমূহ ভালোভাবে সংগঠিত হয়েছিলো। ঠিকভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে ঢাকা জেলা মুসলিম লীগের নেতৃত্ব টিকিয়ে রাখা তাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে খাজা নাজিমুদ্দীন এবং তাঁর মামাতো ভাই সৈয়দ আবদুস সেলিমের এই আশঙ্কার কারণ ছিলো। তাই ঢাকা জেলা মুসলিম লীগের বাৎসরিক কাউন্সিল সভা পণ্ড করার জন্যে তাঁরা ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিলেন। ১৯৪৪-এর ১০ই সেপ্টেম্বর নারায়ণগঞ্জ মহকুমা মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সভার দিন ধার্য করা হয় এবং তদনুযায়ী ১০ই সেপ্টেম্বর নরসিংদীতে সভা অনুষ্ঠিত হলো।

ঢাকা জেলা মুসলিম লীগের বিদায়ী সম্পাদক সৈয়দ আবদুস সেলিম কাউন্সিল সভায় সভাপতিত্ব করেন। সে সময় রমজান মাস ছিলো এবং শেষ কয়েকদিন প্রবল বৃষ্টিপাত হয়েছিলো। ১০ই সেপ্টেম্বর আকাশ ঘন মেঘে আচ্ছন্ন ছিলো এবং মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছিলো। এত অসুবিধার মধ্যেও একশো পঞ্চাশজন সদস্য সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহকুমার সাতাশিটি ইউনিয়নের মধ্যে ষাটটি ইউনিয়ন খুব ভালোভাবে সংগঠিত ছিলো। সেলিম এবং সাবডিভিশনের বিদায়ী সম্পাদক কাজী হাতিম আলী তাঁদের চক্রান্ত অনুযায়ী এই অজুহাতে সভা ভঙ্গ করলেন যে, তাঁরা দুটি ইউনিয়ন লীগ সংগঠনের গ্রাহ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করে দুটি আবেদনপত্র পেয়েছেন। সুস্পষ্টভাবে এই দুটি দরখাস্ত সেলিম এবং কাজী হাতেম আলীর দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়েছিলো। সৈয়দ আবদুস সেলিমের এরূপ কাজে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ খুবই আশ্চর্য ও ব্যথিত হয়েছিলো। সেলিমের এই অসাংবিধানিক কাজের খবর যখন আমি জানতে পারলাম তখন সেলিমের কাজের নিন্দা করে প্রেসে লিখিত একটি বিবৃতি দিলাম এবং ঢাকার পার্টি-হাউসকে নির্দেশ দিলাম অনতিবিলম্বে নারায়ণগঞ্জে নারায়ণগঞ্জ মহকুমা মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশন আহ্বান করতে। এই নির্দেশ অনুযায়ী কাজ হয়েছিলো এবং নারায়ণ-

গঞ্জে মহকুমা মুসলিম লীগ যথারীতি সংগঠিত হয়েছিলো। জেলা মুসলিম লীগের সংগঠনকে নষ্ট করার প্রথম পদক্ষেপ বিফল হলো। এ বিষয়ে আমি প্রেসে যে বিবৃতি দিয়েছিলাম সেটি ১৩ই সেপ্টেম্বরের দৈনিক আজাদে প্রকাশিত হয়েছিলো।

ঢাকা জেলা মুসলিম লীগের নির্বাচন আহসান মনজিলে অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। ঢাকা জেলায় কি ঘটছে সে বিষয়ে খাজা শাহাবুদ্দীন খবরাখবর রাখতেন, তিনি দেখলেন যে, যদি সময় থাকতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা না যায় তাহলে ঢাকা জেলার কাউন্সিল সদস্যদের অধিকাংশই তাঁদের বিরুদ্ধাচরণ করবেন। আমার নির্দেশ অনুযায়ী মুসলিম লীগকে মহকুমা পর্যন্ত সংগঠিত করে আগস্টের শেষ নাগাদ সংগঠনের কাজ চূড়ান্ত করার কথা ছিলো। খাজা নাজিমুদ্দীন ঢাকা জেলা মুসলিম লীগের বিদায়ী সম্পাদক সৈয়দ আবদুস সেলিমকে ১৪ই আগস্টে ঢাকা পাঠালেন। সেখানে আবদুস সেলিম বিদায়ী কার্যনির্বাহী কমিটির একটি সভা আহ্বান করলেন। এই সভায় ঢাকা পার্টি-হাউসের কোনো প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। তিনি কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের সঙ্গে যুক্তি করলেন কিভাবে ১৫০ নং মোগলটুলীর নেতৃত্বে বামপন্থী সংগ্রামকে বানচাল করার উপায় বের করা যায়। যাই হোক, ১৫০ নং মোগলটুলীর কার্যকলাপ তেমন কোনো বাধা ছাড়াই চলতে লাগল। খাজা শাহাবুদ্দীন দেখলেন যে, গঠনতন্ত্র অনুযায়ী যদি কার্যকলাপ চলতে দেওয়া যায় তাহলে ঢাকা জেলা মুসলিম লীগের নির্বাচনে তাঁদের পরাজয় নিশ্চিত।

খাজা অন্য উপায় বের করার কথা স্থির করলেন। ১৪ই আগস্ট তিনি সৈয়দ আবদুস সেলিম ও ফজলুর রহমানকে সঙ্গে নিয়ে ঢাকা পৌঁছলেন এবং তাঁদের বন্ধু বান্ধব ও সমর্থকদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন; কিন্তু মুসলিম লীগ পার্টি হাউসের কোনো কর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন না। মানিকগঞ্জের আওলাদ হোসেন কামরুদ্দীন আহমেদের সঙ্গে তাঁর বাসভবনে দেখা করে খাজাদের কার্য-কলাপের বিষয়টি অবহিত করলেন। তিনি জানালেন যে রেজায়ে করিম ও ঢাকার ওয়াসেক খাজাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। এ খবর জানতে পেরে কামরুদ্দীন আহমেদ খুবই বিস্মিত এবং দুঃখিত হলেন। রেজায়ে করিম বামপন্থীদের বিশ্বস্ত সমর্থক ছিলেন, পার্টি-হাউসের কাজকর্মের জন্যেও তিনি যথেষ্ট অর্থ প্রদান করতেন। তিনি আশা করেননি যে, রেজায়ে করিম বামপন্থীদের ত্যাগ করে খাজাদের সঙ্গে যোগ দেবেন। আমার সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার পূর্বে আমার পূর্ববর্তী সম্পাদক হোসেন শহীদ সুহরাওয়ার্দী ওয়াসেককে শ্যামা-হক মন্ত্রিত্বের সঙ্গে জড়িত থাকার জন্যে মুসলিম লীগ থেকে বহিষ্কার করেন। মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক হবার পরেই আমি সে নিষেধ প্রত্যাহার করে নিয়ে ওয়াসেককে মুসলিম লীগের সদস্যভুক্ত করেছিলাম। একজন বিখ্যাত ছাত্রনেতা হিসাবে বাংলায় ওয়াসেকের কিছু পরিচিতি ছিলো। তাঁরা আশা করেননি যে, ওয়াসেক তাঁদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন।

কামরুদ্দীন আহমেদ, শামসুল হক, শামসুদ্দীন ও তাজউদ্দীন আহমেদ সহ অন্যান্যরা নারায়ণগঞ্জে খান সাহেব ওসমান আলীর বাসভবনে বামপন্থী নেতৃবৃন্দের একটি গোপন সভা করার কথা স্থির করলেন। তাঁরা সন্দেহ করেছিলেন যে, যদি ঢাকায় সভা অনুষ্ঠিত হয় তাহলে গোপনীয়তা বজায় থাকবে না। খাজা শাহাবুদ্দীনের চরেরা বামপন্থীদের কার্যকলাপের খবরাখবর সংগ্রহে ব্যাপৃত ছিলো। নারায়ণগঞ্জের সভা ২২শে সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় স্থির হয় যে, জেলা কাউন্সিলের সভা শেষ হওয়া পর্যন্ত কামরুদ্দীন আহমেদ, শামসুল হক এবং শামসুদ্দীন বামপন্থী সংগ্রামের পরিচালক হিসাবে কাজ চালিয়ে যাবেন।

কিন্তু এ সত্ত্বেও নারায়ণগঞ্জে গোপনীয়তা রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। সভায় উপস্থিত কোনো ব্যক্তি সভার সিদ্ধান্ত খাজা শাহাবুদ্দীনকে জানিয়ে দিয়েছিলো। ঢাকার পার্টি-হাউস টেলিফোনে ও টেলিগ্রাম যোগে ঢাকায় কি ঘটছে সে বিষয়ে আমাকে অবহিত করত। তাঁরা আমাকে জানালেন যে, খাজা শাহাবুদ্দীন বামপন্থীদের উপর এক আপোস নিষ্পত্তি চাপিয়ে দিতে চান। টেলিগ্রামে আমি তাঁদের এই মর্মে নির্দেশ দিলাম যে, "আপোস যদি সম্মানজনক হয় তাহলে শান্তি বজায় রাখো অন্যথায় সংগ্রাম চালিয়ে যাও। এটাই ইসলামের অনুশাসন।"

২৩শে সেপ্টেম্বর রাত ৮টায় রেজায়ে করিম ১৫০নং মোগলটুলীতে এসে কামরুদ্দীন আহমেদ, শামসুল হক এবং শামসুদ্দীনকে তাঁর গাড়িতে সঙ্গে নিলেন। যখন রেজায়ে করিমের গাড়ি দেওয়ান বাজারে তাঁর বাড়িতে পৌঁছলো তখন তাঁরা দেখলেন আরও দুটি গাড়ি সেখানে অপেক্ষা করছে। অপেক্ষমান গাড়িতে ছিলেন ফজলুর রহমান, সুলতানউদ্দীন আহমেদ, আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী, সৈয়দ আবদুস সেলিম এবং ডাক্তার মইজউদ্দীন। তিনটি গাড়ি পরিবাগের দিকে অগ্রসর হলো। রেজায়ে করিম তাঁদের সকলকে খাজা শাহাবুদ্দীনের বাসভবনে নিয়ে এলেন এবং খাজা তাঁদের অভ্যর্থনা করে চা পানে আপ্যায়িত করলেন। অন্য সকলকে অপর একটি কামরায় অপেক্ষা করতে বলে তিনি কামরুদ্দীন আহমেদ, শামসুল হক ও শামসুদ্দীনের সঙ্গে আলোচনা শুরু করলেন। খাজা সাহেব তাঁর স্বভাবসুলভ কপট ভঙ্গীতে মুসলিম লীগ পার্টি-হাউস কর্মীরা মুসলিম লীগের জন্যে যে অবদান রেখেছেন তার ভূয়সী প্রশংসা করলেন। তিনি তাঁদের সঙ্গে রাত দুটো পর্যন্ত মুসলিম লীগের বিভিন্ন সাংগঠনিক বিষয়ে আলোচনা করলেন। পরিশেষে খাজা শাহাবুদ্দীন তাঁর প্রস্তাবটি উত্থাপন করলেন। তিনি প্রস্তাব করলেন যে, তাঁর জায়গায় সৈয়দ আবদুস সেলিম ঢাকা জেলা মুসলিম লীগের সভাপতি হবেন এবং ফজলুর রহমান, সুলতানউদ্দীন আহমেদ, ডাক্তার মইজউদ্দীন, আওলাদ হোসেন ও আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী হবেন সহ-সভাপতি আর আসাদুল্লাহ হবেন সম্পাদক। তিনি আরও বললেন যে, কার্যনির্বাহী কমিটিতে পার্টি-হাউসের কিছু সংখ্যক নেতাকে নিতে তাঁর কোনো আপত্তি নেই। তিনি আবদুল হাকিম

বিক্রমপুরী, খান বাহাদুর আওলাদ হোসেন এবং ডাঃ. মইজউদ্দীনের স্বাক্ষরিত একটি দরখাস্ত তাঁদেরকে দেখালেন। দরখাস্তে তাঁরা ঢাকা জেলার অন্তর্ভুক্ত মহকুমাসমূহের মুসলিম লীগ সংগঠনের অস্তিত্বের প্রতি সন্দেহ আরোপ করে প্রার্থনা করেন যাতে জেলা লীগের নির্বাচন স্থগিত রাখা হয়। খাজা শাহাবুদ্দীন হুমকি দিলেন যে, যদি তাঁরা তাঁর আপোস ফর্মূলা গ্রহণ না করেন তাহলে তিনি অভিযোগের দরখাস্ত মেনে নেবেন এবং নির্বাচন বাতিল করবেন। তিনি জেলা মুসলিম লীগের সভাপতি হিসাবে তাঁর স্বাক্ষরিত একটি টাইপ করা নোটিশ তাঁদের দেখালেন যাতে নির্বাচন স্থগিত এবং দরখাস্তের অভিযোগের বিষয়ে একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগের কথা ছিলো। তিনি দাবী করলেন, যে প্রস্তাব তিনি করেছেন তাতে কামরুদ্দীন আহমেদ, শামসুল হক ও শামসুদ্দীনকে লিখিতভাবে রাজি হতে হবে।

এটা তাঁদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিলো যে, খাজা শাহাবুদ্দীনের আপোস ফর্মূলা মেনে তাতে স্বাক্ষর দান ছাড়া অন্য কোনো গতি নেই। তাঁরা লিখিতভাবে যে অঙ্গীকার করলেন তার থেকে শামসুদ্দীনকে বাইরে রাখার জন্যে কামরুদ্দীন আহমেদ তাঁকে পার্টি-হাউসে চলে যেতে নির্দেশ দিলেন। খাজা সাহেব তাঁর প্রস্তুত করা দলিলটি বের করে কামরুদ্দীন আহমেদ ও শামসুল হককে স্বাক্ষর করতে বললেন। তাঁরা বুঝাতে চেষ্টা করলেন যে, পার্টি-হাউসের পক্ষ থেকে কোনো শর্ত মেনে নেওয়ার অধিকার তাঁদের নেই। খাজা তাঁদেরকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, নারায়ণগঞ্জ সভায় বামপন্থীদের তরফ থেকে যে কোনো শর্ত মেনে নেওয়ার অধিকার তাঁদের দেওয়া হয়েছে। এর থেকে প্রতীয়মান হলো যে, নারায়ণগঞ্জেও খান সাহেব ওসমান আলীর বাসভবনে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থিত কোনো চর, খাজাদের জানিয়ে দিয়েছিলো। কোনো উপায়ান্তর না দেখে ভোর চারটের দিকে দলিলে স্বাক্ষর দিয়ে তাঁরা খাজা সাহেবের বাসভবন ত্যাগ করলেন।

খাজা শাহাবুদ্দীন এবং ফজলুর রহমান চালাকিতে পরাজিত হয়েছিলেন। কামরুদ্দীন আহমেদ ও শামসুল হক খাজার বাসভবন থেকে পার্টি-হাউসে ফিরে এলেন। তাঁরা স্থির করলেন যে, কাউন্সিল সভায় খাজা শাহাবুদ্দীনের তৈরী করা কার্যনির্বাহকদের নামের তালিকা প্রস্তাব করবেন শামসুল হক। এবং শামসুদ্দীন যিনি কামরুদ্দীন আহমেদ ও শামসুল হকের আপোস ফর্মূলায় স্বাক্ষর দানের পূর্বে খাজা সাহেবদের বাসভবন থেকে চলে এসেছিলেন, তিনি পার্টি-হাউসের তৈরী করা কার্যনির্বাহকদের নামের তালিকা সভায় প্রস্তাব করবেন। স্থির হলো, কাউন্সিল সদস্যরা শামসুল হকের প্রস্তাবের বিপক্ষে থাকবেন এবং শামসুদ্দীনের পক্ষ সমর্থন করবেন।

২৪শে সেপ্টেম্বর বেলা দুটোয় আহসান মঞ্জিলের বড় হল ঘরে কাউন্সিলের সভা অনুষ্ঠিত হলো। বিদায়ী সভাপতি খাজা শাহাবুদ্দীন তাঁর অলিখিত বক্তৃতায়

জেলা মুসলিম লীগকে চমৎকারভাবে সংগঠিত করার জন্যে পার্টি-হাউসের কর্মীদের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। প্রথম দফার বিষয়সূচী ছিলো কাউন্সিল সভায় সভাপতিত্ব করার জন্য সভাপতি নির্বাচন করা। শামসুল হক, এ. টি. এম. মাজহারুল হকের নাম প্রস্তাব করলে কাউন্সিল হাত উঠিয়ে ভোট প্রদান করল। রেজায়ে করিম ভোট পেলেন মাত্র চব্বিশটি এবং এ. টি. এম. মাজহারুল হক সভার সভাপতি নির্বাচিত হলেন। ফজলুর রহমান চিৎকার করে উঠলেন, "আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে।"

খাজা শাহাবুদ্দীন চেয়ার থেকে উঠে হলের বাহিরে চলে গেলেন। এরপর শামসুল হক খাজা শাহাবুদ্দীনের তৈরী করা কার্যনির্বাহকদের প্যানেল প্রস্তাব করলেন আর শামসুদ্দীন প্রস্তাব করলেন পার্টি-হাউসের তৈরী করা প্যানেল। শামসুল হকের প্রস্তাবের পক্ষে ভোট হলো কুড়িটি এবং অবশিষ্ট সমর্থন করল শামসুদ্দীনের প্রস্তাব। এভাবে ঢাকা জেলা মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হলেন মানিকগঞ্জের খান বাহাদুর আওলাদ হোসেন ও সম্পাদক নির্বাচিত হলেন শামসুদ্দীন। সভার কাজ শেষ হলে কাউন্সিল সদস্যরা উচ্চস্বরে মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ ধ্বনি তুলে হল ত্যাগ করলেন।

এভাবে ঢাকা জেলা মুসলিম লীগ খাজাদের বন্দীশালা থেকে মুক্ত হলো। সারা বাংলার জনগণ ঢাকা জেলা মুসলিম লীগের কাউন্সিল সদস্যদের সিদ্ধান্ত আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলো। কলকাতার দৈনিক পত্রিকাগুলি বড় বড় অক্ষরে ঢাকা মুসলিম লীগের নেতৃত্বের চমৎকার সাফল্যে অভিনন্দন জানিয়ে খবর পরিবেষন করেছিলো। পরের দিন ঢাকা মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ কলকাতায় এসে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ঢাকার ঘটনাবলী আমাকে জানালেন। শিয়ালদহ স্টেশনে মুসলিম লীগের যুব নেতাদের এক বিরাট অংশ এবং সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা তাঁদের অভ্যর্থনা জানাল। তাঁরা বিদায়ী সম্পাদক সৈয়দ আবদুস সেলিমের লিখিত বক্তৃতা আমাকে দিলেন যাতে তিনি ঢাকা জেলা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মুসলিম লীগকে সংগঠিত করার জন্যে পার্টি-হাউসের কার্যকলাপের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। সৈয়দ আবদুস সেলিম কাউন্সিল সভা শুরু হওয়ার সময়েই তাঁর বক্তৃতাটি প্রদান করেছিলেন।

খাজা শাহাবুদ্দীন এবং ফজলুর রহমান ঢাকার ঘটনাবলী বিবেচনার জন্যে কার্যনির্বাহী কমিটির সভা আহ্বান করতে আমাকে অনুরোধ জানালেন। সেই অনুযায়ী প্রাদেশিক মুসলিম লীগ অফিসে কার্যনির্বাহী কমিটির সভা আহ্বান করা হলো। সভার নির্ধারিত দিনে মুসলিম লীগের যুব নেতৃবৃন্দ বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে কলকাতায় এসে সময় মতো মুসলিম লাগ অফিসে সমবেত হলেন। প্রাদেশিক কার্যনির্বাহী কমিটির লোকজন সভায় যোগদান করতে মুসলিম লীগ অফিসে এলে যুব নেতৃবৃন্দের ভিড় দেখে শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। যুব নেতৃবৃন্দ মৃদু গুঞ্জরণে খাজা

এবং তাদের অনুচরদের জানিয়ে দিলেন যে, যদি তাঁরা ঢাকা জেলা মুসলিম লীগ কমিটির বৈধতা আনুষ্ঠানিকভাবে মেনে না নেন তাহলে তাঁরা কেউ অক্ষত অবস্থায় অফিস ত্যাগ করতে পারবেন না। এই ভীতি প্রদর্শন কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করেছিলো।

সৈয়দ আবদুস সেলিমের লিখিত বক্তৃতাটি আমি পাঠ করার পর কার্যনির্বাহী কমিটি শান্তভাবে ঢাকা জেলা মুসলিম লীগ কমিটিকে তাঁদের অনুমোদন প্রদান করলেন। সভাকক্ষে উপস্থিত যুবক নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন চট্টগ্রামের ফজলুল কাদের চৌধুরী, ঢাকার পার্টি-হাউসের শামসুল হক ও শামসুদ্দীন, বর্ধমানের নূরুল আলম ও শরফুদ্দীন, ফরিদপুরের শেখ মুজিবর রহমান এবং বরিশালের নূরুদ্দীন আহমেদ।

## কলকাতার লড়াই

প্রাদেশিক মুসলিম লীগের বাৎসরিক কাউন্সিল সভা নির্ধারিত হলো ১৯৪৪ সালের ১৭ই নভেম্বর। বঙ্গীয় মুসলিম লীগের নেতৃত্ব থেকে আমাকে উৎখাত করার জন্যে খাজারা তৎপরতা বৃদ্ধি করতে লাগলেন। তাঁরা দেখলেন সুহরাওয়ার্দীর সক্রিয় সমর্থন লাভ ছাড়া তাঁদের কোনো আশা নেই। তাঁরা আপ্রাণ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখলেন সুহরাওয়ার্দীকে তাঁদের দলে টানতে এবং পরিশেষে তাঁরা তাঁদের খেলায় জয়যুক্ত হলেন। সুহরাওয়ার্দী মারফৎ তাঁরা প্রাদেশিক কাউন্সিলের সদস্যদের উপর প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা চালালেন। সুহরাওয়ার্দীর ৪০নং থিয়েটার রোডের বাসভবনে ধারাবাহিকভাবে আপোস-আলোচনার ব্যবস্থা করা হলো। এই আপোস-আলোচনা চলাকালে খাজা নাজিমুদ্দীন এবং তদীয় ভ্রাতা খাজা শাহাবুদ্দীনের উপস্থিতিতে সুহরাওয়ার্দী বললেন, "হাশিম আপনি কি করছেন? খাজা নাজিমুদ্দীনের নেতৃত্বে একজন অধস্তন মন্ত্রী হিসাবে আমি খুবই সন্তুষ্ট রয়েছি।" সুহরাওয়ার্দী ভাবলেন, বামপন্থী সংগ্রামের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো খাজা নাজিমুদ্দীনকে পদচ্যুত করে সুহরাওয়ার্দীকে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী পদে বহাল করা। আমি বললাম, "খাজা নাজিমুদ্দীনের নেতৃত্বাধীনে অধস্তন মন্ত্রী হিসাবে আপনি সন্তুষ্ট অথবা অসন্তুষ্ট যাই থাকুন সেটা বিবেচনার বিষয় নয়। আমরা চাই মুসলিম লীগকে জনগণের সংগঠন হিসাবে গড়ে তুলতে।" প্রাদেশিক কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য সংখ্যা নির্ধারিত করা হয়েছিলো ২৭ জন। তাঁরা দাবী করলেন, খাজা শাহাবুদ্দীন ও হামিদুল হককে কার্যনির্বাহী কমিটিতে সদস্য হিসাবে নিতে হবে। আমি বললাম, তাঁদের একজনকে নেওয়া যেতে পারে, দু'জনকে নয়। বরিশালের পাবলিক প্রসিকিউটর আজিজুদ্দীনের নাম আমি প্রস্তাব করেছিলাম। আমি চেয়েছিলাম কার্যনির্বাহী কমিটিতে জেলা নেতৃবর্গের মধ্যে কোনো একজনকে নিতে হবে। তাঁরা রাজি হলেন না এবং দাবী করলেন তাঁদের তালিকার লোকদের কমিটির সদস্য

হিসাবে নিতে হবে। আমি তাঁদের তালিকার লোকদের গ্রহণ করতে অস্বীকার করলাম ফলে আপোস-আলোচনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলো।

১৫ই নভেম্বর রাত্রিতে সুহরাওয়ার্দীর শয়নকক্ষে প্রথম চক্রান্ত শুরু হয় এবং চক্রান্তকারীদের মধ্যে ছিলেন, সুহরাওয়ার্দী, খাজা নাজিমুদ্দীন, শাহাবুদ্দীন, ফজলুর রহমান, হামিদুল হক চৌধুরী, ইউসুফ আলী চৌধুরী, খুলনার আবদুস সবুর খান এবং ডাঃ এ. এম. মালেক। বসার ঘরে কলকাতা জেলা মুসলিম লীগের সম্পাদক ওসমান, ফরমুজুল হক এবং আমাকে বসিয়ে রাখা হয়েছিলো। রাত্রি আড়াইটার দিকে চক্রান্তকারীরা তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করেন। ওসমান এবং ফরমুজুল হক সুহরাওয়ার্দীর শয়নকক্ষে আমাকে নিয়ে গেলেন। সুহরাওয়ার্দী তাঁর অভিমত জানিয়ে বললেন, "হাশিম সাহেব, পার্টির সংহতির জন্যে আপনার উচিত সরে দাঁড়ানো। আমরা আপনার জায়গায় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে ডাঃ. মালেককে নেওয়া স্থির করেছি।" আমি রাজি হয়ে সেখান থেকে চলে এলাম।

সুহরাওয়ার্দী যখন তাঁর রায় পেশ করলেন তখন আবদুস সবুর খান খুশী হয়ে বলে উঠলেন, "আবুল হাশিম সাহেব একজন কম্যুনিস্ট এবং বাংলার সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত।" খাজা নাজিমুদ্দীন বিশ্বাস করতেন যে, আমি ইসলামকে আশ্রয় করে কম্যুনিজম প্রচার করি। কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রাক্কালে দৈনিক আজাদে একটি বেনামী চিঠি ছাপা হয়েছিলো এবং তাতে দোষারোপ করে বলা হয় যে আমার উদ্দেশ্য হলো বাংলার বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে কম্যুনিজমে দীক্ষিত করা। সূর্যোদয়ের পূর্বেই চক্রান্তকারীদের সিদ্ধান্ত কলকাতায় উপস্থিত কাউন্সিল সদস্যদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। বেনজীর আহমদ পাগলের মতো হয়ে গিয়ে চিৎকার করে বলতে লাগলেন, "আবুল হাশিম আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন।" প্রতিটি নিষ্পত্তিমূলক সিদ্ধান্তের সন্ধিক্ষণে সুহরাওয়ার্দীর সুবিধাবাদ প্রকাশ্যে ধরা পড়ত।

১৬ই নভেম্বর সকালের দিকে বারোজন যুবক কাউন্সিল সদস্যকে নিয়ে ফজলুল কাদের চৌধুরী ৬৪নং লোয়ার সার্কুলার রোডে আমার বাসভবনে এলেন। তাঁরা বললেন, "আমরা সুহরাওয়ার্দীর সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে দায়বদ্ধ নই।" তাঁরা আমাকে মুসলিম লীগ অফিসে নিয়ে গেলেন। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম লীগ কর্মী ও কাউন্সিল সদস্যদের ভিড় বাড়তে লাগল। দিনাজপুরের মৌলানা আবদুল্লাহ আল বাকী আমার কাছে এসে অনুরোধ করলেন সুহরাওয়ার্দী ও তাঁর বন্ধুদের সিদ্ধান্তকে মেনে নেওয়ার জন্যে সকলকে রাজি করাতে। আমি বললাম, "এটা আমার দায়িত্ব নয়। যাঁরা এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সেই সব নেতাদের উচিত যাতে কাউন্সিল সদস্যরা তাঁদের সিদ্ধান্ত মেনে নেন সে চেষ্টা করা।"

দুপুরের দিকে সুহরাওয়ার্দী আমাকে টেলিফোন করলেন এবং মুসলিম লীগ

অফিসে সমবেত লোকদের উপদেশ দিতে বললেন, তাঁরা যেন নেতাদের সিদ্ধান্ত মেনে নেন। আমি তাঁকেও সেই একই কথা বললাম। বিকেলের দিকে আমি মুসলিম লীগ অফিস ত্যাগ করলাম। সন্ধ্যের সময় সুহরাওয়ার্দী, খাজা নাজিমুদ্দীন এবং অন্যান্যরা মুসলিম লীগ অফিসে এলেন। তাঁরা জেলাগুলি থেকে আগত কাউন্সিল সদস্যদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত আলোচনা করলেন। এমন কি কলকাতা মুসলিম লীগের প্রতিনিধিরাও তাঁদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে রাজি হলেন না। পরিশেষে নেতারা কাউন্সিল সদস্যদের রায় মেনে নিতে বাধ্য হলেন। সুহরাওয়ার্দী আমার কাছে অনুরোধ জানিয়ে বার্তা পাঠালেন খাজা নাজিমুদ্দীনের থিয়েটার রোডের বাসভবনে তাঁর সঙ্গে পরের দিন সকালে দেখা করতে। স্যার নাজিমুদ্দীন আমাকে চা পানে আপ্যায়িত করলেন। তিনি বললেন, "আসুন আমরা আমাদের মত পার্থক্যের অবসান ঘটাই। এখন থেকে আমি আপনার লোক।"

১৭ই নভেম্বর বেলা দশটায় মহম্মদ আলী পার্কে চমৎকারভাবে সজ্জিত প্যাণ্ডেলে কাউন্সিলের সভা শুরু হলো। আমি ১৯৪৩ সালের প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ছাপা কার্যবিবরণী পাঠ করলাম। মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে যখন আমি রিপোর্টটি পাঠ করছিলাম তখন নাজিমুদ্দীনের উদ্দেশে সুহরাওয়ার্দীকে বলতে শুনলাম, "নাজিমুদ্দীন, যে লোকটি এত সুন্দর বক্তৃতা দিচ্ছে তাকে আপনি ধ্বংস করতে চান।"

১৯৪৪ সালে আমাদের সদস্য সংখ্যা দাঁড়িয়েছিলো পাঁচ লক্ষেরও বেশী। বরিশাল থেকে ১,৬০,০০০, ঢাকা থেকে ১,০৫,০০০ ফরিদপুর থেকে ৬০,০০০, নোয়াখালি থেকে ৫০,০০০ ময়মনসিংহ থেকে ৪১,০০০, চট্টগ্রাম থেকে ৪০,০০০ দিনাজপুর থেকে ২৪,৫০০, রংপুর থেকে ১৩,৪৭০, মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর মহকুমা থেকে ২,০০০। বরিশাল জেলা সংগঠিত করেছিলেন এ্যাডভোকেট শমসের আলী।

যে রিপোর্টটি আমি পেশ করেছিলাম সেটি কাউন্সিল সদস্যরা হর্ষধ্বনি সহকারে গ্রহণ করলেন। মৌলানা আকরাম খাঁ সভাপতি এবং আমি সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হলাম। এটা সত্যিকার অর্থে ছিলো মুসলিম লীগের যুব নেতৃবর্গেরই জয়। নির্বাচন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মৌলানা আকরাম খাঁ দীর্ঘ হর্ষধ্বনির মাঝে নাটকীয় ভঙ্গীতে আমার ও তাঁর পুত্র খায়রুল আনম খানের কাঁধে হাতে রেখে বললেন, "খায়রুল আনম এবং আবুল হাশিম আমার দুই পুত্র।"

আমার সঙ্গে চূড়ান্ত আলাচনার পর স্থির হলো, পরের দিন ১৮ই নভেম্বর কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আমার অনুমতি না নিয়ে এবং আমাকে না জানিয়ে খাজা নাজিমুদ্দীনের গ্রুপের লোকদের সঙ্গে পরামর্শ করে সুহরাওয়ার্দী কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের তালিকা প্রস্তুত করে নিলেন।

মেকিয়াভেলির একজন অনুরক্ত শিষ্য খাজা শাহাবুদ্দীন সুহরাওয়ার্দীকে মৃদুস্বরে বললেন, "সভা আনন্দে মেতে রয়েছে। কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের তালিকা পাশ করে নেওয়ার এখনই উত্তম সুযোগ।" ঐ তালিকার মধ্যে খাজা শাহাবুদ্দীন এবং হামিদুল হকের নাম ছিলো। কিন্তু খাজা শাহাবুদ্দীনের বিজ্ঞতা বিফল হলো। আনন্দ বিরক্তিতে পরিণত হলো। কেউ-ই সুহরাওয়ার্দীর প্রস্তাবে এগিয়ে এলেন না। সুহরাওয়ার্দী তাঁর চেয়ারে উপবেশন করার আগে বললেন, যদি তাঁর প্রস্তাব মেনে নেওয়া না হয় তাহলে তাঁরা কেউ-ই কার্যনির্বাহী কমিটির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখবেন না।

এ ব্যাপারে সুভাষচন্দ্র বসুর কথা আমার স্মরণ হলো। ১৯৩৯ সালে গান্ধীর মনোনীত প্রার্থী ডাঃ. পট্টভী সীতারামাইয়াকে পরাজিত করে সুভাষ বোস নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। গান্ধীজী ঘোষণা করেন, সীতারামাইয়ার পরাজয় তাঁর পরাজয়। কংগ্রেসের নেতারা সুভাষচন্দ্রের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য হিসাবে কাজ করতে অস্বীকার করেন। এর অবসম্ভাবী ফল হিসাবে সুভাষচন্দ্রকে পদত্যাগ এবং কংগ্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন করতে হয়। আমি সঙ্গে সঙ্গে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম। মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে আমি কাউন্সিলারদের বললাম, "সুহরাওয়ার্দী আমার অজ্ঞাতে এবং আমার পরামর্শ না নিয়েই কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের নাম প্রস্তাব করেছেন। তথাপি আপনাদের কাছে আমার উপদেশ, যেভাবে পবিত্র পয়গম্বর (সাঃ) হুদায়বিয়ার সন্ধি মেনে নিয়েছিলেন সেইভাবে আপনারাও এই প্রস্তাব মেনে নিন। এতে আপনাদের জয় সূচিত হবে।" আমি সভাপতিকে উপদেশ দিলাম পরের দিন বেলা ১টা পর্যন্ত কাউন্সিলের সভা স্থগিত রাখতে। সভা তদনুযায়ী স্থগিত রইল। সুহরাওয়ার্দী আমাকে ভালো একটি সুন্দর হোটেলে নিয়ে গিয়ে ঠাণ্ডা পানীয় জল পান করিয়ে অনুরোধ করে বললেন, আমার সম্মান রক্ষা করুন।

সুহরাওয়ার্দীর প্রস্তাব মেনে নেওয়ার জন্যে কাউন্সিলের সদস্যদের রাজি করাতে আমাকে সারাটা দিন পরিশ্রম করতে হয়েছিলো। ১৯শে নভেম্বর সুহরাওয়ার্দীর প্রস্তাব গৃহীত হলো। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক পদাধিকার বলে কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ছিলেন। নির্বাচিত অন্য ১৬ জন হলেন :

স্যার খাজা নাজিমুদ্দীন, স্যার এফ. রহমান, লেঃ. কর্ণেল স্যার হাসান সুহরাওয়ার্দী, হোসেন শহীদ সুহরাওয়ার্দী, খাজা শাহাবুদ্দীন, খান বাহাদুর এম.এ. মোমেন (সি. আ. ই.), খান বাহাদুর তমিজউদ্দীন খান, হামিদুল হক চৌধুরী, বরিশালের আজিজউদ্দীন, ইউসুফ আলী চৌধুরী, নূরুল আমিন, রংপুরের আহমেদ হোসেন, রাগীব আহসান, ওসমান, এম. এ. এইচ. ইস্পাহানী এবং কুষ্টিয়ার এম.এস. আলী।

পরবর্তী সময়ে কার্যনির্বাহী কমিটির ন'জন সদস্য সভাপতি কর্তৃক মনোনীত হয়েছিলেন। ঢাকার আসাদউল্লাহ তাঁদের অন্যতম।

## খসড়া ঘোষণাপত্র

১৯৪৪ সালের ডিসেম্বর মাসে আমার বাসা ৬৪ নং লোয়ার সার্কুলার রোড থেকে পরিবর্তন করে মুসলিম লীগ পার্টি-হাউস ৩নং ওয়েলেসলি ফার্স্ট লেনে উঠে এলাম। সেখানে দোতলার একটি কামরায় থাকতে লাগলাম। এই কামরাটি খুবই অস্বাস্থ্যকর ছিলো। কামরাটির উত্তর দিকের খোলা জানালা দিয়ে রাস্তা দেখা যেত। শহীদ সুহরাওয়ার্দীর মামা লেঃ. কর্ণেল স্যার হাসান সুহরাওয়ার্দী যখনই আমার কাছে আসতেন তখনই বলতেন হাশেম এখনই এই অস্বাস্থ্যকর কামরা ত্যাগ করো। এই কামরায় শহীদের মা মারা যান। কামরাটিতে আমি শোবার একটি খাট এবং একটি ছোট সোফা রেখেছিলাম। ১৯৪৫-৪৬ দুই বৎসর এখানেই ছিলাম। এই কামরাটি ছিলো আমার একাধারে শয়নকক্ষ, খাবার ঘর এবং বৈঠকখানা। মহাম্মদ সিদ্দিক নামে ঢাকার একটি চটপটে চালাক যুবক আমার কাজকর্মে সহায়তা করত এবং সে খুবই বিশ্বস্ত ও সৎ ছিলো।

যখন থেকে আমি পার্টি-হাউসে এসে থাকতে শুরু করলাম তখন থেকেই এটা বঙ্গীয় মুসলিম লীগ রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হলো। প্রতিদিন বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত শত শত দর্শনপ্রার্থীদের সাক্ষাৎ দান করতে হতো। দর্শন প্রার্থীদের ভিড় হতো প্রায় সব সময়। মুসলিম লীগের যুব নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের সঙ্গে রাত্রিতে আলোচনা করতাম ইসলামের মৌলিক তত্ত্বসমূহ, রাজনৈতিক সংগ্রাম ও পার্টি সংগঠন, দর্শন এবং সমাজবিজ্ঞান। রাতে ঘুমোতাম আড়াইটার দিকে। শেখ মুজিবর রহমান আমার রাতের ক্লাসে থাকতেন কিন্তু এই তাত্ত্বিক আলোচনায় তাঁর উৎসাহ ছিলো খুবই কম। তিনি প্রায়ই ঘুমিয়ে পড়তেন এবং সকালে উঠে জিজ্ঞেস করতেন কি করতে হবে। তিনি কাজের লোক ছিলেন কিন্তু চিন্তা-ভাবনা করার লোক ছিলেন না। অবশ্য তাঁর কর্তব্য-কর্ম তিনি ঠিক মতোই করতেন। আমি তাঁদের শিক্ষা দিতাম যাকে আমি আমার রাজনৈতিক সংগ্রামের ব্যাকরণ বলি। তাঁদের শিক্ষা দিতাম তাঁরা যেন নিজেদের আদর্শকে ভালোভাবে বুঝতে শেখেন। অন্যের মতামতের প্রতি সহিষ্ণুতার মনোভাব তৈরী করার উপরও জোর দিতাম। নিজেদের আদর্শের ভিত্তিতে পার্টিকে সুসংহত করা, যতদূর সম্ভব মিত্র সংগ্রহ করা, যাদের মিত্র করা সম্ভব নয় তাদের নিরপেক্ষ রাখা, বিপক্ষ দলের পালের বাতাস কেড়ে নেওয়া, তাদের বোঝানো যে তাদের উদ্দেশ্য ঠিক নয়; এবং পরিশেষে শত্রুকে বিচ্ছিন্ন করে সরাসরি সংগ্রাম করে তাকে পরাভূত করা। এগুলোই ছিলো রাজনৈতিক সংগ্রামে আমার ব্যাকরণের মৌলিক নীতি।

নিখিল ভারত মুসলিম লীগের হোমরা-চোমরা নেতৃবৃন্দ তাঁদের বক্তৃতা, বিবৃতি এবং আলোচনা সভায় কংগ্রেসের উপর অগ্নিবর্ষণ করতেন। তার পাল্টা হিসাবে

কংগ্রেসের হোমরা-চোমরা নেতৃবৃন্দও মুসলিম লীগ এবং লীগের নেতাদের ইচ্ছে-মতো কটুকাটব্য করতেন। এটা ভারতের হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিভেদকে বাড়িয়ে তুলছিলো। বাংলার মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ এবং কর্মীদের নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলি বর্জন করে মার্জিত ভাষায় তাঁদের মতামতের যৌক্তিকতা সঠিকভাবে জনসাধারণের কাছে উপস্থিত করতে আমি তাঁদের পরামর্শ দিতাম। ১৯৪৫ সালে মিসেস সরোজিনী নাইডুর সঙ্গে আমার যখন দেখা হয় তখন তিনি মন্তব্য করেন, "মধ্যপ্রদেশের মুসলিম লীগে আপনার মতো যদি আমরা একজন সাধারণ সম্পাদক পেতাম তাহলে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে সমস্ত পার্থক্যের মীমাংসা হতে পারত।" তখন মধ্যপ্রদেশ ছিলো গান্ধীর প্রধান কর্মকেন্দ্র। পরবর্তীকালে ১৯৪৭ সালে গান্ধী দুঃখ করে বলেছিলেন পূর্বে কেন তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটেনি। রাজনীতিতে আমার উদারনীতিকে খাজা নাজিমুদ্দীন এবং তাঁর গ্রুপের লোকেরা কম্যুনিস্ট ও হিন্দুদের প্রতি আমার দুর্বলতা বলে ধরে নিতেন।

১৯৪৫ সাল ছিলো আমার জন্যে দীর্ঘ সফরের বছর। যে এলাকাগুলিতে আমি সফর করতাম সেখানকার প্রধান নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ এবং ঘরোয়া আলাপ আলোচনা করার ফলে রাজনৈতিক সংগ্রামে জয়লাভ ও পার্টি সংগঠন করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছিলো। কলকাতার বাইরে একাধিক সপ্তাহ আমাকে বিরামহীনভাবে বক্তৃতা সফরে যেতে হতো। দীর্ঘ সফরকালে আমি কখনও কোনো পূর্বনির্ধারিত অনুষ্ঠান বাদ দিতাম না। একবার আমি একটানা পঁয়তাল্লিশ দিন সফরের কর্মসূচী নিয়েছিলাম। সফর-সূচী যখন ছাপা হলো তখন সুহরাওয়ার্দী আমাকে বলেছিলেন, "হাশিম আপনি আত্মহত্যা করতে চলেছেন। আমরা আপনার জন্যে কিছু অর্থসংগ্রহ করেছি, অনুগ্রহ করে গ্রহণ করুন এবং আপনার স্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দিন।" আমি ধন্যবাদ জানিয়ে সুহরাওয়ার্দীকে বললাম, "আপাতত টাকাটা আপনার কাছে রাখুন, প্রয়োজন হলে পরে গ্রহণ করব।" পঁয়তাল্লিশ দিন সফর শেষে সুহরাওয়ার্দীর কাছ থেকে আমি টাকাগুলি গ্রহণ করে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যয় করেছিলাম।

আমার প্রতি সুহরাওয়ার্দীর একটা কোমল অনুভূতি ছিলো এবং আমি সব সময়েই সে অনুভূতির প্রতিদান দিতাম। কিন্তু তিনি প্রায়ই খাজাদের দুরভিসন্ধির আবর্তে পতিত হতেন। খাজারা ছিলেন তদানীন্তন পার্লামেণ্টারী পার্টির নেতা। সুহরাওয়ার্দী আমার স্ত্রীর খালাতো ভাই ছিলেন। তাঁর মা এবং আমার শ্বাশুড়ী ছিলেন আপন বোন। খাজাদের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক ত্যাগ করতে মানসিক-ভাবে তিনি কোনো দিন প্রস্তুত ছিলেন না এবং সেই সঙ্গে তাঁর ক্ষমতার রাজনীতির গরজে বামপন্থীদের বিরাগভাজন হতেও চাইতেন না। এভাবে তিনি সব সময়ে বাম ও দক্ষিণে ঘোরাফেরা করতেন।

১৯৪৪ সালে মুসলিম লীগ মঞ্চ থেকে যে আদর্শ আমি প্রচার করেছিলাম তাকে

সংগঠিত ও সুসংবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে জনসাধারণের কাছে একটি ঘোষণাপত্র উপস্থিত করার প্রয়োজনীয়তার কথা আমি দৃঢ়ভাবে উপলব্ধি করলাম। নিখিল চক্রবর্তী নামে একজন খুবই যোগ্য কম্যুনিস্ট যুবক খসড়াটি তৈরী করার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করেন। খসড়াটি ইসলামের পয়গম্বর এবং তাঁর বিশ্বস্ত সাহাবাদের দ্বারা প্রচারিত ও অনুশীলিত ইসলামের সর্বজনীন মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে তৈরী হয়েছিলো।

ভারত উপমহাদেশে ইসলাম সরাসরি মদিনার খোলাফায়ে রাশেদীন থেকে আসেনি। তা এসেছিলো ইরানের মাধ্যমে আরব সাম্রাজ্যবাদের রাজধানী বাগদাদ থেকে। আরবরা ইরান জয় করেছিলো এবং ইরানীরা সংস্কৃতির দিক দিয়ে আরবকে জয় করেছিলো। ফলস্বরূপ ইরানের প্রাক-ইসলামিক সংস্কৃতির সঙ্গে খাঁটি ইসলামের মিশ্রণ ঘটে। ভারতের গোঁড়াপন্থী ইসলামী সম্প্রদায় ইরান থেকে প্রাপ্ত বাগদাদের বিকৃত ইসলাম প্রচার ও অনুশীলন করে এসেছে এবং তাদের মতে মদিনার ইসলাম হচ্ছে কম্যুনিজম। এজন্যই খাজা নাজিমুদ্দীন মনে করতেন যে, ইসলামকে আশ্রয় করেই আমি কম্যুনিজম প্রচার করতাম।

খাজা নাজিমুদ্দীন একজন সৎ এবং অতিশয় সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন। যখনই আমি তাঁর কথা বলি তখনই আমি বোঝাতে চাই সেই নাজিমুদ্দীনকে যিনি তাঁর ছোট ভাই খাজা শাহাবুদ্দীন এবং ফজলুর রহমান কর্তৃক পরামর্শ প্রাপ্ত ও নিয়ন্ত্রিত। খাজা নাজিমুদ্দীন তাঁর উপদেষ্টাদের বিজ্ঞতার প্রতি অপরিসীম আস্থা পোষণ করতেন।

আমার খুব ভালোভাবেই জানা ছিলো, যে ঘোষণাপত্র আমি তৈরী করেছিলাম তাকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কার্যনির্বাহী কমিটি কখনও স্বীকৃতি প্রদান করবেন না। কাজেই কার্যনির্বাহী কমিটিতে তাদের বিবেচনার জন্য পেশ না করে সেটি মুসলিম লীগের কাউন্সিলে পেশ করলাম। খসড়াটি ছাপা হলো এবং সেটি পার্টির প্রগতিশীল অংশ ও মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা অভিনন্দিত হলো। এটি ছাপার সঙ্গে সঙ্গে সুহরাওয়ার্দী পার্টির সভাপতি মৌলানা আকরাম খাঁকে একটি পত্র লেখেন। পত্রতে তিনি খসড়া ঘোষণাপত্র ছাপার কি অধিকার আমার আছে সে বিষয়ে প্রশ্ন তোলেন এবং আমার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্যে দাবী করেন। মৌলানা আকরাম খাঁ চিঠিটি আমার কাছে পাঠিয়ে দিলে আমি সেটি ফাইল করে রাখি। হামিদুল হক চোধুরী মন্তব্য করেন, ম্যানিফেস্টো শব্দটি কম্যুনিস্ট শব্দ। মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াশীলদের এই ছিলো প্রতিক্রিয়া। বাংলার এবং আসামের প্রগতিশীল অংশগুলি খসড়া ঘোষণাপত্রটিকে তাঁদের চিন্তা ও কর্মের দিশারী হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৪৫ সালের ২৪শে মার্চ খসড়াটি ছাপা হয়েছিলো।

ঘোষণাপত্রটি মুসলিম লীগ যুব নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের চিন্তা এবং কর্মের ক্ষেত্রে

দৃঢ় ভিত্তি প্রদান করেছিলো। খসড়াটিতে মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াশীল এবং বাগ-দাদী ইসলামের গোঁড়া সমর্থকরা কম্যুনিজমের আভাস পেয়েছিলো। মুসলিম লীগের শত্রুরা মুসলমানদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িকতা হিসাবে আখ্যায়িত করেছিলো। ঘোষণাপত্রটিতে সাম্প্রদায়িকতার কোনো কিছু ছিলো না। তাতে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয় যে, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের একই অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে এবং ইসলামের মৌলিক নীতি অনুসারে জীবন গঠনের অধিকার ছাড়া মুসলমানদের জন্য কোনো বিশেষ অধিকার সংরক্ষিত হবে না। অমুসলিমদের কেবল যে সমান অধিকার থাকবে তাই নয়; স্বাধীন এবং সার্বভৌম রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকরা তাঁদের প্রতি সদাশয় আচরণও করবেন। প্রাপ্ত বয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে আমি সংবিধান সভা গঠনেরও প্রস্তাব করেছিলাম।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অভিমত ছিলো, মুসলিম লীগ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদের দালাল। এই ধারণা ছিলো সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির আভ্যন্তরীণ মতবিরোধ সত্বেও খসড়া ঘোষণাপত্রটিতে ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে উচ্ছেদ করার সংগ্রামে সকল রাজনৈতিক দলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্যে আবেদন জানানো হয়েছিলো। খসড়াটিতে প্রস্তাব ছিলো ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের সংগ্রামে ভারতের মুসলমানদের উচিত মুসলিম লীগের পতাকাতলে মিলিত হওয়া। এতে প্রস্তাব ছিলো বিদ্যমান রাজনৈতিক অচলাবস্থাকে ভেঙে দিয়ে সকল সম্প্রদায়, দল ও স্বার্থের এবং অন্যান্য ভারতবাসীদের মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে মুসলমানদের মুক্তি সংগ্রামের সমন্বয় সাধনের।

১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী আসাম এবং বাংলা নিয়ে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের কথা ছিলো। ঘোষণাপত্রটিতে সর্বসাধারণের মৌলিক অধিকারকে স্বীকৃতি এবং সেই সার্বভৌম রাষ্ট্রে তার বাস্তব রূপায়ণ প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। অন্যান্যের মধ্যে একথা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ ছিলো যে, শর্তহীন আইনের শাসন হবে মূল ভিত্তি যার উপর রাষ্ট্রের কাঠামো তৈরী হবে। জনসাধারণের স্বাধীনতা ও আত্মসমর্থনের অধিকার স্বীকৃত এবং সংরক্ষিত হবে। শ্রম, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের অধিকার, এই তিনটি অধিকার হলো মানুষের প্রধান অধিকার। পুরুষ ও মহিলা উভয়কেই সমান সুযোগের অঙ্গীকার দিয়ে প্রত্যেক কর্মক্ষম ব্যক্তিকে রাষ্ট্র কাজের নিশ্চয়তা দেবে। রাষ্ট্র শিক্ষার দায়িত্ব নেবে এবং প্রাথমিক শিক্ষা হবে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক। জমির একচেটিয়া মালিকানা, ভূমি রাজস্বের বিলোপ সাধন এবং প্রধান প্রধান শিল্প প্রতিষ্ঠান ও যানবাহন জাতীয়করণ করা হবে। মজুরদের শ্রমের ফল তাদের ভোগের সুবিধা দেওয়া হবে। এসব দাবীর নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য আইনসম্মত ব্যবস্থা নিতে হবে। ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার, বেকার-বীমা, বয়স্কদের পেনশন এবং সর্বনিম্ন বেতন ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকবে। ভূমি রাজস্ব স্বার্থের বিলোপ এবং কৃষকদের অধিকারসমূহ সংরক্ষণ করা

হবে। কৃষকদের মালিকানা প্রতিষ্ঠা, সমষ্টিগতভাবে জমির চাষাবাদ, সমবায় সমিতির মাধ্যমে ক্রয় বিক্রয়কে উৎসাহ প্রদান করা হবে। অমুসলিমদের সুযোগ সুবিধা সংরক্ষণের দায়িত্ব থাকবে মুসলিম লীগের উপর। অমুসলিম সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির উপর হস্তক্ষেপ চলবে না। হরিজন সম্প্রদায়ের সম-অধিকারকে নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে। ঘোষণাপত্রটি সম্পূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল এবং পরিপূর্ণভাবে জনসাধারণের মঙ্গল সাধনের অনুকূল ছিলো।

মর্নিং নিউজ ১৯৪৫ সালে ৫ই এপ্রিলের সম্পাদকীয়তে ঘোষণাপত্রটির উপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলো, "এই প্রোগ্রামকে যদি প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যা দেওয়া হয় তাহলে এ সত্য আমাদের স্বীকার করতে হবে যে প্রগতিশীল প্রোগ্রাম যে কি তা আমরা জানি না।" ঘোষণাপত্রটি মুসলিম লীগের সমালোচকদের পালের বাতাস কেড়ে নিয়েছিলো। এই খসড়া ঘোষণাপত্রটি মুসলিম লীগের অনুসারীদের দৃষ্টিভঙ্গীকে বিস্তৃত ও প্রশস্ত করেছিলো। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, ন্যায়ের জন্য তাঁরা সংগ্রাম করছেন।

## দীর্ঘ সফর

আমি পঁয়তাল্লিশ দিনের এক সফর-সূচী ঘোষণা করলাম। এটাকে আমি বলতে পারি প্রয়তাল্লিশ দিনের লং মার্চ। আমি আমার অঙ্গীকার যথাযথভাবে রক্ষা করে-ছিলাম। সফরের তৃতীয় সপ্তাহে বরিশাল জেলার পটুয়াখালীতে এসে আমি উপস্থিত হলাম। সেখানে পৌছে দেখা গেলো আমার ঘাড়ের ডান দিকে একটি বিষফোড়া বের হয়েছে। চিকিৎসকরা আমাকে কলকাতায় ফিরে গিয়ে চিকিৎসা করার পরামর্শ দিলেন। আমি তাঁদের কথা না শুনে ঘাড়ে বিষফোড়া নিয়ে আমার সফর অব্যাহত রাখলাম। সফরের চতুর্থ সপ্তাহে আমি নোয়াখালীতে এসে পৌছনোর পর ঘাড়ের বাঁদিকে আরেকটা বিষফোড়া দেখা দিলো। কিন্তু তথাপি আমি সফর অব্যাহত রাখলাম। আমার সফরের শেষদিকে পঁয়তাল্লিশ দিনের দিন আমি যশোর জেলার বনগাঁয়ে এসে পৌছলাম।

সিরাজুল ইসলাম ছিলেন বনগাঁ মুসলিম লীগ নেতা এবং বনগাঁয়ে তাঁর বাড়িতে আমি অতিথি ছিলাম। বেলা দুটোর দিকে স্থানীয় বিরাট জনসমাবেশে বক্তৃতা দেবার জন্যে আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো। বিখ্যাত কণ্ঠশিল্পী আব্বাসউদ্দান আহমেদকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিলো। মুসলিম লীগ কর্তৃক আয়োজিত সম্মেলন ও জনসভার শেষ পর্যায়ে আব্বাসউদ্দীন গান গাইতেন। কলকাতায় আব্বাসউদ্দীনের জরুরী কাজ ছিলো এবং আমার বক্তৃতার আগে তিনি গান গাওয়া শেষ করার জন্য আমার অনুমতি চাইলেন যাতে সময় মতো কলকাতা পৌছে তিনি তাঁর কাজ করতে পারেন। আমি অনুমতি দিলে তিনি কাজী নজরুল ইসলাম বিরচিত কয়েকটি ভালো গান গেয়ে শোনালেন। গান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে

মাইক্রোফোনটি ডান হাতে ধরলাম এবং বাঁ হাতে রুমাল দিয়ে বিষ ফোড়াটি চেপে ধরে বক্তৃতা শুরু করলাম। আমার বক্তৃতাটি ছিলো দীর্ঘ এবং সকলে একাগ্রচিত্তে বক্তৃতা শুনলেন। বক্তৃতা শেষ করে দেখলাম আমার ডানপাশে চেয়ারে আব্বাসউদ্দীন বসে আছেন। আব্বাসউদ্দীন বললেন, হাশেম সাহেব আপনার চমৎকার বক্তৃতার জন্যে আপনাকে অভিনন্দন জানাই। আপনি যখন বক্তৃতা শুরু করলেন তখন আমি ঘড়ি দেখে মনে করলাম পনেরো মিনিটের মতো আপনার বক্তৃতা শোনা যাবে। আপনার বক্তৃতায় আমি এতই তন্ময় হয়ে পড়েছিলাম যে ট্রেন ধরতে পারলাম না।

সভা শেষে সিরাজুল ইসলাম সাহেবের বাড়িতে ফিরে এসে পঁয়তাল্লিশ দিন ভ্রমণ সার্থকভাবে শেষ করার জন্যে আল্লাহর কাছে ধন্যবাদ জানিয়ে নামাজ পড়লাম। যখন একজন যুবক চিকিৎসক এবং আমার বন্ধু জাফর, বরিক তুলো নিয়ে বিষ ফোড়াটি আস্তে চাপ দিয়ে পুঁজ বের করে দিলেন তখন আমি বেশ সুস্থ বোধ করলাম। মনে হলো আমার কোনো কষ্টই ছিলো না। জাফর সাহেব বর্ধমান মেডিক্যাল স্কুল থেকে ডাক্তারী পাশ করেন এবং তিনি একজন ভালো ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন। পরের দিন নিরাপদে সুস্থ শরীরে কলকাতা পৌছলাম। আমি সব সময়ে দুই সফরের মধ্যবর্তী সময়ে বর্ধমানে গিয়ে কয়েকদিনের জন্যে বিশ্রাম নিতাম। এই সফরের পরেও আমি তাই করলাম।

## চালাকচর সম্মেলন

ঢাকা জেলা মুসলিম লীগ নরসিংদীর কাছে চালাকচর নামে এক গ্রামে ঢাকা জেলা মুসলিম লীগের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। ঐ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার জন্যে তাঁরা আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন। টাঙ্গাইলের শামসুল হক এবং ঢাকার শামসুদ্দীন আহমেদ ঐ সম্মেলনের সংগঠক ছিলেন। চালাকচর অঞ্চলটি ঢাকায় খাজাদের জায়গীরভুক্ত ছিলো। গ্রামটিতে তাঁদের জায়গীরের একটি স্থায়ী অফিস ছিলো। ১৯৩৬ সালে এই এলাকা খাজা নাজিমুদ্দীনের মামাতো ভাই সৈয়দ আবদুস সেলিমকে বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য নির্বাচিত করেছিলো।

নিজেদের প্রভাবাধীন অঞ্চলে আমার সভাপতিত্বে কোনো সম্মেলন করা খাজারা পছন্দ করলেন না। তাঁরা সৈয়দ আবদুস সেলিমকে সভাটি পণ্ড করার জন্যে নিযুক্ত করলেন। সেলিম চালাকচরে উপস্থিত হয়ে লোকজনদের সতর্ক করে দিলেন যাতে শামসুল হক, শামসুদ্দীন এবং অন্য কর্মীদের কোনো আশ্রয় দেওয়া না হয়। গ্রামে একটি মাদ্রাসা ছিলো। সেই মাদ্রাসার শিক্ষক তাঁদের জায়গীরের কর্মচারীদের নিয়ে একটি গুণ্ডাবাহিনী তৈরী করল এবং ঢাকা থেকেও বেশ কিছু সংখ্যক গুণ্ডা তারা ভাড়া করে নিয়ে এল। প্রতিদিন তারা চালাকচর ও তার

পার্শ্ববর্তী গ্রামে ঘোরাঘুরি করে প্রস্তাবিত সম্মেলনে যোগদান করলে ভয়াবহ পরিণতি হবে এই মর্মে লোকজনদের সতর্ক করে দিত। তারা লোকজনদের আতঙ্কের মধ্যে রেখেছিলো এবং আবদুস সেলিম এই কর্মকাণ্ডের অধিনায়ক ছিলেন।

কমরেড আনন্দ পালের নেতৃত্বে ঐ অঞ্চলের কৃষক সমিতি শামসুল হক, শামসুদ্দীন এবং তাঁদের দলের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেছিলো। কম্যুনিস্ট পার্টির কৃষক ফ্রন্ট, কৃষক সমিতির উদ্দেশ্য ছিলো ঐ অঞ্চলে জমিদারদের আধিপত্যকে ভেঙে দেওয়া। স্থানীয় মুসলিম লীগ কর্মী এবং কৃষক সমিতি দিবারাত্রি কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। সম্মেলনের দিন যতই ঘনিয়ে আসতে লাগল উত্তেজনা ততই বৃদ্ধি পেতে থাকল। আমি সম্মেলনে যোগদান করার জন্যে সময় মতো ঢাকায় এসে পৌছলাম। এবার আমার বন্ধু জিল্লুর রহমান সাহেব, যিনি ঝিলু মিয়া নামে সমধিক পরিচিত, আমার সঙ্গে ছিলেন। তিনি ছিলেন বেশ লম্বা, স্বাস্থ্যবান, সুপুরুষ মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি। তিনি নানা রঙের পোশাক পরতে ভালো-বাসতেন। তাঁর ছিলো ঝকঝকে একটি কারাকুলি টুপি, একটি সাদা ভেড়ার চামড়ার টুপি, খাকী রঙের ব্রিচেস এবং তকমা ও পদকে সুসজ্জিত লাল জ্যাকেট। তিনি তাঁর কোমরের বেল্টে বেঁধে রাখতেন একটি খেলনা রিভলভার এবং হাতে রাখতেন সুন্দর লম্বা বাঁশের তৈরী ছড়ির সঙ্গে একটি লোহার বল্লম। ঝিলু মিয়া তাঁর আশপাশের লোকজনদের বেশ দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। সকালে একদল যুব মুসলিম লীগ কর্মী সমভিব্যাহারে চালাকচর রওয়ানা হলাম।

পথিমধ্যে নানা ধরনের দুঃসংবাদ শুনতে পেলাম, মনে হলো বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে। তথাপি আমরা চালাকচরের দিকে অগ্রসর হতে লাগলাম। গ্রামটির কয়েক মাইল আগে নৌকা করে আমরা একটি নদী পার হলাম। নৌকা থেকে ঝাঁপ দিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে নৌকার পাশাপাশি সাঁতার কেটে নদীতে গোসল করলাম। নদীর অপর পারে কয়েকটি গরুর গাড়ি আমাদের সম্মেলন স্থলে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত রাখা ছিলো।

আমাদের চলার পথে সেলিমের গুণ্ডাদলের সঙ্গে মুসলিম লীগ ও কৃষক সমিতির কর্মীদের তীব্র সংঘর্ষের খবর পেতে লাগলাম। পথে এক কাঁঠাল বাগানে এক ঘণ্টার জন্যে বিশ্রাম কালে আমরা সেখানে সুস্বাদু কাঁঠাল খেলাম। সেখানে শুনতে পেলাম যে শামসুদ্দীনকে তারা বন্দী করে সেলিমের অফিস ঘরে আটকে রেখেছে। মনে হলো, শামসুদ্দীনকে বোধ হয় তারা হত্যা করে ফেলবে। আমরা অগ্রসর হতে লাগলাম। গ্রামের নিকটবর্তী হলে দেখতে পেলাম, হাজার হাজার লোক চতুর্দিক থেকে বাঁশের লাঠি নিয়ে গ্রামের দিকে এগিয়ে আসছে। আমরা নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌছলাম যে গ্রামে ঢুকলেই আমাদের উত্তম মধ্যম পিটুনি খেতে হবে।

কমরেড আনন্দ পাল গ্রাম থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের অভ্যর্থনার জন্যে এগিয়ে এলেন। দেখলাম তিনি আহত হয়েছেন এবং মাথার ব্যাণ্ডেজ রক্তে রাঙা। যে লোকগুলো বাঁশের লাঠি নিয়ে গ্রামের দিকে ছুটে আসছিলো তারা আমাদেরই লোক। আল্লাহতালাকে ধন্যবাদ জানালাম।

আমরা গ্রামে প্রবেশ করার আগে সৈয়দ আবদুস সেলিম প্রাণের ভয়ে তাঁর দলবলসহ গ্রাম ছেড়ে পলায়ন করেছিলেন। মাদ্রাসার শিক্ষক মৌলবীরা সর্বপ্রথম আত্মসমর্পণ করলেন। খাজারা পরাজিত হলেন এবং আমরা বিজিতের ন্যায় গ্রামে প্রবেশ করলাম। সেখানে প্রায় এক লক্ষ লোকের এক বিরাট জনসমাবেশ হয়েছিলো, তারা সকলেই লাঠি নিয়ে সজ্জিত ছিলো। এ বিজয় হয়েছিলো মুসলিম লীগ এবং কৃষক সমিতির যৌথ শক্তির। 'মুসলিম লীগ দীর্ঘজীবী হোক' 'কৃষক সমিতি দীর্ঘজীবী হোক' এই আকাশ কাঁপানো ধ্বনির মধ্য দিয়ে সম্মেলন শেষ হলো।

চালাকচর সম্মেলনের কয়েক সপ্তাহ পর শেখ মুজিবর রহমান তাঁর শহর গোপালগঞ্জে মুসলিম লীগের এক সম্মেলনের ব্যবস্থা করেন। সম্মেলনটিতে সভাপতিত্ব করেছিলেন হোসেন শহীদ সুহরাওয়ার্দী। আমি এবং সুহরাওয়ার্দী সভার নির্ধারিত দিনের পূর্বদিন সন্ধ্যায় গোপালগঞ্জ পৌছলাম। সুহারাওয়ার্দী সাহেব তাঁর জনৈক বন্ধুর বাড়িতে উঠলেন। আমাকে থাকতে দেওয়া হলো গোপালগঞ্জ শহরের উপকণ্ঠে নদীর ধারে অবস্থিত ডাকবাংলার একটি কামরায়।

ডাকবাংলার ধারে নদীতে গ্রীনবোটে শামসুদ্দাহারকে দেখতে পেলাম। শামসুদ্দাহার ছিলেন কলকাতা পুলিশের অবসর প্রাপ্ত ডেপুটি কমিশনার এবং তিনি বামপন্থীদের দলে ছিলেন। সকালে নদীতে যখন আমি গোসল করছি দেখলাম দ্রুতগামী দেশীয় নৌকায় চড়ে রামদা নিয়ে কতকগুলি যুবক এগিয়ে আসছে। রামদা হলো লম্বা হাতলওয়ালা, বাঁকা ধারালো তলোয়ার। জিজ্ঞাসা করায় জানতে পারলাম, এরা গ্রীনবোটের বৃদ্ধ লোকটির দলের লোকজন। অর্থাৎ এরা শামসুদ্দাহার লোকজন। দুপুরের আহার শেষে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে বিকেলে এক বিরাট জনসমাবেশে উপস্থিত হলাম।

ফরিদপুর জেলায় আমি কখনও শান্তিপূর্ণভাবে জনসভায় বক্তৃতা দিতে পারিনি। ফরিদপুরের নেতারা যখন যেমন প্রয়োজন পড়ত শক্তি ও বল প্রয়োগে নিজেদের নিয়োজিত রাখতেন। জনসভায় দেখতে পেলাম বেশ কিছুসংখ্যক লোক রামদা নিয়ে সজ্জিত রয়েছে। মঞ্চে চারটি চেয়ার রাখা ছিলো। একটি সুহরাওয়ার্দীর জন্যে, অন্য তিনটি আমাদের জন্যে। সুহরাওয়ার্দীর ডানপাশে শামসুদ্দাহার বসেছিলেন। মঞ্চের কাছে সশস্ত্র পুলিশরাও উপস্থিত ছিলো।

মঞ্চের সম্মুখভাগে দুই সারি বেঞ্চ রাখা ছিলো। ডানপাশে বসেছিলেন আবদুস সালাম খানের সমর্থক কিছু যুবক এবং বামপাশে ছিলেন শেখ মুজিবর রহমান তাঁর বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে। প্রথমে দুই দলের মধ্যে শুরু হলো

খচসা পরে তা পর্যবসিত হলো রামদা-সজ্জিত দু'দলের প্রচণ্ড ধস্তাধস্তিতে। শামসুদ্দাহার তাঁর পকেট থেকে একটি টোটাভর্তি রিভলভার বের করলেন। সুহরাওয়ার্দী মঞ্চ থেকে নেমে সোজা জনতার ভিড়ের দিকে অগ্রসর হলেন। গণ্ডগোল থেমে গেলো এবং লোকজন শান্তভাবে মাঠে উপবেশন করল। অতঃপর সম্মেলন শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হলো। শেখ মুজিবর রহমান তাঁর বাড়িতে আমাদের নিয়ে গেলেন এবং বিকেলে সেখানে চা-চক্রে আমাদের আপ্যায়িত করলেন।

## প্রাদেশিক পার্লামেণ্টারী বোর্ড

ভারত সরকার ঘোষণা করল ভারতে ১৯৪৬ সালের প্রথম তিন মাসের মধ্যে ( First quarter ) সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নিখিল ভারত মুসলিম লীগ সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের প্রার্থী মনোনয়নের জন্য প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টারী বোর্ড গঠন করার কথা স্থির করল। নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নওবাবজাদা লিয়াকৎ আলী খান বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের সঙ্গে পার্লামেণ্টারী বোর্ড গঠনের বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য কলকাতায় এসে উপস্থিত হলেন। নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কার্যনির্বাহী কমিটি স্থির করল প্রাদেশিক পার্লামেণ্টারী বোর্ড ন'জন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত হবে। প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি এবং পার্লামেণ্টারী পার্টির নেতা পদাধিকার বলে পার্লামেণ্টারী বোর্ডের সদস্য হবেন। বিধান পরিষদ ও ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য কর্তৃক বিধান ও ব্যবস্থা পরিষদ থেকে একজন করে যথাক্রমে পার্লামেণ্টারী বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হবেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কাউন্সিল কর্তৃক নির্বাচিত হবেন পাঁচজন। প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কার্যনির্বাহী কমিটি ২৮শে সেপ্টেম্বর বিধান পরিষদ ও ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য কর্তৃক পার্লামেণ্টারী বোর্ডে দু'জন সদস্য নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করল। ২৯শে সেপ্টেম্বর প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিল কর্তৃক পাঁচজন সদস্য নির্বাচনের তারিখ ধার্য করা হলো।

মুসলিম লীগের বামপন্থীদের দেশে অভূতপূর্ব সমর্থন ছিলো কিন্তু দক্ষিণপন্থীরা পার্লামেণ্টারী পার্টিতে কোনো প্রকারে ( Marginal majority ) সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রেখেছিলো। ১৯৪৫ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর পার্লামেণ্টারী পার্টি কর্তৃক পার্লামেণ্টারী বোর্ডের দু'জন সদস্যের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। বিধান পরিষদে খাজা নাজিমুদ্দীন, ফজলুর রহমানের নাম প্রস্তাব করলেন। সুহরাওয়ার্দী আশা করেছিলেন খাজা নাজিমুদ্দীন তাঁর প্রার্থীদের সমর্থন করবেন কিন্তু যখন তিনি দেখলেন খাজা এবং তাঁর দল ফজলুর রহমানকে সমর্থন করলেন তখন সুহরাওয়ার্দী পরিষদ ত্যাগ করলেন।

ফজলুর রহমান বিধানসভা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়াই পার্লামেণ্টারী বোর্ডের

সদস্য নির্বাচিত হলেন এবং বিধান পরিষদ থেকে পার্লামেণ্টারী বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হলেন নূরুল আমিন। খাজা নাজিমুদ্দীন ও মৌলানা আকরাম খান পদাধিকার বলে সদস্য হলেন। পার্লামেণ্টারী বোর্ডে নূরুল আমিন খাজা নাজিমুদ্দীনকে সমর্থন করেন।

সুহরাওয়ার্দী বিধান পরিষদ থেকে মুসলিম লীগ পার্টি-হাউসে সরাসরি আমার নিকট চলে এলেন। আমি আমার কামরায় বসে ছিলাম, সেখানে আমার পরিচর্যায় নিযুক্ত যুবক সিদ্দিকও উপস্থিত ছিলো। সুহরাওয়ার্দী বললেন, "হাশিম এখন দেখছি আমার জঙ্গলে বাস করা ছাড়া উপায় নেই।" আমি তাঁর গাল বেয়ে অশ্রুবিন্দু নির্গত হতে দেখে তাঁকে চেয়ারে বসিয়ে সান্ত্বনা দিলাম। সুহরাওয়ার্দী মদ্যপান এবং সিগারেট খাওয়ায় অভ্যস্থ ছিলেন না। সিদ্দিক তাঁকে সিগারেট দিতে সুহরাওয়ার্দী একের পর এক সিগারেট খেতে লাগলেন। মনে হলো, তিনি মানসিকভাবে খুবই বিচলিত ছিলেন। আমি বললাম, "সুহরাওয়ার্দী, আপনি এ পরাজয়কে মার্শাল গোটের ডানকার্ক থেকে প্রস্থানের মতো গ্রহণ করুন, কিন্তু ভুলবেন না যে বর্তমানে বার্লিন এবং টোকিওতে আমেরিকান পতাকা উড়ছে।" সুহরাওয়ার্দী বললেন, "হাশিম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কাউন্সিল সভায় আপনি কি পাঁচটির সবগুলি আসনই জয়লাভ করার ব্যাপারে সুনিশ্চিত?" উত্তরে আমি বললাম, "আমি তাই আশা করি, কিন্তু এরপর থেকে আপনার ব্যবহার যেন একজন পার্টির লোকের মতো হয়।" সুহরাওয়ার্দী বললেন, "ঠিক আছে, তাই হবে।" কিন্তু ঐ দিন সন্ধ্যাতেই তিনি এক সমস্যার সৃষ্টি করলেন।

পার্লামেণ্টারী বোর্ডে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের জন্যে খাজা নাজিমুদ্দীনের কেবল আর একটি সদস্যের প্রয়োজন ছিলো। কাউন্সিল সভায় জয়লাভের কোনো আশাই তাঁর ছিলো না। তিনি অন্য উপায় অবলম্বন করলেন। আমরা পরস্পরের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করি। সুহরাওয়ার্দী পার্লামেণ্টারী বোর্ডের সংখ্যাগরিষ্ঠদের সঙ্গে থাকতে চেয়েছিলেন এবং তিনি কাউন্সিল সভায় আমাদের বিজয়ের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিলেন না।

খাজা নাজিমুদ্দীন সুহরাওয়ার্দীর দুর্বলতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করলেন। সন্ধ্যায় সুহরাওয়ার্দীকে মৌলানা আকরাম খানের বাসভবনে নিয়ে যাওয়া হলো যেখানে খাজা নাজিমুদ্দীন এবং তাঁর বন্ধুবান্ধবরাও উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা প্রস্তাব করলেন যে, কাউন্সিল সভায় তাঁরা সুহরাওয়ার্দীর নাম প্রস্তাব করে সর্বসম্মতিক্রমে তাঁকে নির্বাচিত করবেন এবং অন্য চারজন সদস্য নির্বাচিত হবেন ব্যালটে। সুহরাওয়ার্দী প্রস্তাবে রাজি হলেন ও এই মর্মে এক চুক্তি স্বাক্ষর করলেন। খবরটি সঙ্গে সঙ্গে কাউন্সিল সদস্যরা জেনে যাওয়ায় বামপন্থীদের মধ্যে এক ভয়ানক ত্রাসের সঞ্চার করল। খবরটি শুনে আমি খুবই মর্মাহত ও বিস্মিত হলাম।

পরের দিন সকালে বামপন্থীরা দলে দলে মুসলিম লীগ অফিসে এসে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। আমি তাঁদের হতাশ না হয়ে জয়লাভে আস্থা রাখার জন্য উপদেশ দিলাম। তাঁদের বললাম, খাজাদের থেকে যদি সুহরাওয়ার্দী নিজেকে বিচ্ছিন্ন না করেন তাহলে তাঁকে আমরা পরাজিত করব। বিশ্বাসঘাতকতার জন্য সুহরাওয়ার্দীকে ভয়ানকভাবে তিরস্কার করতে শুরু করলাম এবং মুসলিম লীগ অফিসে কি ঘটছে সে বিষয়ে সুহরাওয়ার্দীকে অবহিত করার জন্য তাঁর কাছে দলে দলে লোক পাঠাতে লাগলাম। এই কৌশলে সুহরাওয়ার্দী বেশ বিচলিত হয়ে পড়লেন।

বেলা ১টার দিকে মুসলিম লীগের অফিস সেক্রেটারী ফরমুজুল হক আমার কামরায় এসে বললেন সুহরাওয়ার্দী আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান। আমি বললাম, "তাঁকে বলুন সাক্ষাৎ করার কোনো প্রয়োজন নেই।" আধ-ঘণ্টা পর ফরমুজুল হক আমার কামরায় এসে বললেন, "সুহরাওয়ার্দী আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান এবং তিনি আমার কামরায় বসে রয়েছেন।" আমি বললাম তার প্রয়োজন নেই। পাঁচ মিনিট পর সুহরাওয়ার্দী আমার কামরায় উপস্থিত হয়ে বললেন, "হাশিম সাহেব আপনি সকাল থেকে আমার ওপর অগ্নিবর্ষণ করছেন ( Breathing fire )।" আমি বললাম, "এ ছাড়া পার্টির মনোবল অটুট রাখার উপায় ছিলো না।"

সুহরাওয়ার্দী তাঁর দুশ্চিন্তা থেকে রেহাই পেলেন এবং বললেন, "হ্যাঁ, আমি অনেকটা সেই রকমই ভেবেছিলাম।" তিনি তৎক্ষণাৎ নাজিমুদ্দীনকে টেলিফোন করলেন এবং জানালেন যে, পূর্ব সন্ধ্যায় যে চুক্তি হয়েছিলো সেটা রক্ষা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। সুহরাওয়ার্দীর রাজনৈতিক তত্ত্ব অনুযায়ী রাজনৈতিক নেতাদের অঙ্গীকারের কোনো মূল্য নেই।

মুসলিম ইনস্টিটিউটে ২৯শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় কাউন্সিলের সভা অনুষ্ঠিত হলো। খাজা নাজিমুদ্দীনের উপদেষ্টারা আশা ত্যাগ করলেন না। পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁরা সুহরাওয়ার্দীর নাম প্রস্তাব করলেন। ধন্যবাদ জানিয়ে সুহরাওয়ার্দী প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। দক্ষিণপন্থীরা তাঁদের কূটনৈতিক পরাজয়কে ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারলেন না। তাঁরা তাঁদের মানসিক প্রশান্তি হারিয়ে ফেলে তুমুল রুদ্র মূর্তি ধারণ করে হাতাহাতি শুরু করে দিলেন। ফরিদপুরের ইউসুফ আলী চৌধুরী মুন্সিগঞ্জের শামসুদ্দীন আহমেদকে পদাঘাত করায় তিনি পাকস্থলীতে ভয়ানকভাবে আঘাত পেয়ে অজ্ঞান অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। শেখ মুজিবর রহমান তৎক্ষণাৎ ইউসুফ আলী চৌধুরীর ঘাড় ও গলা চেপে ধরে মাটিতে ধাক্কা মেরে ফেলে দিলেন। চারিদিকে বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হলো এবং পরের দিনের জন্য সভা স্থগিত রাখা হলো।

সন্ধ্যায় সুহরাওয়ার্দী মুসলিম লীগ অফিসে আমার কামরায় উপস্থিত হলেন। পার্লামেণ্টারী বোর্ডে পাঁচজন সদস্যের এক প্যানেল তৈরীর প্রয়োজন ছিলো সেইজন্য

সারারাত্রি কাউন্সিলের নেতৃস্থানীয় সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যেতে হলো। চারজন সদস্যের নাম নির্ধারণে আমরা একমত হলাম। পঞ্চম সদস্য নোয়াখালীর হবিবুল্লাহ বাহারের নাম প্রস্তাব করা হলো। নোয়াখালীর আবদুল জব্বার খদ্দরের নেতৃত্বে কুমিল্লা এবং নোয়াখালী জেলার কাউন্সিল সদস্যরা হবিবুল্লাহ বাহারের স্থলে অন্য কাউকে পার্লামেণ্টারী বোর্ডের সদস্য নির্বাচনের জন্য জেদ ধরলেন। হবিবুল্লাহ বাহারও আমার কামরায় উপস্থিত ছিলেন। সুহরাওয়ার্দী এবং আমি হবিবুল্লাহ বাহারকে পার্লামেণ্টারী বোর্ডের সদস্য করার কথা চিন্তা করেছিলাম।

আবদুল জব্বার খদ্দর এবং তাঁর বন্ধুবান্ধবরা আমাদের সিদ্ধান্তে রাজি হলেন না এবং আমরা কোনো উপযুক্ত বিকল্প খুঁজে না পাওয়ায় সারারাত এই বাদানুবাদে কেটে গেলো। ভোরের দিকে হবিবুল্লাহ বাহার পার্টির সংহতি রক্ষার জন্য সরে দাঁড়ালেন এবং তাঁর জায়গায় ফরিদপুরের লাল মিয়াকে নির্বাচিত করা হলো। অবশেষে সুহরাওয়ার্দী, কলকাতার রাগিব আহসান, রংপুরের আহমেদ হোসেন, ফরিদপুরের লাল মিয়া এবং আমাকে নির্বাচিত করা হলো।

এই বাদানুবাদ ছাড়াও চট্টগ্রামের ফজলুল কাদের চৌধুরীর এক অপ্রীতিকর কার্যকলাপ আমাকে অস্থির করে রেখেছিলো। এ ভদ্রলোক সারারাত আমাদের ও নাজিমুদ্দীনের শিবিরে ঘোরাফেরা করেন এবং ভয় প্রদর্শন করে বলেন যে চট্টগ্রামের পঁচিশজন কাউন্সিল সদস্য আমাদের ভোট দেবেন না যদি আমারা তাঁকে পাঁচজন পার্লামেণ্টারী বোর্ডের অন্যতম সদস্য হিসাবে গ্রহণ না করি। তিনি আমাদের বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, চট্টগ্রাম জেলা যদি আমাদের ভোট দেওয়া থেকে বিরত থাকে তাহলে প্রতিযোগিতায় আমরা পরাজিত হব। ফজলুল কাদের চৌধুরীর খুবই দুর্ভাগ্য যে, খাজা নাজিমুদ্দীন এবং আমরা কেউই তাঁকে গ্রহণ করতে পারলাম না।

৩০শে সেপ্টেম্বর বেলা দুটোয় মুসলিম ইনস্টিটিউটে কাউন্সিল মিলিত হলো। তমিজুদ্দিন খানকে পোলিং অফিসার নিয়োগ করে ব্যালট-পত্র কাউন্সিলের সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করা হলো। দক্ষিণপন্থীরা দিনাজপুরের মৌলানা আবদুল্লাহিল বাকীকে মনোনীত করেছিলো। ভেবেছিলো উত্তরবঙ্গ মৌলানাকে ভোট দেবে কিন্তু তাঁরা হতাশ হয়েছিলেন। ফজলুল কাদের চৌধুরী আমাদের বিপক্ষে ভোট দিয়েছিলেন কিন্তু অবশিষ্ট সকলে আমাদের পক্ষে ভোট প্রদান করেন। ভোট প্রদানের কাজ শেষ হলো সন্ধ্যার কিছু আগে। খুলনার আবদুস সবুর খান, তমিজুদ্দিন খানকে ভোট গণনায় সাহায্য করলেন। বামপন্থীরা জয়লাভ করলেন। সুহরাওয়ার্দী আমাকে সানন্দে জড়িয়ে ধরলেন, তিনি বুঝতে পারলেন যে, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পথ তাঁর জন্য পরিষ্কার হয়ে গেলো। তাঁর এবং আমার মধ্যে এই মর্মে অন্তর্নিহিত শর্ত হয়েছিলো যে, তিনি হবেন পার্লামেণ্টারী পার্টির নেতা আর আমি হব প্রাদেশিক মুসলিম লীগের নেতা।

সন্ধ্যায় তুমুল হর্ষধ্বনীর মাঝে আমি কাউন্সিল সদস্যদের উদ্দেশে ভাষণ প্রদান করলাম। আমাকে প্রচুর পুষ্পমাল্যে ভূষিত করা হলো এবং ফটোগ্রাফাররা ছবি নেওয়ার জন্য ব্যস্ত হলেন। সুহরাওয়ার্দী ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়লেন। তিনি বললেন, "হাশিম আপনি কি করছেন?" সুহরাওয়ার্দী যখন সম্মানিত হতেন তখন তিনি ভাবতেন স্বতঃস্ফূর্ত কিন্তু অন্যেরা যখন প্রশংসিত হতো তখন ভাবতেন সেটা প্ররোচিত। পাঁচ সদস্যের পার্লামেণ্টারী বোর্ডের নির্বাচনে সুহরাওয়ার্দী সর্বোচ্চ ভোট লাভ করেন এর কারণ দক্ষিণপন্থীরা তাঁদের পূর্ব শর্ত অনুযায়ী সুহরাওয়ার্দীকে ভোট দান করেছিলেন। সুহরাওয়ার্দী মনে করলেন আমাদের জয়লাভের জন্য কাউন্সিল সদস্য প্রদত্ত সম্মান এবং প্রশংসাধ্বনী তাঁরই প্রাপ্য।

খাজা নাজিমুদ্দীন পার্লামেণ্টারী বোর্ডের সেক্রেটারীর দায়িত্ব সুহরাওয়ার্দীর পরিবর্তে আমাকে নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানালে আমি বললাম, "খাজা সাহেব, এ কাজের জন্য আমি যোগ্য নই।" আমরা জানতাম যে, সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগ যদি জয়ী হয় তাহলে পার্লামেণ্টারী বোর্ডের সেক্রেটারী হবেন পার্লামেণ্টারী পার্টির নেতা। আমরা পার্লামেণ্টারী বোর্ডের সদস্যরা সুহরাওয়ার্দীকে বোর্ডের সেক্রেটারী নির্বাচিত করলাম।

## সাধারণ নির্বাচন

১৯৪৫ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর 'সংগ্রাম হোক শুরু' ( Let us go to war ) নামে আমি একটি প্রচারপত্র ছাপিয়েছিলাম। এই প্রচারপত্র আসাম এবং বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনের পথনির্দেশক হয়েছিলো। জিন্নাহ ঘোষণা করেন ১৯৪৬-এর সাধারণ নির্বাচনকে পাকিস্তানের উপর ভারতের মুসলমানদের গণভোট স্বরূপ গ্রহণ করা হবে। সাধারণ নির্বাচনের জন্য তিনি দেশের কাছে কোনো অর্থ নৈতিক, সামাজিক অথবা রাজনৈতিক ব্যবস্থা তুলে ধরেননি। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষ থেকে মেজর এটলীর লেবার গভর্নমেণ্ট এই চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করেছিলো। সুতরাং বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ১৯৪৫ সালের ১লা অগাস্টের সভায় এই মর্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

আমরা দাবী করেছিলাম নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ভারতের দশকোটি মুসলমানের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান এবং ১৯৪০ সালের লাহোর অধিবেশনে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের গৃহীত প্রস্তাব ভারতের মুসলমানদের মতামতেরই প্রতিনিধিত্ব করেছিলো। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধিরা একথা কখনও সুস্পষ্টভাবে মেনে নিতে পারেনি। কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা ইত্যাদি আমাদের এ দাবীর তীব্র বিরোধিতা করে। তারা দাবী করল, মুসলিম লীগ ছাড়াও ভারতের মুসলমানদের আরও অনেক প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেমন, আহরার, খাকসার, জমিয়াতুল ওলামা। পাকিস্তান পরিকল্পনা ( scheme ) কেবলমাত্র জিন্নাহ এবং নিখিল ভারত

মুসলিম লীগের কার্যনির্বাহী কমিটিতে তাঁর জন কয়েক বন্ধুবান্ধবদেরই মতবাদের প্রতিনিধিত্ব করেছিলো। গান্ধী তাঁর এক চিঠিতে জিন্নাহকে এ বিষয়ে অনেক কিছু বলেছিলেন।

১৯৪০-এ লাহোর প্রস্তাবে ভারতের শুধুমাত্র মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলির জন্যই পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী ছিলো না। এক অখণ্ড পাকিস্তান রাষ্ট্রের এবং সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে কোনো দেশ বা জাতিকে বিভক্ত করার চিন্তাও লাহোর প্রস্তাবে করা হয়নি। লাহোর প্রস্তাব বাংলাকে অথবা বাঙালী জাতিকে, পাঞ্জাবকে অথবা পাঞ্জাবীদের বিভক্ত করার কথা চিন্তা করেনি।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে রাজা গোপাল আচারীর মাধ্যমে ভারত বিভক্তির বিষয়টি যাচাই করার জন্য এক প্রস্তাব করে। কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ রাজা গোপাল আচারীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এবং ক্রিপ্‌স মিশনও বিফল হয়। দুর্ভাগ্যবশত, কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ উভয়েই শেষ পর্যন্ত ১৯৪৭ সালে লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের রোয়েদাদ মেনে নেয় যেটা প্রকৃতপক্ষে রাজা গোপাল আচারীর প্রস্তাবে যা ছিলো তাই। সিমলা আলোচনা বিফল হওয়ার পর কংগ্রেস ভারতীয় রাজনীতির কঠিন বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে নিজেদের জন্য অবাস্তবভাবে সমগ্র ভারতের নেতৃত্বের দাবী করল।

ব্যালট বাক্স একমাত্র মাধ্যম যার দ্বারা নির্ভুলভাবে জনমত যাচাই করা সম্ভব। অতঃপর মুসলিম লীগ সরল এবং স্পষ্টবাদী মুসলমানদের প্রতিষ্ঠান হিসাবে ঘোষণা করল যে, তারা পাকিস্তানের উপর এবং ভারতীয় মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করার উপর গণভোট হিসাবে সাধারণ নির্বাচনকে গ্রহণ করবে। আমি এক প্রেস বিবৃতিতে মুসলিম লীগের নেতৃবর্গ ও কর্মীদের নিজেদের একতা বজায় রাখা এবং সাধারণ নির্বাচন শেষ হওয়া অবধি ন্যায্য অথবা অন্য সমস্ত আভ্যন্তরীণ মনোমালিন্য —আদর্শগত অথবা ব্যক্তিগত, স্থগিত রাখার জন্য আবেদন জানালাম। নিজেদের দলের সম্ভাব্য সমস্ত বিভেদের আশঙ্কাকে পরিহার করার জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কার্যনির্বাহী কমিটি ১৯৪৫ সালের ২৭শে আগস্ট কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পূর্ব অবধি ইউনিয়ন, মহকুমা, জেলা এবং প্রাদেশিক লীগের পুনর্গঠনের জন্য সমস্ত নির্বাচন স্থগিত রাখার ব্যাপারে এক প্রস্তাব অনুমোদন করল।

জিন্নাহ মুসলিম ভারতের অনুভূতির প্রতিধ্বনি করে ঘোষণা করেন যে আমাদের পাকিস্তান আন্দোলন ভারতের কোনো রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে পরিচালিত নয় বরং ভারতে বৃটিশ শাসনকে উচ্ছেদ করার লক্ষ্যে পরিচালিত। সিমলা আলোচনা বিফল হওয়ার পরই তিনি ভাইসরয় এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অন্যান্য প্রতিনিধিদের বাদ দিয়ে লীগের সঙ্গে নূতন উদ্যমে বোঝাপড়া করার জন্য

কংগ্রেসের নিকট আবেদন করেন। কিন্তু কংগ্রেস ভারতের গ্রীষ্মাবকাশের রাজধানী ( সিমলা ) থেকে লীগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করল।

প্রচারপত্র 'সংগ্রাম হোক শুরু'তে আমি মন্তব্য করেছিলাম স্বাধীন ভারত একটি দেশ নয়, স্বাধীন ভারত কখনোই একজাতি নয়। অতীতে মোগল এবং মৌর্য্য শাসনে ভারত অখণ্ড ছিলো এবং বর্তমানে গ্রেট বৃটেনের শাসনে রয়েছে অখণ্ড। স্বাধীন ভারতকেও অবশ্যই হতে হবে আল্লাহতায়ালা যেমনভাবে তাকে গড়েছেন একটি উপমহাদেশ হিসাবে —যেখানে প্রতিটি বসবাসকারী জাতি পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করতে পারবে। বোম্বাইয়ের পুঁজিপতিদের প্রতি কংগ্রেসের যতই দুর্বলতা থাকুক এবং অখণ্ড ভারতের দোহাই দিয়ে সমগ্র ভারতকে শোষণ করার সুযোগ প্রদান করে তাদের প্রতি দয়াপরবশ হওয়ার যত ইচ্ছাই পোষণ করুক, ভারতের প্রতিটি মুসলমান ভারতে যে কোনো গোষ্ঠী, দল অথবা প্রতিষ্ঠানের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য কংগ্রেসের সকল উদ্যোগকে প্রতিহত করবে। পাকিস্তানের অর্থ হিন্দু, মুসলমান একইভাবে সকলের জন্য স্বাধীনতা। আমি আরও বলেছিলাম যে, কংগ্রেসের উপলব্ধি করা উচিত যে আমরা মুসলমানরা যখন মুক্তি ও স্বাধীনতার কথা বলি তখন সত্যি অর্থেই সেটা বলে থাকি। ভারতের মুসলমানরা বৃটিশ অথবা ভারতীয় যেটাই হোক সকল প্রকার আধিপত্য ও শোষণের বিরোধী।

জিন্নাহ ১৯৪৪ সালের ৫ই অক্টোবর ঘোষণা করেন, "পাকিস্তান সরকার ধর্ম, বর্ণ ও জাতি নির্বিশেষে পাকিস্তানের জনগণের প্রধান অংশের মতামত নিয়ে পরিচালিত হবে ( will have the sanction )।" ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচন ছিলো কংগ্রেসের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ। কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা অথবা ভারতের কোনো জনগণ বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে আমরা খুব একটা সন্তুষ্ট ছিলাম না।. আমাদের সংগ্রাম ছিলো সম্পূর্ণরূপে আত্মরক্ষামূলক। পার্লামেণ্টারী বোর্ড সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের প্রার্থী মনোনয়নের পূর্বে প্রত্যেক নির্বাচন কেন্দ্রে জনমত যাচাইয়ের কথা স্থির করল।

প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি এবং পদাধিকার বলে পার্লামেণ্টারী বোর্ডের সদস্য মৌলানা আকরাম খাঁর পক্ষে বার্ধক্যজনিত কারণে প্রদেশব্যাপী দীর্ঘ ও পরিশ্রমসাধ্য সফর করে বেড়ানো সম্ভব ছিলো না। আমরা পার্লামেণ্টারী বোর্ডের অবশিষ্ট আটজন সদস্য দু'জন করে চারটি দলে বিভক্ত হলাম এবং সফরসূচী তৈরী করে প্রতিটি নির্বাচন কেন্দ্র সফর করলাম। স্যার খাজা নাজিমুদ্দীন ও আমি একই দলে ছিলাম এবং আমরা একসঙ্গে সফর করতাম।

ম্যাকডোনাল্ড রোয়েদাদ অনুসারে বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, হুগলি, হাওড়া এবং মেদিনীপুর জেলার সমন্বয়ে গঠিত বর্ধমান বিভাগের মুসলিম সংখ্যালঘু জেলাগুলির প্রতিটি জেলার মুসলমানদের জন্য একটি করে আসন সংরক্ষিত ছিলো। সুতরাং সমগ্র বর্ধমান জেলার ষোলোটি থানা ও ছ'টি মিউনিসিপ্যাল এলাকা ছিলো

আমার নির্বাচন কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত। নূরুল আমিন এবং রংপুরের আহমেদ হোসেন জনমত যাচাইয়ের জন্য বর্ধমান সফর করলেন। বর্ধমানে তাঁদের সম্বর্ধনা ও থাকার সুবন্দোবস্ত করে যেদিন তাঁদের বর্ধমান আসার কথা সেদিন আমি আমার গ্রামের বাড়িতে রওয়ানা হয়ে গেলাম।

মৌলানা আকরাম খাঁর প্ররোচনায় বর্ধমানের এডভোকেট সৈয়দ আবদুল গণি বর্ধমান জেলা থেকে মুসলিম লীগের প্রার্থী হিসাবে তাঁকে মনোনয়নের জন্য পার্লামেণ্টারী বোর্ডের কাছে দরখাস্ত করলেন। মৌলানা আকরাম খাঁ, সৈয়দ আবদুল গণিকে আশ্বাস দিলেন যে তাঁদের চারজন তাঁকে সমর্থন করবেন এবং কোনো রকমে আমাদের দলের পাঁচজনের মধ্যে থেকে একটি ভোট তিনি সংগ্রহ করতে পারবেন এবং এভাবে আমার পতন ঘটাতে সক্ষম হবেন। সৈয়দ আবদুল গণি মৌলানার আশ্বাসে বিশ্বাস করলেন। ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা মানুষকে দিশেহারা করে; যেমনটি হয়েছিলো সৈয়দ আবদুল গণির ক্ষেত্রে। তিনি এ সত্য সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছিলেন যে, তখন আমি মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং পার্লামেণ্টারী বোর্ডে আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রয়েছে। নূরুল আমিন ও আহমেদ হোসেনের কাছে বারোজনের অধিক সমর্থক উপস্থিত করতে তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন এবং এর সুস্পষ্ট ফল ফলেছিলো।

একশো উনিশটি নির্বাচন কেন্দ্রে সফর শেষ করতে আমাদের কয়েক সপ্তাহ লেগেছিলো। আইনসভায় মুসলমানদের জন্য একশো উনিশটি আসন সংরক্ষিত ছিলো। জনমত যাচাইয়ের কাজ শেষ করার পর আমাদের প্রার্থী নির্বাচনের জন্য আমরা সুহরাওয়ার্দীর কলকাতার বাসভবন ৪০ নং থিয়েটার রোডে মিলিত হলাম। মুসলিম লীগের একশো উনিশটি মনোনীত প্রার্থীর তালিকা প্রস্তুত এবং ছাপানোর কাজ শেষ করার আগে আমাদের তেত্রিশবার বৈঠক করতে হয়েছিলো। নির্বাচন তহবিলে টাকা সংগ্রহ ও পরিচালনা করতেন পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী সুহরাওয়ার্দী।

প্রাদেশিক মুসলিম লীগের মুখপত্র হিসাবে একটি শক্তিশালী বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রয়োজনীয়তার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং প্রাদেশিক মুসলিম লীগের অর্থনৈতিক কমিটি পত্রিকাটির জন্য প্রাথমিক চাঁদা বাবদ পাঁচ হাজার টাকা মঞ্জুরী প্রদান করেন। সে সময় দৈনিক আজাদ ছিলো একমাত্র বাংলা সংবাদপত্র যেটি মুসলিম লীগকে সমর্থন করত ও মুসলিম লীগের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল অংশের মতামতের প্রতিনিধিত্ব করত। মুসলিম লীগ সরকারের নেতা খাজা নাজিমুদ্দীন সর্বশক্তি দিয়ে দৈনিক আজাদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। যাই হোক, মুসলিম লীগের প্রস্তাবিত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'মিল্লাত' ছাপানোর সব রকম ব্যবস্থা শেষ হলো।

পত্রিকাটির জন্য শুভেচ্ছা কামনা এবং বাণী প্রদান করার জন্য জিন্নাহকে

অনুরোধ জানিয়ে আমি একটি চিঠি লিখেছিলাম। উত্তরে জিন্নাহ উপদেশ দিয়েছিলেন আমি যেন মুসলিম লীগের নামে পত্রিকাটি না ছাপিয়ে নিজের প্রচেষ্টায় পত্রিকাটি ছাপানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করি। তিনি বলেন 'ডন' পুরোপুরি-ভাবে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের পত্রিকা কিন্তু সেটির মালিকানা এবং ব্যবস্থাপনা ছিলো লিমিটেড কোম্পানীর।

প্রথমদিকে আমি ছিলাম 'মিল্লাত'-এর সম্পাদক কিন্তু কাজী মহাম্মদ ইদরিস নামে একজন যুবক সাংবাদিককে কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়। কাজী ইদরিস একজন দক্ষ সাংবাদিক ছিলেন। তাঁকে আমি দৈনিক আজাদ থেকে গ্রহণ করেছিলাম যেখানে তিনি অন্যতম সহ-সম্পাদক হিসাবে খুবই অল্প বেতন পেতেন। মিল্লাত প্রথম প্রকাশিত হলো ১৯৪৫ সালের ১৬ই নভেম্বর এবং অল্প দিনের মধ্যেই বাংলা ও আসামে পত্রিকাটি খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠল। মিল্লাত-এর গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলিতে আমাদের পঁয়ত্রিশ হাজার কপি সপ্তাহে ছাপাতে হতো।

নিখিল ভারত মুসলিম লীগ বাংলায় সাধারণ নির্বাচন পরিচালনার জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক পার্লামেণ্টারী বোর্ডকে প্রাথমিক চাঁদা বাবদ তিন লক্ষ টাকা প্রদান করে। বাংলার নির্বাচন তদারকির জন্য জিন্নাহ একটি কমিটি গঠন করেন। এম.এ. ইস্পাহানী, খান বাহাদুর সৈয়দ মোয়াজ্জেমুদ্দীন এবং এ.ডব্লিউ. রাজ্জাক এই তিনজন ছিলেন কমিটির সদস্য।

১৯৪৬ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী প্রাদেশিক পার্লামেণ্টারী বোর্ড বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনে মুসলিম লীগের প্রার্থীর মনোনয়নের কাজ শেষ করল।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের পার্লামেণ্টারী বোর্ডের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল শুনানির জন্য কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টারী বোর্ডের প্রতিনিধি হিসাবে খালিকুজ্জামান চৌধুরী এবং হাসান ইমাম ১০ই ফেব্রুয়ারী কলকাতা পৌঁছলেন। নওবাবজাদা লিয়াকত আলী খান কলকাতায় আসতে পারেননি। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ পার্লামেণ্টারী বোর্ড মুসলিম লীগের প্রার্থী নির্বাচনের কাজ শেষ করেছিলো কিন্তু তাদের সিদ্ধান্ত সংবাদপত্রে প্রকাশ করেনি। কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টারী বোর্ড কর্তৃক বঙ্গীয় প্রাদেশিক বোর্ডের নির্বাচনের বিরুদ্ধে শুনানির ব্যবস্থা নেওয়ার পর মুসলিম লীগের অনুমোদিত তালিকা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলো। কেন্দ্রীয় পার্লা-মেণ্টারী বোর্ডের পক্ষে, বঙ্গীয় পার্লামেণ্টারী বোর্ডের দুই বিরোধী ( contending ) দলের নেতা খাজা নাজিমুদ্দীন এবং সুহরাওয়ার্দী প্রতিনিধিত্ব করতেন।

প্রাদেশিক পার্লামেণ্টারী বোর্ড ঢাকার আতাউর রহমান খান, মিসেস সুলতান-উদ্দীন আহমেদ এবং আবদুল ওয়াসেককে মনোনীত করেনি। ৮ই ফেব্রুয়ারী আতাউর রহমান খান, যিনি, বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয় লীগের নেতা, পূর্ব পাকিস্তানের প্রাক্তন গভর্নর সুলতানউদ্দীন আহমেদ এবং বাংলার সুপরিচিত

মুসলিম ছাত্র নেতা আবদুল ওয়াসেক পার্লামেণ্টারী বোর্ডের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ঢাকা জেলা মুসলিম লীগের অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শনের আয়োজন করেন। এই ঘটনার খবর টেলিফোন মারফৎ কামরুদ্দীন আহমদ আমাকে জানান। মিসেস সুলতানউদ্দীনের থেকে মিসেস আনোয়ারা খাতুনকে অগ্রাধিকার দিয়ে মনোনীত করা হলো। এখন মনে করি আমরা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। মিসেস আনোয়ারা খাতুনের শিক্ষাগত যোগ্যতায় আমি প্রভাবান্বিত হয়ে তাঁকে সমর্থন করেছিলাম।

কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টারী বোর্ড নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের শুনানি গ্রহণ করেন। আবুল কাশেম ( হুগলি অঞ্চল ), মোল্লা মহাম্মদ আবদুল হালিম ( নদিয়া পশ্চিম ), সৈয়দ কাজেম আলী মির্জা ( মুর্শিদাবাদ দঃ পঃ ), কে. বি. নূরুজ্জামান ( ভোলা উঃ ), মৌলানা মহাম্মদ কাশেম (বাকেরগঞ্জ পঃ), খন্দকার শামসুদ্দিন (গোপালগঞ্জ), কে. বি. সারফুদ্দীন আহমেদ ( ময়মনসিংহ উঃ ), এ. ক. আফতাবউদ্দীন তালুকদার ( জামালপুর পঃ ), আবুল কালাম শামসুদ্দীন ( ময়মনসিংহ পঃ ), তোফাজ্জল আলী ( ত্রিপুরা উঃ ), আলী আহমেদ ( ব্রাহ্মণবাড়িয়া উঃ ), মৌলভী রুকুনুদ্দীন ( ব্রাহ্মণবাড়িয়া উঃ ), মৌলানা ফজলুল করিম ( মিসি রাঙ্গু সেন, রাজপুর ), হবিবুল্লাহ বাহার ( ফেণী ), ইলিয়াস আলী মোল্লা ( ২৪ পরগণা কেন্দ্রীয় ), আবদুর রশিদ মাহমুদ ( সিরাজগঞ্জ দঃ ), এস. এ. সেলিম ( নারায়ণগঞ্জ উঃ ), কে. নূরুদ্দীন ( কলকাতা দঃ ), কে. এস. ওসমান ( নারায়ণগঞ্জ দঃ ), মহাম্মদ ওসমান ( কলকাতা উঃ ), আবদুস সোবহান ( পিরোজপুর উঃ ) এবং মাদার বক্স ( রাজশাহী কেন্দ্রীয় )।

মুসলিম লীগের মনোনীত প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা ছাপানোর পর নির্বাচনী সংগ্রাম শুরু হলো। নেতৃবর্গ ও কর্মীবৃন্দ সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন। মুসলিম লীগ মনোনীত প্রার্থীদের মধ্যে দশজন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছিলেন। এঁরা হলেন : খান বাহাদুর ফজলুল কাদের চৌধুরী ( চট্টগ্রাম ), মিসেস আনোয়ারা খাতুন ( ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ ), হাফিজুদ্দীন চৌধুরী ( ঠাকুরগাঁ ), খান বাহাদুর এ. এম. এ. হামিদ ( পাবনা ), মৌলভী আবুল কালাম শামসুদ্দীন, ( ময়মনসিংহ ), খান বাহাদুর মোদসসর হোসেন ( বীরভূম ), আবুল কাশেম ( হুগলি ), মিসেস হাককাম ( কলকাতা ), খাজা নূরুদ্দীন ( কলকাতা দঃ ) এবং এচই. এস. সুহরাওয়ার্দী ( ২৪ পরগনা মিউনিসিপ্যাল )।

আবুল মনসুর আহমেদ বঙ্গীয় প্রাদেশিক পার্লামেণ্টারী বোর্ড কর্তৃক নির্বাচিত হয়েছিলেন। আজাদের তদানীন্তন সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিন, আবুল মনসুর আহমেদের নির্বাচনের বিরুদ্ধে তাঁর শুনানিতে অগ্রাধিকার দাবী করেন এবং শামসুদ্দীনের শুনানি গ্রহণ করা হয়।

সাধারণ নির্বাচনের দিন ধার্য করা হলো ১৯শে মার্চ থেকে ২২শে মার্চ। বাংলায়

কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে মুসলিম লীগের বামপন্থীদের সম্পর্ক খুবই ভালো ছিলো। বাংলার কম্যুনিস্ট পার্টির নেতাদের আমি সাবধান করে দিয়েছিলাম, যদি মুসলমানদের নির্বাচন কেন্দ্রে মুসলিম লীগের প্রার্থীদের সঙ্গে কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় তাহলে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে না। শ্রমিকদের জন্য সংরক্ষিত নির্বাচন কেন্দ্রে আমরা যে কম্যুনিস্ট পার্টিকে সমর্থন জানাব, সে বিষয়ে আশ্বাস দিলাম। কম্যুনিস্ট পার্টি এ কথায় রাজি হলেন না এবং তাঁরা বললেন যে, মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে কম্যুনিস্ট পার্টির কিছু পকেট রয়েছে এবং সংরক্ষিত কম্যুনিস্ট পকেটে তাঁদের প্রার্থীর জয়লাভ সুনিশ্চিত। নোয়াখালী ও ময়মনসিংহে তাঁরা তাঁদের কিছু প্রার্থী দাঁড় করালেন। কম্যুনিস্ট পার্টির মনোনীত প্রার্থী সকলেই পরাজিত হলেন এবং তাঁদের জমানতের অর্থ বাজেয়াপ্ত হলো। আমরা আমাদের কথা মতো শ্রমিক কেন্দ্রগুলিতে কম্যুনিস্ট পার্টিকে সমর্থন জানিয়েছিলাম।

ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও নির্বাচন কেন্দ্রে মুসলিম লীগের প্রার্থী ছিলেন গিয়াসুদ্দীন পাঠান। ঐ অঞ্চলের ধর্মীয় নেতা ছিলেন মৌলানা শামসুল হুদা, সেখানে সকলে তাঁকে বিশেষ সম্মান করতেন। তিনি নিজে স্থানীয়ভাবে একটি দল গড়েছিলেন যার নাম ছিল ইমারত পার্টি এবং তিনি ছিলেন সেই দলের আমীর।

আবুল মনসুর আহমেদ কারমাইকেল হোস্টেল, জিন্নাহ হল, টেলর হোস্টেল, ইলিয়ট হোস্টেল ও ইসলামিয়া কলেজ থেকে প্রায় তিনশত ছাত্র মুসলিম লীগের পক্ষে কাজ করার জন্য সংগ্রহ করেন। তাদের যশোর, বরিশাল এবং বাগেরহাট পাঠানো হলো যেখানে নওশের আলী ও ফজলুল হক মুসলিম লীগ প্রার্থীদের বিরুদ্ধে আইন সভার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন।

গফরগাঁও-এ ময়মনসিংহ জেলা মুসলিম লীগ এক সম্মেলনের আয়োজন করে। নওবাবজাদা লিয়াকাত আলী খান, স্যার নাজিমুদ্দীন, এইচ. এস. সুহরাওয়ার্দী এবং আমি সভাটিতে যোগদান করেছিলাম।

নওবাবজাদা লিয়াকাত আলী খান গফরগাঁও-এ এসেছিলেন বাহাদুরবাদ ঘাট হয়ে। ঢাকা থেকে মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের এক বিরাট অংশ, খাজা নাজিমুদ্দীন, সুহরাওয়ার্দী এবং আমি গফরগাঁও-এ রওয়ানা হলাম। আমরা জানতে পারলাম, মৌলানা শামসুল হুদার কর্মীরা মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা ট্রেনের যে কামরায় ছিলেন সেখানে হামলা করেছে। ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর কামরায় হামলা হতে পারে এই ভয়ে খাজা নাজিমুদ্দীন ঢাকা রেল স্টেশনে তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় গিয়ে ঢুকলেন। খাজা সাহেবকে আমি সেটা করতে দিলাম না, আমরা সকলে প্রথম শ্রেণীর কামরায় বসলাম। গফরগাঁও-এ যখন পৌঁছলাম তখন দেখলাম মৌলানার কয়েক হাজার সমর্থক রামদা নিয়ে উপস্থিত রয়েছে। এই সফরে আমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র ১৫ বৎসরের বালক বদরুদ্দীন মহম্মদ উমরকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম।

খাজা নাজিমুদ্দীন ঢাকা কর্তৃপক্ষকে গফরগাঁও-এ সশস্ত্র পুলিশ পাঠাবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ দিলেন। গফরগাঁও এলাকার লোকদের আমার থেকে তিনি ভালোভাবে চিনতেন। রেল স্টেশন থেকে মৌলানা শামসুল হুদার সশস্ত্র সমর্থকদের মধ্য দিয়ে আমাদের গাড়ি স্থানীয় রেস্ট হাউসে গিয়ে পৌছল এবং সভা অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিলো ঐ দিন বিকালে।

যেখানে সভা অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিলো সেখানে মৌলানা শামসুল হুদার সশস্ত্র লোকজন রামদা এবং বল্লম নিয়ে জমায়েত হয়েছিলো। আমি আমার পুত্রকে নিয়ে রেস্ট হাউসের বাইরে জনতার মধ্য দিয়ে পায়ে হেঁটে রান্না ঘরে দুপুরে তারা আমাদের জন্য কি রান্না করছে দেখতে গেলাম। রেস্ট হাউসে ফিরে আসতে খাজা নাজিমুদ্দীন আমাকে তিরস্কার করে বললেন,"হাশিম আপনি একজন পাগল। আপনি এই বিপজ্জনক অবস্থায় জনতার মাঝে আপনার পুত্রকে নিয়ে ঘোরাঘুরি করছেন?"

সূর্যাস্তের পূর্বেই খাজা নাজিমুদ্দীন গফরগাঁও ত্যাগ করলেন। নওবাবজাদা লিয়াকত আলী তারও আগে রওয়ানা হয়েছিলেন। সুহরাওয়ার্দী এবং আমি থেকে গেলাম।

মৌলানা শামসুল হুদার বিপজ্জনক অস্ত্র সম্ভারে সজ্জিত লোকজনের সঙ্গে মোকাবেলা করা যথেষ্ট সাহসের ব্যাপার ছিলো। সূর্যাস্তের পূর্বে সুহরাওয়ার্দী কিছুক্ষণ বক্তৃতা দিলেন, আমি সন্ধ্যার পর বক্তৃতা শুরু করলাম। সব প্রশংসা আল্লার প্রাপ্য। ঐ সন্ধ্যায় আমার মানসিক প্রস্তুতি ভালোই ছিলো ফলে সেদিনের বক্তৃতা হয়েছিলো আমার জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বক্তৃতা। বক্তৃতাটি মৌলানা শামসুল হুদার প্রশংসায় পরিপূর্ণ থাকায়, মৌলানা সাহেবের লোকেরা এতে বেশ আশ্চর্য হলো। তারা মাটিতে বসে তাদের অস্ত্র ঘাসের উপর রেখে দিয়ে একাগ্রচিত্তে আমার বক্তৃতা শুনল। বক্তৃতার দ্বিতীয় অংশে আমি মৌলানা সাহেবের ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করার বিষয়টি খুবই শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করে শুরু করলাম। বক্তৃতা শেষ করার পূর্ব মুহূর্তে আবুল মনসুর আহমেদ মঞ্চের কাছে ছুটে এসে বললেন, "হাশিম সাহেব, আপনি বক্তৃতা চালিয়ে যান লোকেরা আপনার বক্তৃতা শুনতে চায়।"

মুসলিম লীগের জন্য জনসভাটি খুবই সাফল্যজনক হয়েছিলো কিন্তু নির্বাচনে আমরা পরাজিত হয়েছিলাম। গিয়াসুদ্দীন পাঠান তাঁর জেলা রাজনীতিতে নূরুল আমীনের প্রচ্ছন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। নূরুল আমীন গিয়াসুদ্দিন পাঠানের সাফল্য কামনা করেননি এবং তিনি গোপনে মুসলিম লীগ প্রার্থীর বিরুদ্ধাচরণ করেন। নূরুল আমীনের এই মনোবৃত্তি আমরা জানতে পারলাম সভাশেষে ঢাকার উদ্দেশে গফরগাঁও ত্যাগ করার সময়। রেল স্টেশনে নূরুল আমীনের দেশপ্রেম বর্জিত আচরণের জন্য সুহরাওয়ার্দী তাঁকে যথেষ্ট ভৎর্সনা করলেন। ঢাকা থেকে আমি আমার নির্বাচনের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য বর্ধমান রওয়ানা হলাম।

নূরুল আলমকে আমি আমার নির্বাচন প্রতিনিধি করেছিলাম। নূরুল আলম ছিলেন বর্ধমানের অধিবাসী এবং বাংলার মুসলিম লীগ কর্মীদের অন্যতম যুবনেতা। সুহরাওয়ার্দী বরিশালে নির্বাচন অভিযান পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন এবং মহাম্মদ আজিজুদ্দীন এডভোকেটকে বরিশালে নির্বাচন অভিযান পরিচালনায় তাঁর সহকর্মী হিসাবে নিয়োজিত করেন। এ সিদ্ধান্তটি ভুল হয়েছিলো। তাঁর উচিত ছিলো বরিশালের যুবক এডভোকেট শামশের আলীকে এ দায়িত্ব প্রদান করা। আজিজুদ্দীন তাঁর জেলায় বামপন্থীদের কাছে জনপ্রিয় ছিলেন না।

এ. কে. ফজলুল হক তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গীতে সত্য ও ন্যায়ের বিচার ব্যতিরেকে সুহরাওয়ার্দীর প্রতি নানান কলঙ্ক আরোপ করলেন। ফলে সুহরাওয়ার্দী তাঁর অভিযান খুব একটা চালিয়ে যেতে পারলেন না। প্রকৃতপক্ষে পিরোজপুরে যেখানে ফজলুল হকের প্রচণ্ড প্রভাব ছিলো তিনি সেখানে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হলেন। সুহরাওয়ার্দী আমাকে টেলিগ্রাম করে জানালেন, "আপনি আপনার নির্বাচন অভিযান ত্যাগ করে শীঘ্র বরিশালে এসে বরিশাল জেলায় আমাদের অভিযানের দায়িত্ব গ্রহণ করুন।"

বর্ধমান জেলায় নূরুল আলম আমার নির্বাচনী অভিযানের দায়িত্ব নিলেন এবং আমি বরিশাল রওয়ানা হয়ে গেলাম, সেখানে ১৮ই মার্চ পর্যন্ত ব্যস্ত থাকলাম। সুহরাওয়ার্দী কলকাতা ফিরে এলেন। বরিশালে অবস্থানকালে রণদা প্রসাদ সাহার স্টীম লঞ্চ আমার ব্যবহারের জন্য নিয়োজিত ছিলো। আমি স্থির করলাম, ফজলুল হককে তাঁর প্রভাবিত অঞ্চলে নিয়োজিত রাখতে যাতে তিনি অন্য জায়গায় কাজ করার সুযোগ না পান। আমি তাঁকে দিবারাত্রি ব্যতিব্যস্ত করে রাখলাম। শ্রদ্ধাস্পদ বৃদ্ধ ফজলুল হক দেশীয় নৌকা যোগে দিবারাত্রি কর্মচাঞ্চল্যের মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। তাঁর ঐ বৃদ্ধ বয়সে অক্লান্ত শ্রমশক্তির আমি প্রশংসা করেছিলাম। তিনি প্রকৃতপক্ষে একজন লৌহমানব ছিলেন।

ফজলুল হক বরিশাল সদর দক্ষিণ এবং বাগেরহাট খুলনা এই দুই নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তিনি পিরোজপুর মহকুমার পিরোজপুর উত্তরে সৈয়দ আফজাল এবং মাঠবাড়িয়া থেকে হাতেম আলী জমাদারকে দাঁড় করিয়েছিলেন। ফজলুল হক এবং তাঁর মনোনীত দুইজন প্রার্থী আমাদের পরাজিত করেন এবং বরিশালের অন্যান্য নির্বাচনী কেন্দ্রে আমরা জয়লাভ করি। তিনি আমাদের মনোনীত প্রার্থী খান বাহাদুর সাদরুদ্দীন আহমেদকে বরিশালে এবং বাগেরহাটে ডাঃ মোজাম্মেল হককে পরাজিত করেন।

প্রদেশে আমরা আরও তিনটি আসনে পরাজিত হয়েছিলাম। গফরগাঁও-এর শামসুল হুদা, মুর্শিদাবাদ জেলার খোদা বক্স তাঁদের নির্বাচনী কেন্দ্রে এবং ফরিদপুরের বাদশা মিয়া আমাদের প্রার্থী ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া)-কে পরাজিত করেন।

সুতরাং সাধারণ নির্বাচনে আমরা সাতটি নির্বাচনী কেন্দ্রে পরাজিত হয়েছিলাম কিন্তু ফজলুল হক যখন বাগেরহাট নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে পদত্যাগ করলেন তখন উপনির্বাচনে আমরা একটি আসন ফিরে পেলাম। আফজাল, ফজলুল হকের আত্মীয় ছিলেন এবং তাঁরা বরিশালের একই গ্রাম চাখারের অধিবাসী ছিলেন। চাখারের এক মাইলের ব্যবধানে খালিশাকোটায় মুসলিম লীগের একটি নির্বাচনী শিবির ছিলো।

বালাহারের কমরেড আবদুস শহীদের নেতৃত্বে বরিশালের একদল যুব কর্মীকে মুসলিম লীগের পক্ষে কাজ করার জন্য খালিশাকোটায় নিয়োজিত রাখা হয়। চাখারের বাজার এলাকায় মুসলিম লীগের কিছুসংখ্যক কর্মী একটি রেঁস্তোরায় যখন চা পান করছিলো তখন ফজলুল হকের দলের লোকজন তাদের ঘেরাও করে আফজালের বাড়িতে জোর পূর্বক ধরে নিয়ে যায় এবং ভোট গণনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেখানে তাদের আটক করে রাখে। ফজলুল হকের অন্য এক দল, মুসলিম লীগ কর্মীদের ভোট গণনা কেন্দ্র থেকে তাড়া করে। এ ঘটনা ঘটেছিলো ঐ এলাকায় যখন ভোট গণনার দিন ধার্য হয়। মুসলিম লীগ কর্মীদের যখন ছেড়ে দেওয়া হয় তখন ফজলুল হকের কর্মীদের এরূপ বে-আইনি কার্যের বিরুদ্ধে যথোপ-যুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তারা আজিজুদ্দীনকে অনুরোধ জানায়। আজিজুদ্দীন মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াশীলদের অন্তর্ভুক্ত থাকায় মুসলিম লীগের বামপন্থী কর্মীদের অভিযোগের কোনো মূল্য দিলেন না।

বরিশালে নির্বাচনী অভিযানে আমার এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছিলো। এক সন্ধ্যায় ফজলুল হকের জায়গা চাখারে আমার লঞ্চে মুসলিম লীগের পতাকা উড়িয়ে আমি হঠাৎ উপস্থিত হলাম। তৎক্ষণাৎ স্টিমার ঘাটে ফজলুল হকের পার্টির এক নেতা এসে উপস্থিত হলেন। তাঁরা চিৎকার করে বললেন, "হাশিম ভাই, আপনাকে আমাদের ভালো লাগে এবং শ্রদ্ধা করি কিন্তু মুসলিম লীগের পতাকাবাহী আপনার লঞ্চটির দৃশ্য আমাদের নিকট অসহ্য লাগছে, আপনি ফিরে যান।" আমি আমার কেবিন থেকে বের হয়ে তাঁদের উদ্দেশে বললাম, "আমি এখানে ভোটের জন্য আসিনি, আমার চা শেষ হয়ে গেছে কাজেই আপনাদের অতিথি হিসাবে চা পান করতে এসেছি।" তাঁরা বললেন, "তাহলে ঠিক আছে, আসুন অতিথি হিসাবে আমাদের সঙ্গে চা পান করুন।"

স্টিমার থেকে আমি নামতে উদ্যত হওয়া মাত্র বি. ডি. হাবিবুল্লাহর নেতৃত্বে ফজলুল হকের কর্মীদের আরেকটি দল উপস্থিত হলো। আমাকে দেখামাত্র তারা আমাকে উদ্দেশ করে নানা রকমের অশ্লীল গালাগালি শুরু করল। তারা বলল, "আপনি বরিশালের বাঁশ দেখেননি, আপনাকে চা না পান করিয়ে বাঁশের বাড়ি মারব। আপনি কি জানেন না যে ফজলুল হক আপনার বাপ।" আমি হেসে বললাম, "হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি ছেলেবেলা থেকে জানি যে ফজলুল হক আমার বাপের

মতো।" বেশি কিছু বলার আগে হাবিবুল্লাহর লোকজন লক্ষে ইট-পাটকেল ছুঁড়তে শুরু করে দিলো। গত্যন্তর না দেখে তাড়াতাড়ি আমি সে স্থান ত্যাগ করলাম।

নির্বাচন শেষ হওয়ার পর কলকাতায় এসে ফজলুল হকের কাছে ঘটনাটি বর্ণনা করায় তিনি সেটি উপভোগ করে খুবই হেসেছিলেন। পরবর্তী সময়ে কখনো কখনো ফজলুল হক তাঁর আশেপাশে যে সমস্ত লোকজন বসে থাকতেন তাঁদের কাছে গল্পটি বর্ণনা করার জন্য আমাকে অনুরোধ করতেন।

বর্ধমানে আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন দু'জন। একজন বর্ধমান জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক আবদুস সাত্তার এবং অপরজন এম. এন. রায়ের পার্টির নূর নেওয়াজ। আমি ভোট পেয়েছিলাম ২৬,৭০২, আবদুস সাত্তার পেয়েছিলেন ৭৬৩ এবং নূর নেওয়াজ পেয়েছিলেন ২৬৩ ভোট। এভাবে ১৯৪৬ সালের ঐতিহাসিক সাধারণ নির্বাচন শেষ হলো।

## বাংলায় সুহরাওয়ার্দী মন্ত্রিপরিষদ

সুহরাওয়ার্দীর নিকট আমি প্রস্তাব করলাম যে, দলের নেতা নির্বাচনের পূর্বে মুসলিম লীগ সরকারের নীতি এবং কর্মসূচী নব নির্বাচিত মুসলিম লীগ পার্লামেণ্টারী পার্টির প্রথম সভায় আলোচনা ও অনুমোদনের জন্য পার্টির নিকট তুলে ধরা হবে। পার্টির নীতি এবং কর্মসূচীর দলিলপত্র পার্টি কর্তৃক অনুমোদন লাভের পর নেতা নির্বাচন করা হবে। সুহরাওয়ার্দী রাজি হলেন কিন্তু এ ধরনের কোনো দলিলে তাঁর স্বাক্ষর দিতে উৎসাহ বোধ করলেন না। কোনো স্পষ্ট এবং দৃঢ় অঙ্গীকারে নিজেকে আবদ্ধ রাখতে তিনি পছন্দ করতেন না।

সাধারণ নির্বাচনের পর ১৯৪৬ সালের ২রা এপ্রিল মুসলিম লীগ পার্লামেণ্টারী পার্টির প্রথম সভার তারিখ নির্ধারিত হলো। ৩নং ওয়েলেসলী ফার্স্ট লেনে মুসলিম লীগ অফিসে সভা অনুষ্ঠিত হলো। পার্লামেণ্টারী পার্টির সদস্যরা বিধানসভা ও আইনসভা উভয় সভায় যোগদান করেছিলেন। সুহরাওয়ার্দী সবার শেষে সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন। সভা আরম্ভের কয়েক মিনিট পূর্বে ফরিদপুরের লাল মিয়া আমার নিকট এসে বললেন, "সুহরাওয়ার্দীর কাছ থেকে আমি এক বার্তা এনেছি। গভর্নর সুহরাওয়ার্দীর সঙ্গে আলোচনা করার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। সুহরাওয়ার্দী মনে করেন পার্লামেণ্টারী পার্টির নেতা হিসাবে তাঁর উচিত গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা। এটা সম্ভব যদি আপনি পার্লামেণ্টারী পার্টির নেতা নির্বাচনের পূর্বে পার্টির নীতি এবং কার্যবিধি নিয়ে আলোচনার উপর বিশেষ চাপ সৃষ্টি না করেন।" সুহরাওয়ার্দীর বার্তার প্রকৃত মর্মকথা বুঝতে আমার কোনো অসুবিধে হলো না। অন্য কোনো দিক চিন্তা করার সময় না থাকায় আমি রাজি হয়ে গেলাম এবং লাল মিয়া টেলিফোন করে সুহরাওয়ার্দীকে সেকথা জানিয়ে দিলেন।

সভা শুরু হওয়ার মাত্র কয়েক মিনিট পূর্বে সুহরাওয়ার্দী এসে পৌছলেন এবং তিনি সর্বসম্মতিক্রমে মুসলিম লীগ পার্লামেণ্টারী পার্টির নেতা নির্বাচিত হলেন।

বিধানসভায় দলীয় কর্মসূচীর একটি খসড়া প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে কমিটি নিয়োগ করার জন্য সভা সুহরাওয়ার্দীকে ক্ষমতা প্রদান করল। সুহরাওয়ার্দী, শামসুদ্দীন আহমেদ, খান বাহাদুর নূরুল আমিন, মেসার্স ফজলুর রহমান, মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী, আহমেদ হোসেন, হবিবুল্লাহ বাহার, হামিদুল হক চৌধুরী, এম. এ. হামিদ এবং আমাকে নিয়ে পার্টি কর্মসূচীর খসড়া তৈরীর জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করা হলো। গভর্নর মন্ত্রিপরিষদ গঠন করার জন্য সুহরাওয়ার্দীকে আহ্বান করলেন।

১৯৩৬ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত দশ বছর মুসলমানরা বাংলায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলো এবং ১৯৪৬ সালের পরে আরও ষোলো মাস। তাঁরা সর্বজনগ্রাহ্য (accredited) হিন্দু নেতাদের ক্ষমতা থেকে আলাদা রেখেছিলেন। দু'তিন-জন হিন্দু মন্ত্রী ছিলেন কিন্তু তাঁরা তাঁদের সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করতেন না। তাঁরা ছিলেন লোক দেখানো এবং গৃহশত্রু। এর অনিবার্য প্রতিক্রিয়ার বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ সচেতন ছিলাম যার ফলশ্রুতি হিসাবে ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে বাংলা দ্বিধাবিভক্ত হয়েছিলো। কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার সঙ্গে যুক্ত মন্ত্রিপরিষদ গঠনের জন্য আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলাম। কংগ্রেসের দিক্‌পালরা এতে রাজি হতে পারেননি। তাঁরা সন্দেহ পোষণ করেন যে, যদি বাংলায় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয় তাহলে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও একইভাবে যুক্ত মন্ত্রিপরিষদ গঠনের দাবী করবে।

গান্ধী নোয়াখালী যাওয়ার প্রাক্কালে কলকাতায় সুহরাওয়ার্দীর বাসভবন ৪০নং থিয়েটার রোডে মুসলিম নেতৃবর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। গান্ধী বললেন, তিনি যুক্তফ্রণ্ট সরকার অপেক্ষা একদলীয় সরকার গঠনের পক্ষপাতী। এ বিষয়ে সুহরাওয়ার্দীর মনোভাব উদারপন্থী ছিলো।

বাংলার গভর্নর স্যার ফ্রেডারিক বারোজ সুহরাওয়ার্দীর উপর কর্মভার ন্যস্ত করার পরই তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে উল্লেখ করেন যে, তিনি কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার সঙ্গে যুক্তফ্রণ্ট গঠনে আগ্রহী রয়েছেন। বাংলায় লীগ-কংগ্রেস যুক্তফ্রণ্ট গঠনের সম্ভাবনা সম্বন্ধে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে পার্লামেণ্টারী নেতা নিযুক্ত হওয়ার পরই সুহরাওয়ার্দী বলেছিলেন, মুসলমানরা উদারভাবে সকলকে আলিঙ্গন করতে পারে এবং দেশের উন্নতির জন্য কাজ করতে পারে। তিনি কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার সঙ্গে যুক্ত মন্ত্রিপরিষদ গঠনের সম্ভাবনাকে নাকচ করেননি। সাংবাদিকদের সঙ্গে এই আলোচনা ৩রা এপ্রিলের মর্নিং নিউজ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো।

জিন্নাহ কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যদের এক সম্মেলন আহ্বান

করেন। তিন দিনের সম্মেলন ৭ই এপ্রিল দিল্লীতে অ্যাংলো এরাবিক কলেজে অনুষ্ঠিত হয়। ১০ই এপ্রিল বেলা আড়াইটায় সম্মেলনে বক্তৃতা করার জন্য জিন্নাহ আমাকে অনুরোধ করেন। বক্তৃতায় আমি বলেছিলাম, "গান্ধী ঘোষণা করেছেন যে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু হবেন তাঁর রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী। গান্ধী একজন ঋষী। সুতরাং কাশ্মীরের উদ্ধত পণ্ডিত কীভাবে একজন ঋষির রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী রূপে সন্তুষ্ট হতে পারেন? তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের উত্তরাধিকারী হবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন। যদি ন্যায়পরায়ণতা, সুবিবেচনা ও বিবেক ব্যর্থ হয় তাহলে ধারালো বাক্য নয় শানিত অস্ত্রই সমস্যার মোকাবেলা করবে।"

পূর্বাহ্নে সম্মেলনের বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে জিন্নাহ এক পাকিস্তান রাষ্ট্রের দাবী পেশ করেন। আমি পয়েন্ট অব অর্ডারের কথা বললে জিন্নাহ বললেন, "মৌলানা সাহেব আপনার কী পয়েন্ট অব অর্ডার?" আমি বললাম, "আপনার প্রস্তাবটি গ্রাহ্যতাহীন এবং কর্তৃত্ব বহির্ভূত ( void and ultra vires )।"

জিন্নাহ বললেন,"কেন কেন"? আমি বললাম, "১৯৪০সালের লাহোর প্রস্তাবকে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ তার ১৯৪১ সালের মাদ্রাজ অধিবেশনে, নিখিল ভারত মুসলিম লীগের মূলমন্ত্র রূপে স্বীকার করেছিলো। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব এক পাকিস্তানের কথা চিন্তা করেনি, চিন্তা করেছিলো ভারতীয় মুসলমানদের জন্য দুটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের কথা। মুসলিম লীগের আইনসভার সদস্য সম্মেলনের এমন অধিকার নেই যে, ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের বিষয়ের পরিবর্তন ও রূপান্তর করা যা বর্তমানে মুসলিম লীগের মূলমন্ত্র রূপে গৃহীত।"

জিন্নাহ বললেন, "ভালো, মৌলানা সাহেব বহুবচন 'এস'-এর উপর চাপ দিচ্ছেন যেটি স্পষ্টত ছাপার ভুল।" আমি নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নওবাবজাদা লিয়াকত আলী খানকে সভার কার্যবিবরণী পেশ করার জন্য অনুরোধ করায় তিনি সেটি পেশ করলেন এবং সেখানে জিন্নাহ তাঁর স্বাক্ষরিত বহুবচন 'এস' দেখতে পেলেন। নওবাবজাদা লিয়াকত আলী বললেন, "কায়েদে আজম, আমাদের পরাজয় হয়েছে।" আমাকে উদ্দেশ করে জিন্নাহ বললেন, "মৌলানা সাহেব আমি এক পাকিস্তান রাষ্ট্র চাই না, আমি চাই ভারতীয় মুসলমানদের জন্য একটি বিধানসভা। আপনি আমার প্রস্তাবটিকে এমনভাবে সংশোধন করতে পারেন কি যাতে লাহোর প্রস্তাবের অবমাননা না করে আমার উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে।" আমি বললাম, "তাহলে বিশেষণপদ 'ওয়াজ' কেটে ফেলুন এবং অনির্দিষ্ট শব্দ 'এ' বসান যাতে আপনার প্রস্তাব এরূপ হয় 'আমাদের উদ্দেশ্য হলো উত্তর-পশ্চিম ভারতে একটি পাকিস্তান রাষ্ট্র এবং বাংলা ও আসামকে নিয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতে একটি পাকিস্তান রাষ্ট্র।" জিন্নাহ এতে রাজি হলেন।

সম্মেলনে প্রকাশ্য অধিবেশনে জিন্নাহর উপদেশে এইচ. এস. সুহরাওয়ার্দী একটি প্রস্তাব পেশ করলেন। বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে জিন্নাহ যে প্রস্তাব পেশ

করেছিলেন এটি সেই প্রস্তাবের পরিবর্তিত রূপ এবং যেটি আমার সঙ্গে পয়েণ্ট অব অর্ডারের আলোচনার পর তিনি ( জিন্নাহ ) প্রত্যাহার করেন। সেই সময় আমি ইচ্ছাকৃতভাবে সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশন থেকে নিজেকে অনুপস্থিত রেখেছিলাম, কারণ আমি জানতাম, আমার উপস্থিতিতে প্রকাশ্য অধিবেশনে প্রস্তাবটি পেশ করার জন্য জিন্নাহ আমাকে বলতেন। জিন্নাহর সঙ্গে আমার বাদানুবাদ কমিউনিস্ট পার্টির পত্রিকা 'পিপলস এজ'-এ বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছিলো।

কংগ্রেস, মুসলিম লীগ সরকারের সঙ্গে নিজেদের সংযুক্ত রাখতে অস্বীকার করল। সুহরাওয়ার্দী তাঁর মন্ত্রিপরিষদ গঠন করতে বাধ্য হলেন। নূতন মুসলিম লীগ মন্ত্রিপরিষদ ১৯৪৬ সালের ২৪শে এপ্রিল শপথ গ্রহণ করল। এই মন্ত্রিপরিষদ এইচ. এস. সুহরাওয়ার্দী, রংপুরের মৌলভী আহমেদ হোসেন, নোয়াখালীর খান বাহাদুর আবদুল গফরাণ, ময়মনসিংহের খান বাহাদুর সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন, চব্বিশ পরগণার খান বাহাদুর আবদুর রহমান, কুষ্টিয়ার মৌলভী শামসুদ্দীন আহমেদ, বগুড়ার খান বাহাদুর মহম্মদ আলী এবং যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে নিয়ে গঠিত হয়েছিলো। আমি সুহরাওয়ার্দী ও তাঁর মন্ত্রিপরিষদকে দায়িত্বভার গ্রহণের পরই মুসলিম লীগের পতাকা উত্তোলন এবং চা-চক্রে যোগদান করার জন্য সোজা মুসলিম লীগ অফিসে আসতে অনুরোধ করেছিলাম। মন্ত্রীদের মধ্যে কেবলমাত্র গফরাণ সাহেব আমার অনুরোধ রক্ষা করে মুসলিম লীগ অফিসে এসেছিলেন। সুহরাওয়ার্দী নিজে এবং তাঁর মন্ত্রিপরিষদ পার্টির নিয়মানুবর্তিতার প্রতি আনুগত্য বজায় রাখার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন না। সুহরাওয়ার্দী পার্লামেণ্টারী পার্টির কাছে তাঁর শাসন ব্যবস্থার নীতি ও কর্মসূচীর কোনো দলিল পার্টির বিবেচনার জন্য তৈরী এবং পেশ করেননি।

৪০নং থিয়েটার রোডে সুহরাওয়ার্দীর বাসভবনে পার্টির এক সভায় স্থির হয় যে, বিশেষ বিশেষ মন্ত্রণালয়ের নীতি ও কর্মসূচী গঠনের জন্য প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের একটি করে উপদেষ্টা কমিটি থাকতে হবে। খুবই অনিচ্ছা সহকারে সুহরাওয়ার্দী পার্টির এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। মূল অংশ বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের নিয়মানুবর্তিতাকে দুর্বল করার লক্ষ্যে তিনি প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কর্মী ও নেতৃবৃন্দের প্রত্যক্ষ আনুগত্য লাভের প্রচেষ্টা শুরু করলেন।

বর্ধমান জেলায় আমার গ্রামের বাড়ি কাশিয়াড়ায় যা বর্তমানে কাশেমনগর নামে পরিচিত সেখানে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কর্মী এবং যুব নেতাদের এক সম্মেলন আহ্বান করলাম। এই সম্মেলনে সুহরাওয়ার্দী ও তাঁর মন্ত্রিপরিষদের অন্যতম কুষ্টিয়ার শামসুদ্দীন আহমেদ উপস্থিত ছিলেন। সেখানে স্থির হয় যে, মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ এবং কর্মীরা মন্ত্রিপরিষদের নিকট থেকে কোনো ব্যক্তিগত সুযোগ সুবিধা আদায় করতে পারবেন না, জনসাধারণের প্রয়োজনে যেসব কাজকর্ম

করার দরকার সেগুলির জন্য তাঁদেরকে জেলা মুসলিম লীগ অথবা প্রাদেশিক মুসলিম লীগের মাধ্যমে মন্ত্রিপরিষদের নিকট আবেদন করতে হবে।

সুহরাওয়ার্দীর চরিত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিলো এই যে, তিনি প্রতিহিংসাপরায়ণ ছিলেন না এবং যাঁরা তাঁর সঙ্গে একমত হতেন না তাঁদের প্রতি কোনো রকম ব্যক্তিগত বিদ্বেষভাব পোষণ করতেন না। যাঁরা প্রকৃত দুষ্ট, যাঁদের চিন্তা ও কর্ম অন্যান্য বিবেচনা ব্যতিরেকে নিছক ব্যক্তিগত স্বার্থকে কেন্দ্র করে থাকে এবং এ কারণে কোনো প্রকার নির্ভরযোগ্য নয় তাঁদের তিনি পছন্দ করতেন না। নূরুল আমিন ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তফাজ্জল আলী খাজা নাজিমুদ্দীনের এবং তাঁর গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁরা নিজেদের রাজনৈতিক আচরণে ছিলেন সংযত এবং সহানুভূতিশীল। এই দুই ব্যক্তিকে নব নিযুক্ত আইনসভার স্পীকার এবং ডেপুটি স্পীকারের পদের জন্য সুপারিশ করে সুহরাওয়ার্দীকে বলতে তিনি সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং আইনসভার প্রথম অধিবেশনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নূরুল আমিন এবং টি. আলী স্পীকার এবং ডেপুটি স্পীকার নিযুক্ত হলেন। সুহরাওয়ার্দী ও তাঁর মন্ত্রিপরিষদ ফরিদপুরের লাল মিয়াকে পার্লামেণ্টারী পার্টির চিপ হুইপ মনোনীত করার কথা স্থির করলে আমি রাজি হলাম না। আমি এর জন্য চেয়েছিলাম একজন মোটামুটি শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি। এর জন্য আমি কুমিল্লার মফিজুদ্দীন আহমেদের নাম সুপারিশ করেছিলাম এবং তিনি চিপ হুইপ হয়েছিলেন। মানুষ ও পরিবেশকে সুহরাওয়ার্দী আমার থেকেও ভালো বুঝতে পারতেন। আমার সুপারিশ সঠিক ছিলো না।

## প্রত্যক্ষ সংগ্রাম প্রস্তাব

২৯শে জুলাই (১৯৪৬) বম্বেতে জিন্নাহ সাহেব নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কাউন্সিলারদের এক সভা আহ্বান করেন। কাউন্সিলে যে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় সেটি ইতিহাসে মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম প্রস্তাব নামে পরিচিত। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, পাকিস্তান অর্জনের জন্য বৃটিশদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করতে হবে। প্রস্তাবে লীগ সভাপতি জিন্নাহকে সংগ্রাম কমিটি গঠনের কর্তৃত্ব প্রদান করে। কাউন্সিল প্রত্যক্ষ সংগ্রাম প্রস্তাব গ্রহণের পর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁদের উপর বৃটিশ সরকার প্রদত্ত খেতাব বর্জন করলেন, তাঁরা জিন্নাহর প্রতি তাঁদের নিঃস্বার্থ সমর্থনের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন। খেতাব বর্জনের অনুষ্ঠান সমাপ্ত হওয়ার পর সভায় বক্তৃতা প্রদানের জন্য জিন্নাহ আমাকে আহ্বান করলেন। আমি বললাম, "জনাব সভাপতি, আপনার প্রতি আমার নিঃস্বার্থ সমর্থন দানে আমি অপারগ। আপনার প্রতি আমার ঐকান্তিক সমর্থন থাকবে যদি প্রত্যক্ষ সংগ্রাম পরিচালিত হয় বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে—ভারতের কোনো দল বা জনগণের বিরুদ্ধে নয়। আমি

অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের খেতাব বর্জন লক্ষ্য করছিলাম। আমার যতদূর জানা আছে বৃটিশ সরকার তাদের একান্ত নিজেদের লোক ছাড়া অন্য কাউকে উচ্চ খেতাব দান করে না। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, বৃটিশদের তৈরী এইসব নেতৃবৃন্দ কি রাতারাতি তাঁদের স্বভাব পরিবর্তন করতে পারবেন ?" জিন্নাহ মুচকি হেসে আমাকে বললেন, "মৌলানা সাহেব, এইসব ব্যক্তিদের প্রতি আপনি এতটা কঠোর হবেন না।"

আমি যখন আমার চেয়ারে উপবেশন করলাম তখন জিন্নাহর সেক্রেটারী আমার নিকট এসে অনুরোধ করলেন, বিকেলে আমি যেন মালাবার হিলসের বাসভবনে জিন্নাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তিনি বললেন, আমায় সহায়তা করার জন্যে সঙ্গে আমি একজনকে নিয়ে যেতে পারি। আমি ময়মনসিংহের শামসুল হককে আমার সঙ্গে নিয়ে সময় মতো জিন্নাহর বাসভবনে উপস্থিত হয়েছিলাম। তাঁর সেক্রেটারী আমাদের অভ্যর্থনা করে লাইব্রেরী কক্ষে উপবেশন করালেন। একের পরে এক সুহরাওয়ার্দী, মৌলানা আকরাম খান, হাসান ইস্পাহানী, হামিদুল হক চৌধুরী এবং ফরিদপুরের মোহন মিয়া এসে উপস্থিত হলেন। এরপর আরব সাগরের সম্মুখভাগের বারান্দায় আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো। জিন্নাহ এসে তাঁর চেয়ারে উপবেশন করলেন। কি ব্যাপার হতে পারে ভেবে আমি আশ্চর্য হলাম।

সুহরাওয়ার্দী, শামসুল হক এবং আমি জিন্নাহর ডানপাশে বসেছিলাম, অন্যান্যরা তাঁর বামপাশে ছিলেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি মৌলানা আকরাম খান আমার বিরুদ্ধে বত্রিশ পৃষ্ঠার এক টাইপ করা অভিযোগের আবেদনপত্র জিন্নাহর নিকট পেশ করলেন। জিন্নাহ মৌলানা আকরাম খানকে জিজ্ঞেস করলেন,কাগজগুলো কিসের। মৌলানা বললেন, "এগুলো আবুল হাশিমের বিরুদ্ধে অভিযোগের আবেদনপত্র।" জিন্নাহ মুচকি হেসে বললেন, "আমি যদি এর বিচার করতে চাই তাহলে আমাকে সমস্ত ইণ্ডিয়ান এভিডেন্স এ্যাক্ট ( Indian evidence Act ), পেনাল কোড ( Penal code ) এবং ক্রিমিনাল প্রসিডিওর কোড ( Criminal Procedure code )-এর যাবতীয় ব্যবস্থাদি পড়তে হবে। যদি আমি আবুল হাশিমকে দোষী সাব্যস্ত করি তাহলে আমি কি করতে পারি ? আমি তাঁকে এক সপ্তাহের জন্য সাসপেণ্ড করতে পারি, এর বেশি কিছু নয়। মৌলানা সাহেব, আপনি ভেবে দেখেছেন কি বাংলায় এর প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে ? জনগণের কাছে ফিরে যান সেটাই হলো পুনর্বিচারের শ্রেষ্ঠ আদালত।" জিন্নাহ কাগজগুলো মৌলানা সাহেবের দিকে ঠেলে দিলেন।

ফরিদপুরের মোহন মিয়া বললেন, "স্যার আবুল হাশিম আমাদের প্রতি অন্যায় আচরণ করেন।" উত্তরে আমি বললাম, "মোহন মিয়া আমার বিপক্ষ দলের অন্যতম নেতা। তাঁর প্রতি আমাদের অবিচারের একটি উদাহরণ আমি

আপনাকে দিচ্ছি। পার্লামেণ্টারী বোর্ডে আমরা সম্পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিলাম। তিনি যে ভোট কেন্দ্র থেকে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন সেখানকার জন্য তাঁকে আমরা মনোনীতও করেছিলাম। এই ভদ্রলোক ফরিদপুর জেলা মুসলিম লীগের সভাপতি, ফরিদপুর জেলা বোর্ড এবং স্কুল বোর্ডের চেয়ারম্যান। এতদ্‌সত্ত্বেও বাংলায় মুসলিম লীগ যখন অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছিলো তখন সাধারণ নির্বাচনে তিনি পরাজিত হয়েছিলেন। তাঁর পরাজয়ের পর আমরা তাঁকে বিধানসভার জন্য মনোনীত করি এবং বর্তমানে তিনি বিধানসভার সদস্য।"

জিন্নাহ মুচকি হাসলেন। চা-চক্র শেষে সভা ভঙ্গ হলো। জিন্নাহ কয়েক মিনিট থাকার জন্য আমাকে অনুরোধ করলেন এবং আমার পিঠ চাপড়ে বললেন, "আমরা যুদ্ধে জয়লাভ করেছি। এখন আপনি জনগণের নিকট গিয়ে তাদের সঙ্ঘবদ্ধ করুন। বাংলার নিজস্ব একটি সংস্কৃতি রয়েছে।"

প্রত্যক্ষ সংগ্রামের বিক্ষোভ প্রদর্শনের দিন ধার্য করা হয় ১৬ই আগস্ট (১৯৪৬)। এর আগে সুহরাওয়ার্দী আন্দামান থেকে ঢাকা জেলে প্রত্যাগত (repatriated) আন্দামান বন্দীদের মুক্তির প্রশ্নটি মুসলিম লীগ পার্লামেণ্টারী পার্টির নিকট উত্থাপন করলে পার্লামেণ্টারী পার্টি সর্বসম্মতিক্রমে বন্দীদের মুক্তির স্বপক্ষে মত পোষণ করেন। সুহরাওয়ার্দী ১৯৪৬ সালের ১৪ই আগস্ট ঢাকায় বন্দীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং কলকাতায় অনুষ্ঠিত দাঙ্গার পরই সকল বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হলো। মুক্তির পর তাঁরা কলকাতায় এসে আমার বাসভবন ৩৭নং রিপন স্ট্রীটে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। এই বাসভবনে আমি মুসলিম লীগ অফিস থেকে মিল্লাতের প্রেস সহ ১৯৪৬ সালের জুন মাসে উঠে আসি। মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দীদের আমি দুপুরের আহারে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। সেদিনই আমি প্রথম বাংলার বিদ্রোহী নেতা মেসার্স অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, অম্বিকা চক্রবর্তী, লোকনাথ বল, আনন্দ গুপ্ত এবং অন্যান্যদের দেখলাম। বাংলার কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা কমরেড আবদুল্লাহ্ রসুল আমার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় করিয়ে দেন।

১৯৪৬ সালের ১১ই আগস্ট কলকাতা জেলা মুসলিম লীগের সম্পাদক ওসমান ১৬ই আগস্টের কর্মসূচী ঘোষণা করে এক প্রেস বিবৃতি প্রদান করলেন। কলকাতা মুসলিম লীগের পরিচালনায় ধারাবাহিকভাবে কলকাতা, হাওড়া, মেটিয়াবুরুজ এবং চব্বিশ পরগণার কারখানা অঞ্চলে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস পালন করা হয়। পানি সরবরাহ, বিদ্যুৎ, গ্যাস, ডাক ও তার বিভাগ, হাসপাতাল, ক্লিনিক, মাতৃসদন ইত্যাদির মতো অত্যাবশ্যকীয় জরুরী সার্ভিস ছাড়া সকল বেসামরিক, বাণিজ্য ও শিল্পকেন্দ্রে হরতাল এবং সাধারণ ধর্মঘট সম্পূর্ণভাবে প্রতিপালিত হয়েছিলো। প্রতিটি কেন্দ্র থেকে মিছিল ব্যাণ্ড সহ বেলা তিন ঘটিকায় অকটরলোনি মনুমেণ্টে এসে মিলিত হলো। সুহরাওয়ার্দী সভায় সভাপতিত্ব করলেন। সভায় যোগদানের

জন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায় খৃষ্টান, তফসিলী সম্প্রদায়, আদিবাসী উপজাতীয় সম্প্রদায়-সমূহের প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিলো। জুম্মার নামাজের পর প্রত্যেক মসজিদে বিশেষ মোনাজাত হয়েছিলো।

১৩ই আগস্ট এক প্রেস বিবৃতিতে আমি উল্লেখ করলাম যে বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করার জন্য মুসলিম লীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস পালন করবে এবং একথা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছিলাম, আমাদের লক্ষ্যবস্তু কেবলমাত্র বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ।

প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের খপ্পরে পড়ে বিশেষ এক মহলের উসকানী সত্ত্বেও যাতে জনসাধারণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে হেয় প্রতিপন্ন না করে সুশৃঙ্খলভাবে পালন করা হয়, সে বিষয়ে আমি প্রত্যেক শ্রেণীর লোকদের নিকট আবেদন করেছিলাম। কেন না বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্যই ছিলো দেশে যে কোনো জনপ্রিয় গণঅভ্যুত্থানকে দমন করা।

১৬ই আগস্টের অভূতপূর্ব সংঘর্ষ যা সকাল থেকে শুরু হয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলেছিলো সে বিষয়ে মুসলিম লীগের কোনোই জ্ঞান, সন্দেহ বা ধারণা ছিলো না। সংঘর্ষ চলা অবস্থায় অক্‌টরলোনি মনুমেণ্টের পাদদেশে আমরা সভার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলাম। মুসলমানরা নিরস্ত্র এবং পরিস্থিতির মোকাবেলা করার জন্য অপ্রস্তুত ছিলো। মানুষ মিথ্যা বলতে পারে কিন্তু পরিস্থিতি কখনও মিথ্যা বলে না। কলকাতায় এ উপলক্ষ্যে প্রত্যাশিত বিরাট জনসমাবেশ দেখাবার জন্য বর্ধমান থেকে আমি আমার দুই পুত্র বদরুদ্দীন মহম্মদ উমর (১৫) এবং শাহাবুদ্দীন মহম্মদ আলী (৮)-কে নিয়ে এসেছিলাম। আমি যেমন আমার দুই পুত্রকে ময়দানে নিয়ে এসেছিলাম তেমনি ফরিদপুরের লাল মিয়াও তাঁর ৬/৭ বছরের নাতিকে ময়দানে নিয়ে এসে-ছিলেন। বিপদের সম্ভাবনা আছে এমন জানা থাকলে আমরা আমাদের পুত্র এবং নাতিদের ময়দানে নিয়ে আসতাম না।

## দাঙ্গা

জনসমাবেশে লাহোরের রাজা গজনফর আলী খান ও খাজা নাজিমুদ্দীন বক্তৃতা দিয়েছিলেন। খাজা নাজিমুদ্দীন তাঁর বক্তৃতায় বললেন, "আমাদের সংগ্রাম কংগ্রেস এবং হিন্দুদের বিরুদ্ধে।" আমি তাঁকে মাইক্রোফোন থেকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ফোর্ট উইলিয়ামের দিকে ইঙ্গিত করে দৃঢ়তার সঙ্গে বললাম, "আমাদের সংগ্রাম ভারতের কোনো জনসাধারণের বিরুদ্ধে নয়, আমাদের সংগ্রাম ফোর্ট উইলিয়ামের বিরুদ্ধে।" মঞ্চে আমরা যখন উপবিষ্ট ছিলাম তখন চতুর্দিক থেকে খবর পৌছতে লাগল যে কলকাতার সর্বত্র ভীষণ দাঙ্গা শুরু হয়ে গেছে। লাল মিয়া এবং আমি আমাদের ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে ময়দান থেকে পায়ে হেঁটে রিপন স্ট্রীটে পৌছলাম।

সুহরাওয়ার্দী ১৬ই আগস্ট সাধারণ ছুটির দিন ঘোষণা করে মারাত্মক ভুল করে-

ছিলেন। শান্তিপ্রিয় হিন্দু ও মুসলমানরা এ দাঙ্গায় কোনোভাবে জড়িত ছিলেন না। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের দালাল বাহিনীর দ্বারা যে দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছিলো সেটা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের পর ভয়াবহ যেসব ঘটনা ঘটেছিলো তার দ্বারা পরিপূর্ণভাবে সমর্থিত হয়। দাঙ্গা পূর্ণদ্যোমে ১৬ই থেকে ২০শে আগস্ট পর্যন্ত পাঁচ দিনব্যাপী চলেছিলো। শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে পুলিশকে সহায়তা দানের জন্য সেনাবাহিনী তলব করতে প্রদেশের গভর্নরকে সুহরাওয়ার্দী অনুরোধ জানালেন কিন্তু সৈন্য মোতায়েন করা হলো না। পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য কলকাতার পুলিশ বাহিনী যথেষ্ট শক্তিশালী ছিলো না। কলকাতা পুলিশের কমিশনার ছিলেন ইংরেজ। দাঙ্গা চলাকালে সুহরাওয়ার্দী তাঁর প্রধান কর্মকেন্দ্র পরিবর্তন করে লালবাজার পুলিশের প্রধান কর্মকেন্দ্র কন্‌ট্রোল রুমে দিবারাত্রি অবস্থান শুরু করলেন। তিনি ট্রাক বোঝাই করে সশস্ত্র পুলিশ কনস্টেবল পাঠালেন কিন্তু তারা গন্তব্যস্থলে পৌছতে পারল না। সুহরাওয়ার্দীর অন্য আর কিছু করার ছিলো না এবং মহানগরী পাঁচ দিনব্যাপী অরক্ষিত অবস্থায় থাকল।

সুহরাওয়ার্দীর অনুরোধে পাঞ্জাব সরকার একটি বড় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন এবং তারা পরিস্থিত নিয়ন্ত্রণে এনেছিলো। সুহরাওয়ার্দী তাঁর জীবন বিপন্ন করে দিবারাত্রি তাঁর গাড়িতে চড়ে মহানগরীর চতুর্দিকে ঘোরাফেরা করেছিলেন, বিরাট হত্যাকাণ্ডের কেন্দ্রস্থল ছিলো মধ্য কলকাতা।

আমার জনৈক বন্ধু জানালেন, যে তিনি মৌলানা আজাদ সুবহানীকে বউবাজার স্ট্রীটে হেঁটে যেতে দেখেছেন। আমি তৎক্ষণাৎ মৌলানাকে খুঁজে বের করার জন্য স্বেচ্ছাসেবক ও সশস্ত্র পুলিশ পাঠালাম। ভাগ্যক্রমে তারা মৌলানাকে বউবাজার স্ট্রীটে দেখতে পেয়ে আমার বাসভবনে নিয়ে এলেন। মধ্য কলকাতায় স্নাতকোত্তর মহিলা ছাত্রীদের হোস্টেল, মন্নুজান মহিলা হোস্টেল বিবেকানন্দ রোডে অবস্থিত ছিলো। হোস্টেলে হামলা হয়েছিলো, মহিলা ছাত্রীদের জীবন এবং সম্ভ্রমের প্রতি হুমকিও দেওয়া হয়েছিলো। দাঙ্গাবাজরা হোস্টেল থেকে মুসলিম লীগের পতাকা টেনে নামাতে চাইলে ছাত্রীরা সাহসের সঙ্গে বাধা প্রধান করেছিলো। আমি সে খবর পেয়ে হোস্টেলের বসবাসরতা ছাত্রীদের উদ্ধার করার জন্য সঙ্গে সঙ্গে একটি ট্রাকে স্বেচ্ছাসেবক ও সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী পাঠালাম। আমার বাস-ভবন ৩৭নং রিপন স্ট্রীটে তাদের নিয়ে আসা হলো। প্রেস বিবৃতির মাধ্যমে সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রীদের পিতামাতা ও অভিভাবকদের জানিয়ে দিলাম যে তাঁরা আমার বাসভবনে নিরাপদে রয়েছেন। দাঙ্গা যখন প্রশমিত হলো সুহরাওয়ার্দী কিছু-সংখ্যক ছাত্রীদের পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য তহবিলের ব্যবস্থা করলেন।

কলকাতা হত্যাকাণ্ডের দুঃখজনক সংবাদ ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল এবং এই হত্যাকাণ্ডের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া স্বরূপ নোয়াখালী ও কুমিল্লা জেলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়ে গেলো। খিদিরপুর পোর্টের ডক কর্মীদের অধিকাংশই ছিলো

নোয়াখালী ও কুমিল্লার অধিবাসী। কলকাতার দাঙ্গায় তারা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলো। কলকাতায় ক্ষতিগ্রস্তদের অধিকাংশই ছিলো মুসলমান।

২১শে আগস্ট (১৯৪৬) সুহরাওয়ার্দী তাঁর বাসভবন ৪০নং থিয়েটার রোডে সর্বদলীয় নেতৃবৃন্দের এক সভা আহ্বান করলেন। উপস্থিত নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন সুহরাওয়ার্দী, শরৎচন্দ্র বোস, খাজা নাজিমুদ্দীন, কিরণ শংকর রায়, এম. এ. ইস্পাহানী, কে. সি. গুপ্ত, এস. এম. ওসমান, শামসুদ্দীন আহমেদ, হামিদুল হক চৌধুরী, খাজা নূরুদ্দীন এবং আমি। সুদীর্ঘ আলোচনার পর স্থির হলো যে সর্বদলীয় নেতৃবৃন্দ অগ্রভাগে থেকে এক মিছিল সংগঠিত করে জনসাধারণকে অবহিত করবেন যে শান্তি আনয়নে সচেষ্ট হয়ে সব দল একত্রিত হয়েছেন। এভাবে তাঁরা জনসাধারণকে শান্ত থাকার এবং মহানগরীর স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে আপ্রাণ চেষ্টা করার জন্য জনসাধারণকে উদ্যোগী করবেন। সুহরাওয়ার্দীর বাসভবন থেকে লরি যোগে বিভিন্ন দলের পতাকা বহন করে হিন্দু, মুসলমান, তফসিলী সম্প্রদায় এবং কম্যুনিস্ট নেতৃবৃন্দ সমভিব্যাহারে মিছিল বের করা হলো। এই মিছিল পার্ক সার্কাস, এণ্টালি, বেনিয়াপুকুর, এলগিন রোড, ভবানীপুর, বালিগঞ্জ, কালীঘাট, আলীপুর, খিদিরপুর এবং উত্তর কলকাতার মধ্য দিয়ে ঘোরায় এবং সব দলের নেতৃবৃন্দের অংশ গ্রহণের ফলে প্রত্যাশিত ফল লাভ হয়েছিলো।

১৯৪৬ সালের ২৪শে আগস্ট ভারতের ভাইসরয় লর্ড ওয়েভেল কলকাতা সফর করলেন। তিনি সর্বদলীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দাঙ্গা বিধ্বস্ত এলাকা এবং ত্রাণ কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করে ২৬শে আগস্ট তিনি দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন। খাজা নাজিমুদ্দীন, সুহরাওয়ার্দী, মির্জা আহমেদ ইস্পাহানী, কলকাতা মুসলিম লীগের সেক্রেটারী এস. এম. ওসমান, হামিদুল হক চৌধুরী, শেঠ আদমজী, হাজী দাউদ এবং আমি ভাইসরয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। আমাকে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে খাজা নাজিমুদ্দীন বললেন, "মহামান্য বড়লাট বাহাদুর (your Excelleney) আমার উচিত স্পষ্টভাবে কথা বলা। ইনি হলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিম। ইনি আপনাদের ভারত ত্যাগ করে চলে যাওয়ার আগ্রহে বিশ্বাসী নন।" ফল দাঁড়াল এই যে, ভাইসরয় দাঙ্গার ব্যাপারে আমার সঙ্গে আলোচনা শুরু করলেন। আলোচনা করতে গিয়ে আমি বললাম, "কলকাতার প্রতিটি হত্যা, অগ্নিকাণ্ড এবং ধর্ষণের জন্য মহামান্য বড়লাট বাহাদুর দায়ী। ভাইসরয় জানতে চাইলেন কেন তাঁকে অপরাধের জন্য আমি দায়ী করছি।"

আমি বললাম, "সরদার প্যাটেল জোর গলায় বলেছেন যে কংগ্রেসকে ক্ষমতা হস্তান্তর করে বৃটিশরা ভারত পরিত্যাগ করবেন। অপরপক্ষে জিন্নাহ চিৎকার করে বলেছেন মুসলমানদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে বৃটিশরা ভারত পরিত্যাগ করবেন —যাদের কাছ থেকে ভারতে তাঁরা ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। এর ফলে

হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে এই বিশ্বাস দাঁড়ায় যে তাঁরা গৃহযুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন।" ভাইসরয় বললেন, "ভারতীয় নেতৃবৃন্দের উক্তিতে আমি কিভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারি?" আমি বললাম, "আমি চাই না যে আপনি হস্তক্ষেপ করুন, কিন্তু বৃটিশ সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে আপনি কিভাবে আপনার সুস্পষ্ট নিরবতাকে ব্যাখ্যা করবেন? আপনার উচিত ছিলো আপনার সরকারের মনোভাবকে ব্যাখ্যা করা।"

২৯শে আগস্ট নোয়াখালী জেলায় হঠাৎ আকস্মিক উত্তেজনার সৃষ্টি হলো। খিদিরপুরের ডক কর্মীদের গণহত্যার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ এটা হয়েছিলো। ৭ই সেপ্টেম্বর মৌলানা গোলাম সারওয়ারের নেতৃত্বে নোয়াখালীর মৌলবীদের এক সভায় ঘোষণা করা হয় যে কলকাতা হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মুসলমানদের যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। নোয়াখালী এবং কুমিল্লা জেলার সর্বত্র দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ল এবং সময়োচিত ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে পূর্ববঙ্গের সমস্ত জেলাব্যাপী দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ত। সুহরাওয়ার্দী আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার আপ্রাণ প্রচেষ্টা করেছিলেন।

গান্ধী নোয়াখালী জেলার দত্তপাড়ায় ১৪ই নভেম্বর (১৯৪৬) পৌঁছলেন। গান্ধীর সেক্রেটারী, ভুলাভাই দেশাই, নাতনী মুন্নী গান্ধী এবং নাত বউ আভা গান্ধী তাঁর সঙ্গে ছিলেন। সুহরাওয়ার্দী দত্তপাড়ায় গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। গান্ধী পদব্রজে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে হিন্দুদের মনোবল পুনরুজ্জীবিত করেন। সুহরাওয়ার্দী প্রত্যেক বিপজ্জনক জায়গায় শান্তি ও শৃঙ্খলা আনয়নের জন্য সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করেন। জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে শরণার্থী শিবির খোলা হয় এবং দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ত্রাণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। গান্ধী ও তাঁর সঙ্গীরা বঙ্গীয় সরকারের অতিথি হিসাবে নোয়াখালী যান এবং সেখানে অবস্থান করেন। গান্ধীর নোয়াখালী সফর নোয়াখালী ও কুমিল্লা এই দুই জেলায় সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর মুসলমানদের নিষ্ঠুর আচরণের ব্যাপারে পৃথিবীর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলো। কলকাতা এবং বিহারে ক্ষতিগ্রস্তদের অধিকাংশই ছিলো মুসলমান। গান্ধী কলকাতা বা পাটনা কোথাও সফর করেননি।

১৯৪৬ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর পাটনায় দাঙ্গা শুরু হয়। খাজা নাজিমুদ্দীন এবং আমি পাটনা সফর করে বিহারের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিনহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম। পাটনার দাঙ্গা শুরু হওয়ার তিন দিন পর বিহারের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী রাঁচি থেকে সিনহা পাটনায় পৌঁছেছিলেন। পাটনায় পৌঁছতে বিলম্বের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বল্লেন, তিন দিন পর্যন্ত রাঁচি থেকে পাটনায় আসার কোনো প্লেন ছিলো না। বিহারের দাঙ্গায় বিহার কংগ্রেস কমিটির সভাপতি প্রফেসর আবদুল বারি এবং একজন প্রখ্যাত শ্রমিক নেতা নিহত হন। জিন্নাহও কলকাতা এবং পাটনা সফর করেননি। দাঙ্গা প্রসঙ্গে

মন্তব্য করতে গিয়ে 'স্থির মস্তিষ্কে' জিন্নাহ্ বলেছিলেন যে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তাঁর দ্বিজাতিতত্ত্ব প্রমাণ করেছে।

## ক্যাবিনেট মিশন

১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে ভারতের সেক্রেটারী অব স্টেট লর্ড পেথিক লরেন্স, বোর্ড অব ট্রেডের সভাপতি স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ এবং নৌবাহিনীর প্রথম লর্ড, এ. ভি. আলেকজাণ্ডারকে নিয়ে গঠিত বৃটিশ মন্ত্রিপরিষদের একটি দল ভারতে আগমন করেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিলো মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেসের মধ্যে পরস্পর বিরোধী চিন্তাধারার সংযোগ সাধনের উপায় খুঁজে বের করা। তাঁরা একটি কেন্দ্রীয় ফেডারেল সরকারের অধীনে উপমহাদেশের প্রদেশগুলিকে নিয়ে তিনটি স্বায়ত্তশাসিত গ্রুপ গঠনের প্রস্তাব করেন এবং এটাই ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান নামে পরিচিত। মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেস ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান গ্রহণ করেছিলো। যদি ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান কার্যে পরিণত করা হতো তাহলে লাহোর প্রস্তাবের আদর্শগত বিষয়-বস্তুকে বিশেষ ক্ষুণ্ন না করে উপমহাদেশের বিভাজন পরিহার করা যেত।

দুর্ভাগ্যবশত এই চূড়ান্ত মুহূর্তে কংগ্রেসের সভাপতিরূপে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের স্থলাভিষিক্ত হলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। সাংবাদিক সম্মেলনে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেন যে, কংগ্রেস ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান মেনে চলতে অঙ্গীকারবদ্ধ নয় এবং তাঁরা তাঁদের ইচ্ছে অনুযায়ী যেভাবে খুশী উপমহাদেশের সংবিধান রচনা করবেন। এই উক্তির সুস্পষ্ট প্রতিক্রিয়া হয়েছিলো। মুসলিম লীগ ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের দিকে ফিরে গেলো। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর প্রেস বিবৃতির যুক্তিগ্রাহ্য পরিণতি হিসাবেই মুসলিম লীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম প্রস্তাব গ্রহণ এবং পরবর্তী বিধানসভা বর্জন করেছিলো।

সুহরাওয়ার্দী ১২ই আগস্ট (১৯৪৬) জনৈক আমেরিকান সাংবাদিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার কালে বলেছিলেন, "মুসলিম লীগকে এড়িয়ে গিয়ে কংগ্রেসকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতকরার সম্ভাব্য পরিণতি দাঁড়াবে বাংলার পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা এবং অনুরূপ সরকার গঠন।" তিনি আরও বলেন, "বাংলা থেকে যাতে কোনো রাজস্ব আদায় করা না যায় সে ব্যবস্থা এবং কেন্দ্রের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না রেখে বাংলাকে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে গণ্য করব। দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়ার কোনো ইচ্ছে লীগের নেই তবে যদি আমাদের উপর চাপ সৃষ্টি করা হয় তাহলে লীগ এরূপ কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করবে।" সুহরাওয়ার্দী অভিযোগ করেন যে, কংগ্রেস যদি জাতীয়তাবাদী মুসলিমদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদে অন্তর্ভুক্ত করে তাহলে তারা অন্তর্বর্তী সরকারে লীগের যোগদানে বাধা সৃষ্টি করবে। সুহরাওয়ার্দী মন্তব্য করেন, জাতীয়তাবাদী মুসলিমদের সরকারে অন্তর্ভুক্ত করলে তা সারা ভারতকে আন্দোলনের মুখে ঠেলে দিয়ে গৃহযুদ্ধের সূচনা এবং দেশকে বিচ্ছিন্ন করবে।

২৪শে আগস্ট ( ১৯৪৬ ) ভাইসরয়, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, সরদার বল্লভ ভাই প্যাটেল, রাজেন্দ্র প্রসাদ, আসফ আলী, রাজা গোপাল আচারী, শরৎচন্দ্র বোস, জন মাথাই, সরদার বলদেব সিংহ, স্যার শারাফাত আহমেদ খান, জগজীবন রাম, সৈয়দ আলী জাহির এবং সি. এইচ. ভাবাকে নিয়ে তাঁর কার্যনির্বাহী পরিষদ পুনর্গঠন করলেন। লর্ড ওয়াভেল অন্তর্বর্তী সরকারে এবং বিধানসভায় যোগ দানের জন্য মুসলিম লীগকে তাঁদের নীতি পুনর্বিবেচনা করার জন্য আহ্বান করলেন। এর পূর্বে ভারতের সংবিধান রচনার জন্য বিধানসভা গঠিত হয়েছিলো এবং বাংলা থেকে বিধানসভায় আমি অন্যতম সদস্য মনোনীত হয়েছিলাম।

ভাইসরয়ের কার্যনির্বাহী পরিষদ কেবলমাত্র কংগ্রেসকে নিয়ে পুনর্গঠনের বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে ২৬শে আগস্ট জিন্নাহ বলেন, "ভাইসরয় যে পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন সেটা খুবই অবিবেচনাপ্রসূত ও অরাজনীতিজ্ঞসুলভ।" জিন্নাহ বিধান-সভা বর্জন করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

কলকাতা দাঙ্গার উপর আলোচনা করার জন্য কংগ্রেস ১২ই সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় আইন পরিষদে মুলতবী প্রস্তাব উত্থাপন করে। ১৩ই সেপ্টেম্বর আলোচ্য বিষয় নিরূপণের পর বিরোধী দলের নেতা ধীরেন দত্ত, সংসদ সদস্য বিমল সিনহা মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর মন্ত্রিপরিষদের উপর দুটি অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। মুলতবী প্রস্তাব আলোচনার দিন ১৯শে সেপ্টেম্বর ধার্য করা হলো। সুহরাওয়ার্দী Censure motion-কে স্বাগত জানিয়ে বললেন, "কলকাতার বিভীষিকার উপর সংসদ সদস্যদের আলোচনার সুযোগ দেওয়ায় খুশী হয়েছি।"

কংগ্রেসকে উদ্দেশ করে আমার বক্তৃতায় আমি বলেছিলাম, "আপনারা সব সময়েই বলে আসছেন যে, তৃতীয় দল, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের হস্তক্ষেপের দরুন হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে। কোথায় এখন সেই তৃতীয় দল ? হিন্দুরা মুসলমানদের এবং মুসলমানরা হিন্দুদের দোষী সাব্যস্ত করছে। কোথায় এখন সেই তৃতীয় দল ? অনুগ্রহ করে বিস্মৃত হবেন না যে, ভারতে বৃটিশদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রক্তরঞ্জিত পথে। বিগত পঞ্চাশ বৎসরে আপনাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ফলে ভারতীয় মানচিত্রে সেই লাল রঙ মুছে গেছে এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতীয়দের রক্তে ভারতীয় মানচিত্রে গাঢ় লাল রঙ লেপন করতে।" দুটি অনাস্থা প্রস্তাবই আলোচনান্তে ভোটে নাকচ হয়ে যায়। ইউরোপীয়ান সদস্যরা নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

## অন্তর্বর্তী সরকার

১৯৪৬ সালের ১৫ই অক্টোবর মুসলিম লীগ অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদান করল। মুসলিম লীগের মনোনীত ব্যক্তিরা হলেন, নওবাবজাদা লিয়াকত আলী খান, সরদার আবদুর রব নিশতার, আই. আই. চুন্দ্রীগড়, রাজা গজনফর আলী এবং

যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। এটা খুবই আশা করা হয়েছিলো যে, অন্তর্বর্তী সরকারের জন্য নওবাব মহম্মদ ইসমাইল এবং খাজা নাজিমুদ্দীনকে মনোনীত করা হবে। রাজা গজনফর আলী ও চুন্দ্রীগড়ের কোনোপ্রকার রাজনৈতিক প্রাক্‌পরিচিতি ছিলো না। জিন্নাহ বাংলা থেকে কোনো মুসলমানকে গ্রহণ করেননি। বাংলাকে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে নির্বাচন করা হয়েছিলো।

সরদার প্যাটেল স্বরাষ্ট্র, তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের দপ্তর গ্রহণ করেন। তাঁরা অর্থ মন্ত্রণালয়ের দপ্তর মুসলিম লীগকে প্রদান করার প্রস্তাব করেন। কংগ্রেস ভেবেছিলো অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালনে মুসলিম লীগ শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হবে। জিন্নাহও এ বিষয়ে একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। পাঞ্জাব অর্থ বিভাগের চৌধুরী মহম্মদ আলী অর্থ দপ্তর গ্রহণ করার জন্য জিন্নাহকে পরামর্শ দিলেন এবং নওবাবজাদা লিয়াকত আলী খানকে সর্বান্তকরণে সমর্থন দানের প্রতিজ্ঞা করলেন। জিন্নাহ তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। লিয়াকত আলী খানকে অর্থ বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হলো। ভারত সরকারের অর্থ বিভাগের আরোও দু'জন অর্থ বিষয়ক দক্ষ ব্যক্তি গোলাম মহম্মদ এবং মীর্জা মমতাজউদ্দীন, চৌধুরী মহাম্মদ আলীর দলে যোগ দিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রথম বাজেট তৈরীতে সাহায্য করেন। বাজেটটি প্রগতিশীল জনগণের বাজেট রূপে উচ্চ প্রসংশিত হয়েছিলো।

কংগ্রেস দারুণভাবে হতাশ হলো। কংগ্রেসের প্রত্যাশা ছিলো যে, নওবাবজাদা লিয়াকত আলী খান শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হবেন যেটা সত্যে পরিণত হলো না।

কংগ্রেস অচিরেই উপলব্ধি করল যে, মুসলিম লীগকে অর্থ দপ্তর হস্তান্তর করে তারা বিরাট ভুল করেছে। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁর বই 'India Wins Freedom'-এ লিখেছেন, "প্রত্যেক দেশে অর্থ দপ্তরের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী শাসন প্রণালীতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকেন। ভারতে তাঁর অবস্থিতি আরও গুরুত্বপূর্ণ কেন না বৃটিশ সরকার অর্থমন্ত্রীকে তাদের স্বার্থের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে গণ্য করে থাকে। এ দপ্তরের দায়িত্ব বরাবর এক একজন ইংরেজকে দেওয়া হয়েছে এবং এ উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে তাঁদেরকে ভারতে নিয়ে আসা হয়েছে। অর্থমন্ত্রী প্রতিটি বিভাগেই হস্তক্ষেপ এবং কার্যসূচী প্রণয়ণ করতে পারতেন। লিয়াকত আলী খান যখন অর্থমন্ত্রী হলেন তখন তিনি শাসন প্রণালীতে মুখ্য অধিকার লাভ করলেন। প্রতিটি বিভাগের প্রতিটি প্রস্তাব তাঁর বিভাগের সূক্ষ্ম পর্যালোচনা সাপেক্ষ ছিলো। এ ছাড়াও তাঁর যে কোনো প্রস্তাব নাকচ করার অধিকার ছিলো। তাঁর বিভাগের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোনো বিভাগে চাপরাসী নিয়োগ করাও সম্ভব ছিলো না।"

ভাইসরয়ের কার্যনির্বাহী পরিষদে মুসলিম লীগ সদস্যদের স্থান দেওয়ার জন্য কিছুসংখ্যক কংগ্রেস সদস্যদের বাদ দিতে হয়েছিলো। কংগ্রেস স্থির করল, লীগ মনোনীত প্রার্থীদের স্থান সংকুলানের জন্য শরৎচন্দ্র বোস, স্যার শাফাত আহমেদ

খান এবং সৈয়দ আলী জাহিরের পদত্যাগ করা উচিত। শরৎচন্দ্র বোস ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে কলকাতা প্রত্যাবর্তন করলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জেল থেকে মুক্তি লাভ করার পরই শরৎচন্দ্র বোস কলকাতায় মির্জাপুর পার্কে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, "পাকিস্তান একটি অর্থহীন আজগবী ব্যাপার।" এরপর থেকে উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম যে, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে বোঝাব, ভারতকে প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন করতে হলে ভারতের প্রতিটি দেশ ও জাতিকে স্বাধীন এবং সার্বভৌম হতে হবে। আমি স্থির করলাম শরৎচন্দ্র বোসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব।

অন্তর্বর্তী সরকারে কংগ্রেসের তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিলো এবং তারা ভালোভাবে বুঝেছিলো যে, মুসলিম লীগ মন্ত্রীদের নিয়ে যে সরকার সেটার অর্থইহলো কংগ্রেসের জন্য অশেষ ঝামেলাস্বরূপ। কার্যনির্বাহী পরিষদের কংগ্রেস সদস্যদের যে কোনো প্রস্তাব অর্থমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান পরিবর্তন নতুবা অগ্রাহ্য করতেন। কংগ্রেসের এই বাস্তব অভিজ্ঞতা কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক পরিবর্তন সাধন করল। সাধারণভাবে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এবং বিশেষভাবে সরদার প্যাটেল বুঝতে পারলেন যে, ভারত বিভাগই একমাত্র সমাধানের পথ।

ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান ব্যর্থ হলো এবং লর্ড ওয়াভেলকে ডেকে পাঠানো হলো। ভারতের শেষ ভাইসরয় হিসাবে লর্ড মাউণ্টব্যাটেনকে ভারতে পাঠানো হলো। তিনি ২২শে মার্চ ভারতে পৌছান এবং ২৪শে মার্চ ভারতের ভাইসরয় ও গভর্নর জেনারেল হিসাবে শপথ গ্রহণ করলেন।

## বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা

ফজলুল হক সাহেব মুসলিম লীগ ত্যাগ করার পর এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, নওবাব হবিবুল্লাহ, পি. এন. ব্যানার্জী, সন্তোষ কুমার বোস, শামসুদ্দীন আহমেদ, মৌলবী আবদুল করিম এবং উপেন্দ্রনাথ বর্মণকে নিয়ে যখন বাংলায় নূতন মন্ত্রিপরিষদ গঠন করলেন তখন নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ফজলুল হক ও তাঁর মুসলমান সহকর্মীদের মুসলিম লীগ থেকে বহিষ্কার করল। ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর মুসলিম লীগ পরিত্যাগকারীদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। ১৯৪৬ সালের ১লা সেপ্টেম্বর মুসলিম লীগে পুনরায় যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করে ফজলুল হক জিন্নাহকে একটি চিঠি লিখলেন। তিনি মুসলিম লীগ এবং তার আদর্শের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্যের অঙ্গীকার করে তাঁর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার জন্য প্রার্থনা জানালেন।

জিন্নাহ নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলেন, ফজলুল হক এবং তাঁর দল মুসলিম লীগে পুনরায় যোগদান করলেন। ১৯৪৬ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর এক প্রেস বিবৃতিতে জিন্নাহ বললেন, "১লা এবং ৩রা সেপ্টেম্বর জনসাধারণের কাছে ফজলুল হকের

ঘোষণা অনুযায়ী, লিখিত বিবৃতির মাধ্যমে লীগের প্রতি নিঃশর্ত সমর্থন ও আনুগত্যের কথা ঘোষণা করার পর এবং এই ঘোষণা অনুসরণ করে আমাকে লিখিত ৩রা সেপ্টেম্বরের চিঠিতে পাঁচ বৎসর পূর্বের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানালে, সৎ মনোভাবের বশবর্তী হয়ে মুসলিম লীগে পুনরায় যোগদানের নিশ্চয়তা প্রদান, সদস্যপদের ফর্ম ও ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর প্রদান এবং কলকাতা মুসলিম লীগের মাধ্যমে প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠানে তাঁর সদস্যপদের জন্য সেটি পেশ করার পর তাঁর উপর যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিলো তা আমার জরুরী ক্ষমতাবলে তুলে নিচ্ছি। এই আশায় যে, ফজলুল হক মুসলমানদের বিধিসংগত ক্ষমতার অধিকারী প্রতিনিধিত্বমূলক জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং আমাদের পাকিস্তান অর্জনের হেতু মুসলিম লীগকে সততা বিশ্বস্ততা এবং নিঃস্বার্থভাবে সেবা করবেন" ('দি স্টেটসম্যান'; ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬)।

ফজলুল হক ১৯৪৭ সালের ৩১শে জানুয়ারীতে 'মর্নিং নিউজ' পত্রিকায় প্রকাশিত বিবৃতিতে বলেছিলেন, "মৌলানা আকরাম খাঁর পদত্যাগ পত্র দাখিল করার পরিণাম স্বরূপ বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতির আসন শূন্য হওয়ার সম্ভাবনা পরিলক্ষিত হওয়ায়, আমি সভাপতি নির্বাচনে একজন প্রার্থী হতে ইচ্ছা পোষণ করছি। অবশ্য মৌলানা সাহেবের পদত্যাগ পত্র যদি গৃহীত হয় তবেই। একটি সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়মের অনুসারী হয়ে আমার প্রার্থী পদের বিষয়ে কিছু বলতে চাই। নিখিল ভারত মুসলিম লীগ, বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ যার একটি শাখা, ১৯০৫ সালের ২৮শে ডিসেম্বর ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো এবং জন্মলগ্ন থেকেই আমি ছিলাম এর অন্যতম সংগঠক। ১৯১৫ সাল পর্যন্ত আমি বঙ্গীয় লীগের সম্পাদক ছিলাম, তারপর আমি স্থায়ী সভাপতি রূপে স্যার সেলিমুল্লাহ বাহাদুরের স্থলাভিষিক্ত হই। ১৯১৭ সালে এক বছরের জন্য আমি নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হই এবং ১৯১৮ সালে দিল্লীতে এর একাদশ বাৎসরিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করি। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন লীগের কি সেবা করেছি সেটা সাম্প্রতিক ঘটনা এবং রাজনীতি সচেতন ব্যক্তিমাত্রেই সে বিষয়ে অবগত রয়েছেন। স্বাধীন জাতি হিসাবে ভারতে সম্মানজনক অস্তিত্বের জন্য এই চরম সন্ধিক্ষণে আমাদের সংগ্রামে মুসলিম লীগের অধীনে আমি নিজেকে উৎসর্গ করতে উৎকন্ঠিত। লাহোরে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবের উত্থাপক হিসাবে আমাদের জাতীয় লক্ষ্য পাকিস্তান অর্জনের জন্য যদি জীবন বিসর্জনও দিতে হয় তাহলে সেটা হবে আমার গর্বের বিষয়। কারণ আমি মনে করি আদর্শের জন্য ত্যাগের কাছে অন্য কোনো ত্যাগই খুব বড় হতে পারে না, কেন না আদর্শই হলো মানব জীবনের সব চেয়ে মহান্ দিক। আমার বিশ্বাস, বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কাউন্সিল সদস্যরা আমার অনুরোধে আমার পক্ষে তাঁদের ভোট প্রদান করবেন। আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এই ঘোর দুর্দিনে

মৌলানা সাহেবের ( আকরাম খাঁ ) পদত্যাগ দাখিলে আমি সব চেয়ে বেশি মর্মাহত হয়েছি। বাংলার রাজনীতিতে তাঁর এক অনন্য পরিচিতি আছে এবং জীবিতদের মধ্যে তেমন কেউ নেই যিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করতে পারেন। নির্বাচিত হওয়ার জন্য আমি যত আশা করছি তার থেকে বেশি এই আশা পোষণ করছি যে, নির্বাচনের মতো পরিস্থিতি যেন দেখা না দেয় এবং মৌলানা সাহেব তাঁর পদে বহাল থেকে অতীতের মতো আমাদের পথ প্রদর্শন করতে থাকেন।"

মৌলানা আকরাম খাঁর পদত্যাগ পত্র পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি পদের নির্বাচনে অংশ নেওয়ার কথা ঘোষণা করলাম। ১৯৪২ সালে ফজলুল হক সাহেব মুসলিম লীগ পরিত্যাগ করলে খাজা. নাজিমুদ্দীন এবং তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা ফজলুল হককে গাদ্দার বা বিশ্বাসঘাতক বলতে শুরু করেন। খাজা সাহেব ( নাজিমুদ্দীন ) এবং তাঁর দলের লোকজন এখন ফজলুল হককে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি পদের জন্য আমার বিরুদ্ধে দাঁড় করালেন। কারণ খাজা সাহেব এবং তাঁর দলের লোকজন জানতেন যে, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কাউন্সিলাররা তাঁদের কাউকেই বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সভাপতি পদের জন্য গ্রহণ করতে রাজি হবেন না। সুতরাং তাঁরা আমার বিরুদ্ধে ফজলুল হককে দাঁড় করাবার কথা স্থির করলেন। তাঁদের অন্য কোনো উপায় ছিলো না তাই শেষবারের মতো তাঁরা বঙ্গীয় মুসলিম লীগের প্রধান হওয়া থেকে আমাকে বিরত রাখার চেষ্টা চালালেন। খাজা নাজিমুদ্দীন এবং তাঁর লোকজনদের আমার সম্পর্কে ভীতি পুনরায় তাঁদের ফজলুল হককে দেশপ্রেমিক এবং যথার্থ মুসলিম লীগার-এ পরিণত করল।

বঙ্গীয় সরকারের অতিথি হিসাবে গান্ধীর নোয়াখালী সফর এবং নোয়াখালী ও কুমিল্লা জেলায় তাঁর কর্মকাণ্ড বাংলার মুসলমানদের চিত্তে দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিলো। ফজলুল হক এবং খাজা নাজিমুদ্দীন এই পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ নিয়ে সুহরাওয়ার্দী ও তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে বাংলার মুসলমানদের ইন্ধন জুগিয়েছিলেন। ফজলুল হক কুমিল্লা ও নোয়াখালী ভ্রমণ করলেন এবং কুমিল্লায় এক জনসমাবেশে গান্ধীকে নোয়াখালী ত্যাগ করে চলে যাওয়ার দাবী জানালেন। নোয়াখালী জেলার রায়পুরায় ১৭ই ফেব্রুয়ারী প্রার্থনা সভায় গান্ধী বললেন, "মৌলবী সাহেব ( এ. কে. ফজলুল হক ) যে দায়িত্বপূর্ণ পদে বহাল রয়েছেন সে অবস্থায় তাঁর এই প্রকার উক্তিকে আমি দুর্ভাগ্যজনক বলে মনে করি এবং এরপরও তিনি বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সভাপতি হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন।"

গান্ধী বললেন যে, দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টির ব্যাপারে তিনি কিছু করেছেন বলে তাঁর জানা নেই। ফজলুল হক গান্ধীকে টেলিগ্রাম করে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার কথা জানালেন। ফজলুল হক তাঁর টেলিগ্রামে বললেন, "আমার ধর্মের বিধান কাউকে অসম্মান বা অপমান করা নয়। কিন্তু চিন্তা ও কর্মে

স্পষ্টবাদিতা আমার জীবনের মূলনীতি এবং আমার কুমিল্লা বক্তৃতায় নোয়াখালীতে আপনার অবস্থানের বিষয়ে আমি যে চিন্তা করেছিলাম সেটাই জনসাধারণের কাছে ব্যক্ত করেছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যখন বিহারে সংখ্যাগরিষ্ঠরা সংখ্যালঘুদের নৃশংসভাবে হত্যা করছে সে সময়ে নোয়াখালীতে আপনার যাওয়াটা গুরুতর ভুল হয়েছে।" ২৭শে ফেব্রুয়ারী হিমেহাটে ফজলুল হক গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং গান্ধী ২৮শে ফেব্রুয়ারী পাটনার উদ্দেশে নোয়াখালী ত্যাগ করলেন।

১৯৪৭ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী মৌলানা আকরাম খাঁর পদত্যাগের বিষয় এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচনের জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কাউন্সিল সভা আহ্বান করা হলো। ফজলুল হক সহ খাজা নাজিমুদ্দীনের সঙ্গীরা নোয়াখালী ও কুমিল্লায় খিদিরপুর ডক শ্রমিকদের সংগঠিত করলেন। কলকাতায় এসব লোকদের নিয়ে আসা হয়েছিলো সুহরাওয়ার্দী এবং আমার বাসভবনের সামনে আমাদের বিরুদ্ধে শ্লোগান দেওয়ার জন্যে। প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কাউন্সিল সভার নির্দিষ্ট দিন ধার্য হওয়ার কয়েকদিন পূর্বে ফজলুল হক আমাকে অনুরোধ জানিয়ে বললেন আমি যেন আমার প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে তাঁকে সমর্থন করি। কিন্তু আমি রাজি হলাম না। এখন আমি মনে করি, সে সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি গুরুতর ভুল করেছিলাম।

সেই সময় মধুপুরে মৌলানা আকরাম খাঁ তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীকে নিয়ে বাস করছিলেন। সেখানে তিনি একটি বাড়ি তৈরী করেছিলেন। মৌলানা সাহেব তাঁর লয়প্রাপ্ত জনপ্রিয়তা পুনরুদ্ধারের জন্য প্রায়ই বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা প্রদান করতেন এবং এভাবে এক সমস্যার সৃষ্টি করতেন। প্রত্যেকবার খাজা নাজিমুদ্দীন ও তাঁর লোকজন পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করার জন্য মৌলানাকে অনুরোধ জানাতেন এবং মৌলানা তাতে সম্মত হতেন। আমি জানতাম এবারেও তাই হবে। আমি খবর পেলাম যে, মুসলিম ইনস্টিটিউটে সভার দিন খিদিরপুর ডক শ্রমিকদের সমবেত করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য হীন পন্থা অবলম্বন করা হবে। কলকাতা মুসলিম লীগের সম্পাদক ওসমানকে সভার দিন সূর্যোদয়ের আগেই মুসলিম লীগের স্বেচ্ছাসেবকদের পাঠিয়ে মুসলিম ইনস্টিটিউটে এবং তার নিকটবর্তী জায়গা দখল করে ফেলতে নির্দেশ দিলাম। ওসমান এ ব্যাপারে মুসলিম লীগ স্বেচ্ছাসেবকদের এবং ট্রাকের ব্যবস্থা করেছিলেন।

আমার অজ্ঞাতে এবং সম্মতি না নিয়ে খাজা নাজিমুদ্দীন, ফজলুর রহমান ও হামিদুল হকের সঙ্গে মিলিত হয়ে সুহরাওয়ার্দী মৌলানা সাহেবকে তাঁর পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। সুহরাওয়ার্দীর ইচ্ছে ছিলো না বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সভাপতি আমি হই। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হওয়া পর্যন্ত সুহরাওয়ার্দীর প্রয়োজন ছিলো আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখা, কিন্তু সে লক্ষ্য অর্জিত হওয়ার পর বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তাঁর গতিবিধির

উপর মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে আমার সতর্ক দৃষ্টি থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য তিনি বিদ্বেষমূলক পন্থা অবলম্বন করলেন। তাঁর পদে অধিষ্ঠিত তাঁর পূর্বসূরীদের মতো মুসলিম লীগকে তিনি নিজের ও তাঁর সরকারের অধীন রাখতে চাইলেন। সুহরাওয়ার্দী জানতেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক অথবা সভাপতি থাকি ততক্ষণ সেটা হওয়া সম্ভব নয়।

খাজা নাজিমুদ্দীন এবং ফজলুল হকের সম্মিলিত বাহিনীর সঙ্গে আমার সংগ্রামে সুহরাওয়ার্দী নিরপেক্ষ ছিলেন। সুহরাওয়ার্দী ফজলুল হককে খুব একটা পছন্দ করতেন না; সুতরাং তিনি মৌলানা আকরাম খাঁর পদত্যাগ প্রত্যাহার এবং স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে চাইলেন। মধ্যরাত্রে মুসলিম লীগ স্বেচ্ছাসেবকরা মুসলিম ইনস্টিটিউটের দিকে রওয়ানা হবার জন্য এবং ছাত্রাবাস ও নিকটবর্তী জায়গা দখল করার জন্য প্রস্তুত ছিলো। কিন্তু সূর্যোদয়ের পূর্বেই সুহরাওয়ার্দী ওসমানকে স্বেচ্ছাসেবকদের নিষ্কৃতি দানের জন্য টেলিফোন করলেন এবং বললেন সব কিছু নিষ্পত্তি হয়ে গেছে, বিপদের কোনো কারণ নেই। সুহরাওয়ার্দী যা নির্দেশ দিলেন ওসমান তাই করলেন। মুসলিম লীগের স্বেচ্ছাসেবকদের মুসলিম ইনস্টিটিউট এবং তার নিকটবর্তী অঞ্চল দখল করার পরিবর্তে খাজা-হক পার্টির দ্বারা সংগঠিত খিদিরপুর ডক শ্রমিকদের দ্বারা সে জায়গা দখল হয়ে গেলো।

যা হবার ছিলো তাই হলো। আমরা খিদিরপুর ডক শ্রমিকদের দ্বারা এবং ডক্টর জুবেরী ও শাহ আজিজুর রহমানের দ্বারা সংগঠিত ও প্ররোচিত কিছুসংখ্যক ছাত্রের দ্বারা বেষ্টিত হলাম। ডক্টর জুবেরী ইসলামিয়া কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি আশা করেছিলেন, তাঁকে শিক্ষামন্ত্রী করা হবে। কিন্তু সেটা সম্ভব ছিলো না। সুতরাং তিনি আমাদের হেয় করার সুযোগ খুঁজছিলেন। কাউন্সিল সভায় খাজা নাজিমুদ্দীন ফজলুল হককে প্রতারণা করে মৌলানা আকরাম খাঁকে তাঁর পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করার জন্য অনুরোধ জানালেন। ফজলুল হক ভীষণভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে পড়লেন এবং মৌলানার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করার জন্য জেদ ধরলেন। ভোট গ্রহণ করা হলো। মৌলানার পদত্যাগপত্র গ্রহণের উপর তাঁর প্রস্তাবের পক্ষে ফজলুল হক মাত্র এগারোটি ভোট পেলেন। মৌলানা তাঁর পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করে নিলেন।

এভাবে খাজা সাহেব সাফল্যের সঙ্গে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের প্রধান হওয়া থেকে আমাকে বাধা প্রদানে ফজলুল হককে কাজে লাগালেন। কাউন্সিলের হতাশাগ্রস্ত সদস্যরা, যাঁরা ১৯৩৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের মনোনয়ন চেয়েছিলেন, তাঁরা চট্টগ্রামের ফজলুল কাদের চৌধুরীর নেতৃত্বে আমার বিরুদ্ধে চিৎকার করে শ্লোগান দিতে শুরু করলেন। মুসলিম ইনস্টিটিউটের চতুর্পার্শ্বে গুণ্ডারা সমবেত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা আমার সমর্থকদের আঘাত হানতে শুরু করল এবং এভাবে কিছুক্ষণ চলার পর পরিস্থিতি তুলনামূলকভাবে শান্ত হয়ে পড়ল।

আমরা মুসলিম ইনস্টিটিউট থেকে বের হয়ে পদব্রজে মুসলিম লীগ অফিসে পৌঁছেছিলাম। খুনী, গুণ্ডা ও দুষ্কৃতকারীদের মধ্য দিয়ে আসার সময় পথে আমার সঙ্গী ছিলেন বরিশালের শামসের আলী ও বর্ধমানের জিল্লুর রহমান।

শামসের আলী আমার বাম পার্শ্বে জিল্লুর রহমান আমার ডান পার্শ্বে ছিলেন এবং একজন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সার্জেন্ট খুব মনোযোগের সঙ্গে আমাকে অনুসরণ করছিলেন। হঠাৎ এক যুবক আমার দিকে দৌড়ে এসে পিছন থেকে ছোরা দিয়ে আমাকে আঘাত করতে উদ্যত হলো। সার্জেন্ট তৎক্ষণাৎ তাঁর ছোট মোটা লাঠি দিয়ে যুবকটির পিঠে বাড়ি মারাতে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে গেলো। আমরা দৃঢ় পদে মুসলিম লীগ অফিসের দিকে অগ্রসর হলাম।

ভূস্বামীদের শোষণ থেকে প্রজাদের মুক্তি মুসলিম লীগের বামপন্থীদের একমাত্র আর্থ-সামাজিক প্রোগ্রাম ছিলো। গফরগাঁও সম্মেলনে আবুল মনসুর আহমেদ এই মর্মে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সুহরাওয়ার্দীর স্থাবর সম্পত্তিতে কোনো আগ্রহ ছিলো না। আমি সঠিকভাবে অনুমান করেছিলাম যে, জমির উপর খাজনা ও সুদ-আদায় স্বার্থের বিলোপ সাধনে সুহরাওয়ার্দী বাধা প্রদান করবেন না। এই কারণেই বঙ্গীয় মুসলিম লীগ সরকারের নেতৃত্বের জন্য সুহরাওয়ার্দীকে চিহ্নিত করা হয়েছিলো। আমার সুপারিশে ফজলুর রহমানকে রাজস্ব মন্ত্রী করা হয়েছিলো। বাংলার গভর্নর তখন ঢাকায় ছিলেন। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদের পর থেকে প্রতি বছর প্রদেশের গভর্নর একপক্ষের জন্য ঢাকায় স্থান পরিবর্তন করতেন। আমি ফজলুর রহমানকে কলকাতা থেকে ঢাকায় নিয়ে এলাম এবং ১৯৪৬ সালের ২১শে নভেম্বর ঢাকায় তিনি মন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করলেন।

১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে বঙ্গীয় আইনসভায় জমির উপর খাজনা ও সুদ আদায় স্বার্থ বিলোপ সাধনের জন্য রাজস্ব মন্ত্রী ফজলুর রহমান একটি বিল প্রবর্তন করলেন। বিলটি তখন নির্বাচনী কমিটি ( Select Committee )-তে বিবেচনার জন্য প্রেরণ করা হলো। জমিতে কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূ কংগ্রেস সর্বশক্তি নিয়োগ করে বিলটির বিরোধিতা করল, যেমনটি তারা ১৯৩৮ সালে বঙ্গীয় রায়তী স্বত্ব বিল আলোচনার সময় করেছিলো।

বঙ্গভঙ্গের পূর্বে বিলটিকে আইনে পরিণত করা সম্ভব হয়নি। বঙ্গভঙ্গের পর বিলটি দুই বাংলায় গৃহীত হয় এবং কিছু রদবদল করে কলকাতা ও ঢাকায় আইনে পরিণত করা হয়।

'মর্নিং নিউজ' ও 'আজাদ' খাজা নাজিমুদ্দীনকে সমর্থন করত। সুহরাওয়ার্দী স্থির করলেন তিনি নিজস্ব একটি দৈনিক পত্রিকা বের করবেন। তাঁর দৈনিক বাংলা পত্রিকা 'ইত্তেহাদ' ১৯৪৭ সালের ১৭ই মার্চ প্রকাশিত হলো এবং আবুল মনসুর আহমেদ সম্পাদক নিয়োজিত হলেন। নওবাবজাদা হাসান আলি পত্রিকাটির

ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিলেন ও তোফাজ্জল হোসেন ( মানিক মিয়া) সুপারিনটেনডেন্ট নিয়োজিত হলেন। এই তিন ব্যক্তি নিজেদের একটি চক্রে পরিণত করে তাঁদের নিজস্ব স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে সুহরাওয়ার্দী এবং আমার মধ্যে ফাটল সৃষ্টির জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। তাঁরা সুহরাওয়ার্দীকে বোঝাতে সক্ষম হলেন যে, তাঁর ক্ষয়িষ্ণু জনপ্রিয়তা আমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের জন্য দায়ী। 'ইত্তেহাদ' অপ্রত্যাশিতভাবে আমার প্রচার বন্ধ করে দিলো এবং বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সভাপতিপদের জন্য খাজা-হকের সম্মিলিত বাহিনীর সঙ্গে আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সুহরাওয়ার্দী এবং তাঁর পত্রিকা ইত্তেহাদ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করলেন। সুহরাওয়ার্দী আমার রাজনৈতিক চিন্তাধারা থেকে দূরে সরে দাঁড়ালেন এবং আবুল মনসুর আহমেদ, নওবাবজাদা হাসান আলী এবং মানিক মিয়াকে তাঁর ভালো-মন্দের রক্ষক হিসাবে গ্রহণ করলেন। সুহরাওয়ার্দীর এই মনোভাবের পরিণতিতে পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃত্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় খাজা নাজিমুদ্দীনের কাছে তাঁর পরাজয় ঘটেছিলো।

**বঙ্গভঙ্গ**

১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাসে শরৎচন্দ্র বোসকে অন্তর্বর্তী সরকার থেকে বাদ দেওয়ার পর আমি তাঁর কলকাতার বাসভবন ১নং উডবার্ণ পার্কে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। আমার সঙ্গে ছিলো মুন্সীগঞ্জের শামসুদ্দীন আহমেদ এবং আমার পুত্র বদরুদ্দীন মহাম্মদ উমর। তখন সে ছিলো স্কুলের ছাত্র। এই প্রথম সাক্ষাতে শরৎচন্দ্র বোস স্বীকার করেছিলেন যে ভারত একটি দেশ নয় ; একটি উপমহাদেশ এবং ভারতীয়রা এক জাতি নয় এবং ভারত যথার্থভাবে তখনই স্বাধীন হবে যখন ভারতের অঙ্গরাজ্যগুলি ও জাতিসমূহ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হবে।

শরৎ বোসের রাজনৈতিক চিন্তাধারার এই মৌলিক পরিবর্তন তাঁর ভারতীয়তাবাদের তিক্ত অভিজ্ঞতারই ফল এবং এর জন্য মূলত সরদার বল্লভভাই প্যাটেলই দায়ী ছিলেন। আমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছিলো। যে ব্যক্তি মনে করতেন যে, পাকিস্তান একটি অর্থহীন আজগবী ব্যাপার তিনি ভারত বিভক্তিতে এবং বাংলাকে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত করতে একমত হলেন। শরৎ বোসের সঙ্গে আমার আলাপের কিছুদিন পর সুভাষ ইনস্টিটিউটে সুভাষ চন্দ্র বোসের ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মী আজাদ হিন্দ ফৌজের বার্ষিক ভোজসভা ছিলো। শরৎ বোস সেই ভোজসভায় আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন। তিনি বললেন, "হাশিম সাহেব, আপনার প্রস্তাব আমি গ্রহণ করছি কিন্তু যখন আমরা বার্ষিক ভোজসভায় ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মীর নেতাদের সঙ্গে মিলিত হব তখন তাঁদের এ বিষয়ে আপনাকে রাজি করিয়ে নিতে হবে।"

আমি ভোজসভায় যোগদান করলাম এবং আই. এন. এ'র নেতৃবর্গের পূর্ণ

সমর্থন লাভে কৃতকার্য হলাম। ভোজের শুরুতে উপস্থিত ভদ্রলোকদের আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাঁরা কি চান আমি আহার করি অথবা আলাপ করি। তাঁরা বললেন, তাঁরা আমার কথা শুনতে চান। আমি বললাম, "তাহলে অনুগ্রহ করে আমাকে এক পেয়ালা গরম স্যুপ দিন, আমি ধীরে ধীরে পান করব এবং কথা বলে যাব।" পরিশেষে আমি বললাম, "ভদ্রমহোদয়গণ আমার বক্তব্যে যদি কোনো সত্যতা থাকে তাহলে নিশ্চিতরূপে পৃথিবী যেমন তার কেন্দ্রস্থলে সব কিছুকে আকর্ষণ করে, যতই একটি পরমাণুর ঊর্ধ্বগামী প্রবণতা থাকুক, আপনাদের উচিত আমার মতবাদকে সেইভাবে নিশ্চিতরূপে গ্রহণ করে নেওয়া।" সকলে একস্বরে বললেন, "আমরা গ্রহণ করলাম।"

শরৎ বোসের সঙ্গে তাঁর বাসভবনে আমার প্রথম সাক্ষাতের ঠিক পরেই মুন্সীগঞ্জের শামসুদ্দীন আহমেদ কম্যুনিস্ট পার্টির দৈনিক পত্রিকা 'স্বাধীনতা'-তে শরৎ বোসের সঙ্গে আমার যে আলোচনা হয়েছিলো তার খবর দিলেন। আমার সঙ্গে শরৎ বোসের আলোচনা 'স্বাধীনতা' বিস্তৃতভাবে বড় অক্ষরের শিরোনামে ছাপল। রিপোর্টে বলা হলো যে, আমি বৃহত্তর 'বাংলা' সৃষ্টির কথা চিন্তা করছি যেখানে মুসলমানরা হবে সংখ্যালঘু। এটা ছিলো সত্যের বিকৃতি। আমরা বৃহত্তর বাংলা সৃষ্টির বিষয় নিয়ে কখনও আলোচনা করিনি। বৃহত্তর বাংলা কথাটি, কম্যুনিস্ট পার্টি উদ্ভাবন করেছিলো। যাই হোক, 'স্বাধীনতার' এই রিপোর্ট আমার বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার কার্য চালাতে আমার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিলো। শেষ পর্যন্ত কম্যুনিস্ট পার্টি বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন এবং আসাম থেকে সিলেটকে বিচ্ছিন্ন করার বিরোধিতা করেছিলো। তাঁদের এই সিদ্ধান্ত বাংলা এবং আসামে তাঁদের জনপ্রিয়তা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন ছিলো। শামসুদ্দীন আহমেদ যে কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন একথা তিনি শরৎ বোসের সঙ্গে আমার আলোচ্য বিষয় কম্যুনিস্ট পার্টিকে জানিয়ে দেওয়ার পূর্বে আমার অজ্ঞাত ছিলো। পরবর্তী কালে একথা প্রকাশ পেল যে, কম্যুনিস্ট পার্টি তাঁদের কিছুসংখ্যক সদস্যকে মুসলিম লীগে উপদলীয় কাজের ( factional work ) জন্য নিয়োজিত করেছিলো।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাপারে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন করত। যখন তারা কোনো কিছু করতে চাইত তখন সেই বিষয়টি জননন্দিত কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে তুলে ধরে জনগণের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করত। প্রতিক্রিয়া যদি অনুকূল হতো তাহলে শান্তভাবে সে কাজ সমাধান করত। প্রতিক্রিয়া যদি অনুকূল না হতো তাহলে তারা ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করত যার ফলে তাদের পরিকল্পনা সহজেই গৃহীত হতো। বৃটিশরা এভাবেই ভারত বিভাগের পরিকল্পনা করেছিলো। ভারতকে যেভাবে বিভক্ত করা হয় সেটা প্রস্তাবিত হয়েছিলো রাজাগোপাল আচারীর মাধ্যমে।

রাজাজীর ভারত বিভাগ পরিকল্পনা কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ উভয়েই প্রত্যাখ্যান করেছিলো। রাজাজীর পরিকল্পিত পাকিস্তান জিন্নাহ খণ্ড বিখণ্ড পোকায়কাটা পাকিস্তান হিসাবে প্রত্যাখ্যান করেন। বৃটিশ কূটনিতিজ্ঞরা মনোযোগ সহকারে রাজাজীর পরিকল্পনার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করতে লাগল। প্রতিক্রিয়া অনুকূল না হওয়ায় তারা ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করল।

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সমন্বয়ে গঠিত কেন্দ্রীয় সরকারের অভিজ্ঞতার আলোকে কংগ্রেস এবং সরদার বল্লভভাই প্যাটেল স্পষ্ট বুঝতে পারলেন যে, অবিভক্ত ভারতে তাঁরা ইচ্ছে মতো কোনো কিছু করতে পারবেন না। ফলে কংগ্রেস ভারত বিভক্তিতে মানসিকভাবে দলকে প্রস্তুত রাখল। ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করল যার ফলশ্রুতিতে রাজা গোপাল আচারীর ভারত বিভক্তি পরিকল্পনা কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ সহজেই গ্রহণ করে নিল।

লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ভারত বাংলা এবং পাঞ্জাবকে বিভক্ত করার এক পরিকল্পনা তৈরী করলেন। বৃটিশ ভারতের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে বৈঠক শেষে এক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তৈরী করলেন যেটা ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ গ্রহণ করে নিল। মাউণ্টব্যাটেন রোয়েদাদে বঙ্গীয় আইনসভার সদস্যদের ভারত অথবা পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তির সম্মতির ব্যাপারে এবং তাঁরা প্রদেশকে বিভক্ত করতে চান কিনা সে বিষয়ে আলোচনার একটি ব্যবস্থা ছিলো। সেটা আসলে কিছুই নয় একটা আনুষ্ঠানিক ব্যাপার মাত্র যেটা সিদ্ধান্তের অনুমোদিত কার্যপ্রণালী থেকে বোঝা যাবে।

উভয় ব্যবস্থাপক সভায় তাঁরা ভারতে কিংবা পাকিস্তানে যোগ দেবেন সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এক যুক্ত অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলো। যেহেতু উভয় সভায় মুসলিম লীগ ছিলো সংখ্যাগরিষ্ঠ সেহেতু তাঁরা পাকিস্তানে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিলেন। এরপর পূর্ববঙ্গের জেলাসমূহের আইনসভার সদস্যরা পৃথকভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য মিলিত হলেন যে, তাঁরা যুক্ত বাংলা চান অথবা প্রদেশকে বিভক্ত করতে চান। আইনসভায় পূর্ববঙ্গের মুসলিম লীগ সদস্যবৃন্দ মুসলিম লীগের নির্দেশ মোতাবেক বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ভোট প্রদান করলেন এবং যেহেতু সেই সভায় মুসলমানরা ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ তাঁদের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে গেলো। তারপর পশ্চিমবঙ্গের আইনসভার সদস্যরা পৃথকভাবে মিলিত হলেন এবং তাঁদেরও একই বিষয় সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিতে হলো। এ বিষয়ে পুনরায় মুসলিম লীগের নির্দেশ অনুযায়ী বিধানসভার মুসলিম লীগ সদস্যরা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ভোট দিলেন। কিন্তু এই সভায় হিন্দুরা ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং তাঁরা বঙ্গভঙ্গের স্বপক্ষে ভোট প্রদান করলেন। পূর্ববঙ্গের সভায় সভাপতিত্ব করেন নূরুল আমিন এবং পশ্চিমবঙ্গ দলের সভায় সভাপতিত্ব করেন বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ উদয়চাঁদ মাহতাব। পাঞ্জাবেও একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছিলো।

সুতরাং একথা সুস্পষ্ট যে মুসলমানরা নয়, হিন্দুরা ধর্মকে ভিত্তি করে কংগ্রেসের নির্দেশ অনুযায়ী ভারত বাংলা এবং পাঞ্জাবকে দ্বিধাবিভক্ত করার জন্য দায়ী। একথা মনে রাখা দরকার যে, ১৯৪০ সালের বহু পূর্বে গান্ধী রাজনীতিতে ধর্মের প্রবর্তন এবং ভারতে তাঁর 'রামরাজ' তত্ব ঘোষণা করেছিলেন। ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন, ডঃ. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, সরদার প্যাটেল ও কংগ্রেসের উপর তাঁর প্রভাব বিস্তার করে পাঞ্জাব ও বাংলাকে বিভক্ত করার বৃটিশ সিদ্ধান্তকে কার্যে পরিণত করার জন্য তাঁর কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু করেন।

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ১৯৪৭ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী বাংলার গভর্নর স্যার ফ্রেডারিক বারোজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। গভর্নরের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে তিনি সুস্পষ্টভাবে ২৩শে ফেব্রুয়ারী সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে বঙ্গভঙ্গের দাবী জানিয়ে এক বিবৃতি প্রদান করলেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি আচার্য কৃপালিনী, হিন্দু মহাসভার সভাপতি ডঃ. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর দাবী সমর্থন করলেন। তাঁরা বঙ্গভঙ্গের আন্দোলন শুরু করলেন। লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ইতিপূর্বে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের কাছে বৃটিশ সরকারের ভারত বিভক্তি ও ত্যাগের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন। স্বভাবতই কংগ্রেস এক নূতন রাজনৈতিক ধারা অবলম্বন করল এবং তাদের ভারত বিভক্তির বিরোধিতা করার সিদ্ধান্তকে ধুলিস্মাৎ করে দিলো। রাজা গোপাল আচারীর মাধ্যমে প্রস্তাবিত ভারত বিভক্তির বৃটিশ পরিকল্পনা কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ প্রত্যাখ্যান করেছিলো কিন্তু কংগ্রেস বর্তমানে রাজা গোপাল আচারীর প্রস্তাবিত ভারত বিভক্তির ধারা গ্রহণ করল। ১৫ই এপ্রিল তারকেশ্বরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো এবং সম্মেলনে বাংলার হিন্দুদের পৃথক আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ডঃ. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে দায়িত্ব দেওয়া হলো।

বঙ্গভঙ্গের জন্য কংগ্রেস এবং হিন্দু মহাসভার মিলিত সংগ্রাম পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের চরম প্রভাবিত করে এবং কলকাতার দৈনিক পত্রিকাগুলি এই সংগ্রামকে সমর্থন করেছিলো। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন বাংলাকে বিভক্ত করেন এবং স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর নেতৃত্বে বাংলার হিন্দুরা বঙ্গভঙ্গ রদ করণের জন্য তীব্র আন্দোলন শুরু করেন। স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর আন্দোলন উপমহাদেশের সকল অঞ্চলে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল এবং সে আন্দোলন খুব শক্তিশালী হয়ে উঠল। হিন্দুরা উচ্চ প্রশংসা করে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীকে বলতেন, 'Mr Surrender -not'। আবদুর রসুল এবং আমার পিতা বর্ধমানের মৌলবী আবুল কাসেমের মতো স্থির মস্তিষ্ক সম্পন্ন ব্যক্তিরা স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীকে সমর্থন করেন এবং পূর্ববঙ্গ ও আসামের রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ মুসলমানরা ঢাকার নওবাব স্যার সেলিমুল্লাহর নেতৃত্বে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন করেন।

১৯১১ সালে বৃটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ রদ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল এবং

ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে সরিয়ে নিল। এই সিদ্ধান্ত দিল্লীতে অনুষ্ঠিত রাজদরবারে রাজা পঞ্চম জর্জ ঘোষণা করলেন। স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী কলকাতা টাউন হলে তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন, "আমরা এখানে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে সমবেত হয়েছি। এমনকি লর্ড মর্লে যিনি একদা ঘোষণা করে-ছিলেন যে বঙ্গভঙ্গ অবধারিত সত্য, তাঁকে আজ স্বীকার করতে হবে যে সেটি তাঁর একটি গুরুতর ভুল ছিলো।"

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর সংগঠিত রাজনৈতিক আন্দোলনের দ্বারা সূচিত হয়েছিলো। প্রখ্যাত ভারতীয় নেতা গোখেল বলেছিলেন, "বাংলা যে চিন্তা আজ করে ভারতবর্ষ সে চিন্তা করে তার পরের দিন।" ভারতীয় রাজনীতিতে তখন এমনই ছিলো বাংলার প্রতিপত্তি। স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর নেতৃত্বে বাংলা তার রাজনৈতিক প্রতিভার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিলো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড রিফর্ম এবং বঙ্গীয় সরকারের অধীনে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করলেন। এর ফলে বঙ্গীয় রাজনীতিতে স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর পতন ঘটল। স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর পতন এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পর ভারতের নেতৃত্ব কলকাতা থেকে দিল্লীতে চলে গেলো।

২৭শে এপ্রিল দেবেন দে-র নেতৃত্বে শরৎ বোসের দলভুক্ত এবং কংগ্রেসের কিছু সংখ্যক যুব নেতা জিপে করে বর্ধমানে এসে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তাঁরা তাড়াতাড়ি কলকাতা আসার জন্য আমাকে অনুরোধ জানালেন। তাঁরা বললেন, বাংলা বিভক্ত হতে চলেছে। আমি তাঁদের কথা বিশ্বাস করতে পারিনি। আমি তাঁদের জিজ্ঞেস করলাম, "কে বাংলা বিভক্ত করবে? ১৯০৫ থেকে ১৯১১ সালের মধ্যে হিন্দুরা বঙ্গভঙ্গ রদ করার জন্য চরম ত্যাগ স্বীকার করেছেন এবং আজকের মুসলিম লীগ বঙ্গভঙ্গের বিপক্ষে।" আমি তখন নির্বোধের মতো এইভাবে চিন্তা করেছিলাম।

আমি ভারতীয় এবং বৃটিশ কূটনীতির সাম্প্রতিক ঘটনাবলী বিবেচনার মধ্যে আনতে পারিনি। লর্ড মাউণ্টব্যাটেন অন্যায়ভাবে দ্রুতগতিতে তাঁর পরিকল্পনাকে এগিয়ে দিয়েছিলেন যার ফলে ভারতীয় নেতৃবর্গ সম্পূর্ণভাবে তাঁদের বুদ্ধিকে বিসর্জন দিয়ে অসহায়ভাবে লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের পাতা ফাঁদে জড়িয়ে পড়লেন। ২৮শে এপ্রিল আমি কলকাতা পৌঁছে প্রেসে বিবৃতি প্রদান করলাম যেটি ২৯শে এপ্রিল ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হয়েছিলো। আমার বিবৃতিটি ছিলো, "সত্য কথা বলার সময় এসেছে। সুবিধাবাদী নেতৃত্ব ও ঠুনকো জনপ্রিয়তার জন্য হীন চিন্তাধারার কাছে আত্মসমর্পণ বেশ্যাবৃত্তি মাত্র। ১৯০৫ সালেও বাংলা ভারতের চিন্তানায়ক ছিলো এবং সাফল্যের সঙ্গে তৎকালীন বৃটিশ সরকারের শক্তির মোকাবেলা করেছিলো। এটা খুবই পরিতাপের বিষয় যে আজকে বাংলা বুদ্ধিবৃত্তিতে দেউলিয়া

হয়ে পড়েছে এবং বিদেশী নেতাদের কাছে চিন্তা ও নির্দেশের জন্য অনুনয় ভিক্ষা করছে। আমি ভেবে আশ্চর্য হই, বাংলার হিন্দুদের কী হলো যাঁরা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আশুতোষ মুখার্জী, চিত্তরঞ্জন দাশ ও সুভাষ চন্দ্র বোস প্রমুখ ব্যক্তির জন্ম দিয়েছিলেন!

"ভারতের বর্তমান বৈপ্লবিক চিন্তাধারা তার সূত্রপাতের জন্য বাংলার কাছে ঋণী। প্রকৃত বিপ্লব ধ্বংসাত্মক ক্রিয়া কলাপের মধ্যে নয় বরং চিন্তা ও অনুভূতিতে বিপ্লব আনয়নের মধ্যেই নিহিত। পরাজয়ের মনোভাব সম্পন্ন নীতি ও হীনমন্যতাকে ঝেড়ে ফেলে বাংলার উচিত তার অতীতের ঐতিহ্যে ফিরে গিয়ে প্রতিভার শীর্ষে পুনরায় আরোহণ এবং নিয়তি গঠন করা। গুরুতর চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে ভাব-প্রবণতা ও আবেগের কোনো মূল্য নেই। ক্ষণিকের বাতুলতার দ্বারা আমাদের ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে দেওয়া উচিত নয়।

"বর্তমানে বাংলা রাস্তার এমন এক চৌমাথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে যার একদিকের পথে রয়েছে যশ ও মুক্তি, অন্যটিতে চিরকালের দাসত্ব এবং অশেষ অবমাননা। এই মুহূর্তে বাংলাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। মানবজীবনে বিশেষ এক সময় আসে যখন তার প্রকৃত সদ্ব্যবহারে সৌভাগ্য সূচিত হয়। সুযোগ একবার বিনষ্ট করলে পুনরায় তা ফিরে নাও আসতে পারে।

"শতকরা একশো ভাগ ভারতীয় এবং ইঙ্গ-মার্কিন বিদেশী পুঁজি বাংলাকে শোষণ করার জন্য পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগ করা হয়েছে। আমাদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সমাজতান্ত্রিক প্রবণতা বিদেশী শোষকদের চিত্তে দখলিচ্যুত হওয়ার ভীতি সৃষ্টি করেছে। তাদের এ বিচক্ষণতা আছে যার দ্বারা তারা স্বাধীন ও অবিভক্ত বাংলায় তাদের অসুবিধার কথা উপলব্ধি করতে পারছে। বিদেশী পুঁজির স্বার্থে বাংলাকে বিভক্ত, পঙ্গু এবং নিষ্প্রভ করার প্রয়োজন রয়েছে যাতে করে শোষণকে প্রতিহত করার কোনো ক্ষমতা বাংলার কোনো অংশেরই অবশিষ্ট না থাকে।

"সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার রূপরেখা থেকে আমার এই ধারণা জন্মেছে যে এর উৎসাহ ও উদ্দীপনা ইঙ্গ-মার্কিন কায়েমী স্বার্থবাদী এবং তাদের ভারতীয় মিত্রেরা জুগিয়েছিলো। স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় কোনো বিশ্বস্ত ও সম্মানিত ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স সংগ্রহ করতে বেশ বেগ পেতে হয়। কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে পরিত্যক্ত বৃটিশ ও মার্কিন বিপজ্জনক অস্ত্রশস্ত্র বঙ্গভঙ্গের সচেতন ও অসচেতন হিন্দু মুসলমান দাঙ্গাবাজদের মধ্যে ঢালাওভাবে বিতরণ করা হয়েছিলো। বাংলার এক হোমরা চোমরা ব্যক্তি যিনি বাংলার প্রধানমন্ত্রিত্বের জন্য ঘৃণ্য বাতিকগ্রস্ত হয়ে একদা আমার কাছে মন্তব্য করেছিলেন যে, যেহেতু তাঁর ভবিষ্যৎ অন্ধকার এবং সব কিছুই তাঁর জন্য অতীত তাই আশু যে কোনো সুযোগই তিনি পাবেন তা গ্রহণ করতে তিনি দ্বিধা করবেন না। এভাবে তিনি নিজের সুবিধা-বাদকে ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ করেছিলেন। বাংলার বাতিল হয়ে যাওয়া লোকেরা

( fossil ) বঙ্গভঙ্গে আপাতত লাভবান হতে পারেন কিন্তু বাংলার যুবকদের কী হলো যাঁদের সমগ্র নিয়তি ভবিষ্যৎ-নিহিত? তাঁরা কী অবস্থা বিশেষে মুষ্টিমেয় আত্মোন্নতিকামী সুবিধাজনক অবস্থায় সমাসীন ব্যক্তিদের সুবিধার্থে নিজেদের ভবিষ্যৎ বিলিয়ে দিতে চলেছেন?

"ভারত বিভক্তির সঙ্গে বঙ্গভঙ্গের কোনো সাদৃশ্য নেই। চিন্তার ক্ষেত্রে দুর্ভাগ্যজনক বিকৃতি যার থেকে মনে হতে পারে যে, বঙ্গভঙ্গের আন্দোলন পাকিস্তান সংগ্রামের একটা সুবিধাজনক প্রতিবাদ —এ চিন্তা লাহোর প্রস্তাবের বিষয় এবং গুরুত্ব সম্পর্কে বিরাট অজ্ঞানতা থেকে উদ্ভূত। এই বিষয় ও গুরুত্বের প্রতিই ভারতীয় মুসলমানরা অনুগত তার অন্য এটা সেটা ব্যাখ্যার প্রতি নয়। লাহোর প্রস্তাবে অখণ্ড মুসলিম রাষ্ট্রের কথা অথবা যেমনভাবে প্যালেস্টাইনে বলপূর্বক বিদেশী লোকদের আমদানা হচ্ছে অথবা তুর্কী এবং গ্রীসের মধ্যে ব্যাপক জনসংখ্যার স্থানান্তরিতকরণ হচ্ছে সেরকম কোনো কৃত্রিম মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার কথা চিন্তা করা হয়নি।

"এ প্রস্তাবে কেবলমাত্র পৃথিবীতে পরিচিত যে সকল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ রয়েছে সেগুলির পূর্ণ সার্বভৌমত্ব দাবী করা হয় এবং এর দ্বারা ভারতের প্রতিটি জাতি ও দেশের পূর্ণ সার্বভৌমত্ব ও স্বায়ত্তশাসনের দাবী অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এতে বাংলা এবং ভারতের অন্যান্য সাংস্কৃতিক এলাকাকেও দেওয়া হয় পূর্ণ সার্বভৌমত্ব।

"পাকিস্তান স্বতঃসিদ্ধরূপে ধরে নেয়নি যে বাংলা অথবা পাঞ্জাবে মুসলমানরা শাসক জাতি হবে এবং অন্যেরা পরাধীন জাতির পর্যায়ে পরিণত হবে। বম্বেতে জিন্নাহ-গান্ধী আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পর জিন্নাহ সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে, পাকিস্তান রাষ্ট্রগুলি সর্বজনীন বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সমগ্র জনগণের অভিপ্রায় এবং সম্মতির দ্বারা শাসিত ও পরিচালিত হবে। আমি বলতে চাই এটা হতে পারে যদি যুক্ত নির্বাচন প্রথায়, সংখ্যালঘুরা তাঁদের নিরাপত্তার জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর দাবী না জানান তাহলে।

"খুব উচ্চগুণসম্পন্ন নেতৃত্বের অভাবে দেশ হীন স্বার্থান্বেষীদের দ্বারা নিদারুণভাবে নির্যাতিত ও শোষিত হচ্ছে। বাংলার যুবক হিন্দু ও মুসলমানদের উচিত একতা বজায় রেখে নিজেদের দেশকে বৈদেশিক প্রভাবের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে বাংলার বিলুপ্ত মর্যাদা পুনরুদ্ধার এবং ভারতের ও পৃথিবীর ভবিষ্যৎ জাতিসমূহের ( future comity of Nations )-এর কাছে সম্মানের আসন লাভের প্রচেষ্টা করা। বাংলার যুবকদের উচিত তাদের অতীত ঐতিহ্য থেকে চরিত্র গঠন এবং আশু গৌরবের জন্য বর্তমান সংগ্রাম থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করা।

"বাংলার হিন্দু এবং মুসলমানরা তাঁদের যুগ্ম প্রচেষ্টায় নিজ নিজ অস্তিত্ব বজায় রেখে নিজেদের দেশের প্রকৃতি ও আবহাওয়ার সঙ্গে পূর্ণ সঙ্গতি রক্ষা করে এক

অপূর্ব সাধারণ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বিকাশ সাধন করেছিলেন যা মানব বিবর্তনে পৃথিবীর যে কোনো জাতির অবদানের সঙ্গে সহজেই তুলনীয়।

"স্বাধীন বাংলার মুসলমানরা তাঁদের শরিয়ত এবং হিন্দুরা তাঁদের শাস্ত্র অনুযায়ী আপন সমাজ পরিচালনা করা ছাড়া হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য বিশেষ কোনো সুযোগ সুবিধে সংরক্ষিত থাকবে না। এই অধিকার পাকিস্তানের জন্য মুসলমানদের আত্মিক প্রয়োজনীয়তা মেটাবে এবং হিন্দুদের দেবে নিজস্ব আদর্শের স্বাধীন বিকাশ সাধনের ও জীবনের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীতে বিষয় বাসনা চরিতার্থ করার জন্য এক প্রকৃত আবাসভূমি।

"স্বাধীন বাংলায় যেখানে হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় অর্ধেক তারা শাসন-ব্যবস্থায় এবং অন্যান্য পার্থিব সম্পদ উপভোগের ক্ষেত্রে তাঁদের বৈধ বখরা থেকে বঞ্চিত হবেন এটা অচিন্তনীয়। বাংলার হিন্দু-মুসলিম জনসংখ্যার মধ্যে একটা ভারসাম্য আছে। কোনো সম্প্রদায়ই একে অপরের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম নয়। বাংলাকে যদি তার দেশের সন্তানদের পরিচর্যার জন্য তার সকল সম্পদকে নিয়োজিত রাখতে দেওয়া হয় তাহলে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই অনাগত বহু শতাব্দী ধরে সুখী ও সমৃদ্ধ হবে।

"কিন্তু বিভক্ত বাংলায় পশ্চিম ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা পশ্চিমবঙ্গ একটি অবহেলিত প্রদেশ, সম্ভবত একটি কলোনীতে পরিগণিত হবে। বঙ্গভঙ্গের সঙ্গে তাঁরা যতই নিজেদের প্রত্যাশাকে গ্রথিত করুন, এটা আমার কাছে দিবালোকের মতো পরিষ্কার যে বাংলার হিন্দুরা বিদেশী পুঁজিবাদের দিনমজুরের পর্যায়ে পরিণত হবেন।

"বর্তমানের নোংরা দাসত্ব ও বন্ধনের পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যৎকে দেখলে একটা দুঃখজনক ভুল করা হবে। বাংলার দশ বছরের একদলীয় মুসলিম মন্ত্রিত্বে হিন্দুরা সন্দেহপ্রবণ হয়ে পড়েছেন। কিন্তু সত্যিভাবে বলার প্রয়োজন রয়েছে যে বঙ্গীয় অথবা নিখিল ভারত মুসলিম লীগ বাংলার হিন্দুদের প্রকৃত প্রতিনিধিদের নিয়ে যুক্ত সরকার গঠনে কখনও বাধা সৃষ্টি করেনি। আইনসভায় লীগ দল এরূপ যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে এসেছে কিন্তু কংগ্রেসের প্রধান নেতৃবর্গের হস্তক্ষেপের দরুন সে উদ্যম ব্যর্থ হয়েছে। সুহরাওয়ার্দী তাঁর মন্ত্রিপরিষদ গঠনের পূর্বে কংগ্রেসের সহাযোগিতা লাভের জন্য সততার সঙ্গে প্রচেষ্টা করেছিলেন।

"আমার পরিষ্কারভাবে মনে আছে যে গান্ধী তাঁর নোয়াখালী যাত্রার প্রাক্কালে আমাদের সঙ্গে ৪০নং থিয়েটার রোডে কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'যুক্তফ্রণ্ট সরকার গঠনের কোনো মোহ আমার নেই। আমি একদলীয় সরকারে বিশ্বাসী, সুতরাং বাংলায় যুক্তফ্রন্ট গঠন আমি সমর্থন করি না।' এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বাংলাই তখন একমাত্র জায়গা যেখানে মুসলিম মন্ত্রিত্ব বলবৎ ছিলো। এখানে

যুক্তফ্রন্ট গঠিত হলে ভারতের অন্যত্রও যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার বিষয় বিবেচনা করতে হতো। এভাবে হিন্দু বাংলাকে অসহায় অবস্থার মধ্যে রাখা হয়েছিলো যেমন মুসলিম লীগারদের রাখা হয়েছিল অন্য জায়গায়।

"বাংলার হিন্দু এবং মুসলমানদের তাদের নিজেদের মধ্যে ছেড়ে দিলে এবং ভারতীয়তাবাদের শাসানী থেকে মুক্ত রাখলে তাঁরা তাদের ভালো-মন্দ শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে সমাধা করতে পারেন। দুর্ভাগ্যবশত মুসলিম সংসদ সদস্যদের সময়ে মুখ্য স্বার্থ ছিলো তাসের অদলবদলের মতো মন্ত্রিত্বের রদবদল করা। তারা ভালো মন্দ অথবা নিরপেক্ষ কোনো প্রকার নীতি এবং কর্মসূচীতে মনোনিবেশ করতে সক্ষম হতেন না।

"আমি এমনই হতভাগ্য যে, কিছুতেই বুঝতে পারি না ১৯৩৫ সালের আইনের আওতায় যে মন্ত্রিত্ব তাতে কি রয়েছে। যেহেতু যুক্তিসঙ্গতভাবে অথবা অন্যথায় তার বিরুদ্ধে হিন্দুরা সন্দেহ পোষণ করেন অতএব মুসলমানদের উচিত কেবলমাত্র প্রেস বিবৃতি এবং বক্তৃতাকে অবলম্বন না করে কর্মের মাধ্যমে সে সন্দেহের অবসান ঘটানো এবং বোঝানো যে তাঁদের উদ্দেশ্য হিন্দুদের প্রতি অন্যায় করা নয়। বর্তমান অসন্তোষ, বিকৃত চিন্তাধারা ও আত্মঘাতী কৌশল সামাজিক ব্যাধির সৃষ্টি করছে। একটি স্বাধীন দেশের সব কটি গুণাবলীর অধিকারী হয়ে যুক্ত ও সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনের জন্য প্রগাঢ় স্বদেশপ্রেমই সমাধানের পথ, বঙ্গভঙ্গ নয়।

"সি. আর. দাশ আজ জীবিত নেই। গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গঠনের জন্য তাঁর আত্মা আমাদের সহায়তা করুক। বাংলার হিন্দু মুসলমানরা তাঁর রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধের আধা-আধি সূত্র মেনে নেওয়ার ব্যাপারে সম্মত হোন। আমি পুনরায় বাংলার যুবকদের তাঁদের অতীতের ঐতিহ্যের এবং গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যতের দোহাই দিয়ে মিলিতভাবে দৃঢ়সংকল্পে প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাভাবনাকে দূর করে আসন্ন দুর্যোগ থেকে বাংলাকে উদ্ধার করতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি।" ('অমৃত বাজার পত্রিকা'; ২৯শে এপ্রিল, ১৯৪৭)

যেহেতু মুসলিম লীগ পাঞ্জাব এবং বাংলা বিভক্তির বিরোধিতা করেছিলো, বাংলার প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম নেতৃবৃন্দেরা সরাসরি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বিপক্ষে বিরোধিতা করতে সক্ষম ছিলেন না। কিন্তু তাঁরা তাঁদের কতকগুলি সাক্ষী-গোপালের মাধ্যমে আমার উক্তির কঠোর সমালোচনা করে পরোক্ষভাবে আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁরা আমার এরূপ উক্তির কী বিধিসংগত ক্ষমতা রয়েছে সে বিষয়ে প্রশ্ন করেন এবং তাঁদের সমর্থিত সংবাদপত্রগুলি সার্বভৌম বাংলা আন্দোলনের বিষয়ে নিরপেক্ষতার দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করে। যদিও মৌলানা আকরাম খাঁ এবং খাজা নাজিমুদ্দীন সার্বভৌম বাংলার ব্যাপারে বিবৃতি দিয়েছিলেন। আমি আমার সমালোচকদের উত্তর প্রদানে প্রেসে আরেকটি বিবৃতি দিলাম। আমার সমালোচকদের আমি যে উত্তর দিয়েছিলাম সেটি ১৭ই মে

(১৯৪৭)-র মর্নিং নিউজ পত্রিকায় এইভাবে প্রকাশিত হয়েছিলো : মে মাসের প্রথম দিকে আবুল হাশিম তাঁর সমালোচকদের উত্তর প্রদান করেন। তিনি বলেন,

"আমার সমালোচকরা বাংলার হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে আলোচনার সম্ভাব্য ভিত্তি সম্পর্কে পরামর্শ দানের বিধিসংগত অধিকারের প্রশ্ন তুলেছেন। কোনো মহৎ কাজ করার জন্য কোনো বিধিসংগত অধিকারের প্রয়োজন হয় না। আমার বিবৃতিতে, বাংলার হিন্দু এবং মুসলমান উভয়কেই উদ্দেশ করে বলা হয়েছে এবং কারও পক্ষ অবলম্বন করে কিছু বলা হয়নি।

"আমার সীমাবদ্ধতা আমি জানি এবং বাংলার সকল লোকের পক্ষে তো নয়ই, এমনকি ৫৪ শতাংশ মুসলমানের পক্ষে কথা বলা অথবা তাঁদের সমস্যার সমাধান করে দেওয়ার মতো যথেষ্ট যোগ্যতা আমার আছে একথা মনে করি না। বর্তমান মুসলিম রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে একটি শিশুও জানে যে, জিন্নাহ একমাত্র ব্যক্তি যিনি সারা ভারতের মুসলমানদের পক্ষ থেকে সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম। আমি জানি যে সুহরাওয়ার্দী বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জিন্নাহকে ভালোভাবে ওয়াকিবহাল রেখেছেন।

"এদেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধের ক্ষেত্রে আধাআধি সুবিধাভোগ সম্পর্কে আমার প্রস্তাবের বিষয়ে যথেষ্ট বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা হচ্ছে। তাঁরা ইচ্ছাকৃতভাবে ভুলে যান যে, বর্তমানে আধাআধি সুবিধে ভোগের যে নিয়ম চালু রয়েছে সেটি ফজলুল হকের নেতৃত্বে প্রথম মুসলিম লীগ মন্ত্রিত্বের আমলে হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে এক চুক্তির মাধ্যমেই প্রবর্তিত হয়েছিলো।

"আবুল হাশিম আরও বলেন, আমার প্রস্তাবিত নির্ভেজাল যুক্ত নির্বাচকমণ্ডলী পদ্ধতিতে আইনসভার আসন অথবা মন্ত্রিত্বে ৫০ : ৫০ অথবা ৬০ : ৪০-এর কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আমর আধাআধি প্রস্তাব কেবলমাত্র রাজনৈতিক সুবিধে ভোগ এবং সরকারী কাজ কর্মে অংশীদারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, অন্য কোনো বিষয়ে নয়।

"আমার কিছু মুসলিম সমালোচক প্রস্তাব করেছেন যে, বাংলায় যেখানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেখানে বয়স্ক ভোটাধিকারে যুক্ত নির্বাচকমণ্ডলীর প্রথায় মুসলমানদের কোনো স্থান থাকবে না। উপরোক্ত প্রথায় যদি কেউ দুর্ভোগী হন তাঁরা হবেন পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানরা এবং পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের হিন্দুরা।

"বাংলার হিন্দু জনসংখ্যার বৃহৎ অংশ তফসিলী সম্প্রদায়ের মনে এক বৃথা ত্রাসের সঞ্চার করা হচ্ছে। যুক্ত নির্বাচকমণ্ডলীতে তাঁদের হারাবার কিছু নেই।

"মুসলিম লীগের পক্ষে আলোচনা কমিটির ভদ্রমহোদয়দের কাছে আমার আবেদন, তাঁরা হিন্দুদের সঙ্গে তাঁদের আলোচনা চালিয়ে যান এবং আমাদের সুনির্দিষ্টভাবে প্রস্তাব প্রদান করুন।

"আবুল হাশিম আরও বলেন, যুক্ত সার্বভৌম মিশর যেখানে মুসলমান, ইহুদী, খৃষ্টান, এবং অন্যান্যদের নিয়ে মিশ্র জনসংখ্যা রয়েছে তা যদি পাকিস্তান হতে পারে ; যদি যুক্ত সার্বভৌম ইরান পাকিস্তান হতে পারে, আমি বুঝতে পারি না যুক্ত এবং সার্বভৌম বাংলা, যেখানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ কেন পাকিস্তান বিরোধী হবেন ?

"আমার দেশের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য আমার দাবী ইসলামের প্রকৃত আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখে এবং লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী করা হয়েছে। আমাদের পয়গম্বর বলেছিলেন, ( তাঁর প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক ) 'দেশপ্রেম হোক ইমানের অঙ্গ'।"

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর বর্তমান প্রিন্সিপাল সেক্রেটারী রুহুল কুদ্দুস ২০শে মে ( ১৯৪৭ ) মর্নিং নিউজে প্রকাশিত এক পত্রে বলেন :

"সম্পাদক মহোদয়, ১২ই ও ১৩ই মে সংখ্যায় প্রকাশিত আপনার সম্পাদকীয় প্রবন্ধ আমাকে স্তম্ভিত করেছে। আমি কোনো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত নই, যদিও আমি পাকিস্তানে বিশ্বাসী। আমি জিজ্ঞেস করতে পারি কি যে মেসার্স এইচ. এস. সুহরাওয়ার্দী এবং আবুল হাশিমের প্রকৃত ত্রুটি কি ? তাঁদের মতামত পাকিস্তান বিরোধী হয় কিভাবে ? সুহরাওয়ার্দী সেরকম কোনো নির্দিষ্ট অঙ্গীকার করেননি ; সুতরাং তাঁকে বিবেচনা থেকে বাদ দেওয়া চলে। আবুল হাশিম অবশ্য আধাআধি শাসন ব্যবস্থার কথা বলেছেন। কিন্তু আজও এ নিয়ম কি চালু নেই ? বর্তমানে পঞ্চাশ শতাংশ আসনের মধ্যে কিছু আসন অবশ্যই তফসিলী সম্প্রদায়রা পাবেন, যাঁরা মুসলমানদের সঙ্গে তাঁদের একাত্মতা ঘোষণা করেছিলেন। ফলে বর্ণ হিন্দুরা স্পষ্টত হিন্দু সম্প্রদায়কে দেওয়া সুযোগ সুবিধে সম্পূর্ণটি পাবেন না।

"এরপর যুক্ত নির্বাচকমণ্ডলীর প্রশ্নটির কথা। আমার আশ্চর্য লাগে, যে প্রদেশে তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ রয়েছেন, মুসলমানরা সেখানে কেন পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর প্রয়োজন বোধ করেন। শাসক শ্রেণীর নিরাপত্তার জন্য প্রশ্ন করার কিছু নেই। হিন্দুরা তাঁদের নিজেদের স্বার্থে বাংলায় যুক্ত নির্বাচকমণ্ডলী চাইতে পারেন না এবং যতক্ষণ না তাঁদের পক্ষ থেকে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর দাবী আসে ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করা কি আমাদের জন্য ভালো নয় ?

"বাংলা সার্বভৌম হওয়াতে আপনি আপত্তিও করতে পারেন না। মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাব একথা বিবেচনা করেছিলো এবং আমাদের মনে হয় আবুল হাশিমের সূত্রের ওপর আপনার সিদ্ধান্ত ঘোষণা খুবই দ্রুত হয়েছে। আবুল হাশিম এটি চূড়ান্ত বলে ধরে নেননি। এতে সংশোধন এবং পরিবর্তন করার অবকাশ রয়েছে। আপনি এমন এক মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন যেটা মুসলমানদের ঐক্য যাতে আমরা বিশ্বাস করি এবং যা জিন্নাহ চান, সে ব্যাপারে কোনো সুখকর মন্তব্য নয়।"

এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে কলকাতায় সুহরাওয়ার্দীর ৪০নং থিয়েটার রোডের বাসভবনে মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের এক সভা আহ্বান করা হয়। সার্বভৌম বাংলার সংবিধানের মুখ্য বিষয়ের খসড়া তৈরীর জন্য সেই সভায় একটি যুক্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিতে মুসলিম লীগের প্রতিনিধিত্ব করেন এইচ. এস. সুহরাওয়ার্দী, খাজা নাজিমুদ্দীন, বগুড়ার মহাম্মদ আলী, ডাঃ এ.এম. মালেক, ঢাকার ফজলুর রহমান এবং আমি নিজে। হিন্দুদের প্রতিনিধিত্ব করেন শরৎচন্দ্র বোস, কিরণ শংকর রায়, নলিনী রঞ্জন সরকার এবং সত্য রঞ্জন বক্সী। কমিটির প্রথম সভায় খাজা নাজিমুদ্দীন যোগদান করেন এবং সভাশেষে তিনি বলেন, "আমি যে কোনো সংবিধান মেনে নেব যদি তাতে বিশুদ্ধ যুক্ত নির্বাচন অথবা পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকে।" ২৩শে এপ্রিল প্রকাশিত স্টেটসম্যান-এর সংবাদদাতার সঙ্গে আলোচনায় নাজিমুদ্দীন বলেন, "আমার সুচিন্তিত অভিমত এই যে স্বাধীন এবং সার্বভৌম বাংলা, তার জনসাধারণ মুসলমান অথবা অমুসলমান যেই হউক, তাঁদের স্বার্থের পক্ষে সব থেকে অনুকূল এবং আমি একইভাবে সুনিশ্চিত যে প্রদেশের বিভক্তি বাঙালীর স্বার্থে চরম আঘাত হানবে।" এভাবে কেন্দ্রীয় সংবিধান সভার ডেপুটি লিডার এবং লীগের উচ্চতম পর্যায়ের নেতা খাজা নাজিমুদ্দীন ঐ ঘোষণা করেন। তিনি বলেন "আমি সব সময়েই মনে করেছি যে, এই প্রদেশের ও তার অধিবাসীদের উন্নয়ন এবং বিকাশ সাধনের অপরিসীম সম্ভাবনা রয়েছে যদি তাঁরা তাঁদের সমস্যা নিজেরা সমাধান করার তেমন সুযোগ পান। বাংলা কেন্দ্রের কাছ থেকে সব সময়েই বিমাতৃসুলভ আচরণ পেয়ে এসেছে। যখনই আমি আমার হিন্দু বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করেছি, তাঁদের একমাত্র দাবী, বাংলার উচিত তার নিজের সমস্যা নিজে সমাধান করা। এ দাবীর যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় বাংলাকে সার্বভৌম রাষ্ট্রের স্বীকৃতি। তখন এবং কেবল তখনই বাঙালীরা তাঁদের সমস্যার সমাধান করতে পারেন।"

১৯শে এপ্রিল এক প্রেস বিবৃতিতে মৌলানা আকরাম খাঁ বলেন, "মুসলিম বাংলা অবশ্যই বঙ্গভঙ্গের বিরোধী। বঙ্গভঙ্গ হতে পারে কেবলমাত্র বাংলার মুসলমানদের মৃতদেহের উপর। লাহোর প্রস্তাবে যে খসড়ার পরিকল্পনা রয়েছে তার সঙ্গে সামঞ্জস্যবিহীন কোনা প্রস্তাবই আমি সমর্থন করব না।"

১৯৪৭ সালের ৭ই মে গান্ধী কলকাতার উদ্দেশে পাটনা ত্যাগ করলেন এবং ৯ই মে কলকাতা পৌছলেন। গান্ধী যেদিন সোদপুর আশ্রমে পৌছলেন ঐদিন শরৎচন্দ্র বোস তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং ১০ই মে শরৎ বোস আমাকে সঙ্গে নিয়ে গান্ধীর কাছে গেলেন। গান্ধীর সঙ্গে আমার আলাপের রিপোর্ট পেয়ারেলালের বই 'মহাত্মা গান্ধী : শেষ অধ্যায়'-এর দ্বিতীয় খণ্ডে দেওয়া হয়েছে।

পেয়ারেলাল লিখেছেন :

"গান্ধীজী যেদিন সোদপুর আশ্রমে এসে পৌছলেন সেদিন শরৎচন্দ্র বসু তাঁর

সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। পরের দিন তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্পাদক আবুল হাশিমকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন। দ্বিতীয়জন, গান্ধীজীকে বিস্মিত করে 'সাধারণ ভাষা, সাধারণ সংস্কৃতি এবং সাধারণ ইতিহাস যা হিন্দু মুসলমান উভয়কে ঐক্য সূত্রে আবদ্ধ করেছিলো' তার উপর ভিত্তি করে যুক্ত বাংলার জন্য তাঁর বক্তব্যের অবতারণা করলেন। হিন্দু অথবা মুসলমান যেই হোক, একজন বাঙালী হলো বাঙালীই। উভয়েই হাজার মাইল দূর থেকে পাকিস্তানীদের দ্বারা শাসিত হতে একইভাবে ঘৃণা বোধ করে। পাকিস্তানের একজন অনুগত সমর্থক হিসাবে যিনি ভারতের ঐক্যের বিরোধী ছিলেন তাঁর পক্ষে বিলম্বে এরূপ স্বীকৃতি গান্ধীজীর চিত্তে কোনো সহজ আশাবাদের সৃষ্টি করতে পারেনি। সাবধানতা অবলম্বনপূর্বক তিনি লীগ সেক্রেটারীকে জিজ্ঞেস করলেন, তাঁরা অতীতে সাত হাজার মাইলের ওপার থেকে বৃটিশ কর্তৃক শাসিত হননি কী? এবং যখন লীগ সেক্রেটারী পশ্চিমাঞ্চল থেকে পাকিস্তানীদের দ্বারা বাঙালীদের শাসিত হওয়ার বিষয়ে তাঁর আপত্তির পুনরুক্তি করলেন তখন তিনি (গান্ধীজী) অভিযোগের পুনরুক্তি করে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, অন্তর্ভুক্তির পরিবর্তে (instead of incorporation) ইসলামী সংস্কৃতি ও ধর্ম প্রচারণার জন্য পাকিস্তান যদি স্বেচ্ছায় একটি ফেডারেশনে যোগদানের জন্য তাঁদেরকে আমন্ত্রণ জানায় তাহলে পাকিস্তানে যোগদানে তাঁদের আপত্তি থাকবে কিনা? এ ব্যাপারে আবুল হাশিম উত্তর প্রদানে বিরত রইলেন।

"গান্ধীজী তাঁর যুক্তিতে আবার ফিরে গেলেন। যেহেতু বাংলার সাধারণ সংস্কৃতি যার কথা লীগ সেক্রেটারী উল্লেখ করেছেন, যা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছিলো এবং যার মূল প্রথিত ছিলো উপনিষদের মধ্যে তা কেবল-মাত্র বাংলারই নয় সমগ্র ভারতের সম্পদ ছিলো। সেই হিসাবে সার্বভৌম বাংলা ভারতের অবশিষ্টাংশের সঙ্গে স্বেচ্ছায় যোগ দেওয়ার কথা চিন্তা করতে পারবে কি? লীগ সেক্রেটারী পুনরায় জবাব দানে বিরত রইলেন। যাই হোক, এর কিছুটা জবাব ১৫ই মে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী প্রদান করেছিলেন। যুক্ত বাংলা ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নে যোগদান করতে রাজি হবে কিনা এ প্রশ্নের জবাবে দিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, বাংলা এবং ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নের স্বার্থ সম্পর্কিত প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কিছু আপোস নিষ্পত্তি অথবা বন্দোবস্ত করা যেতে পারবে, একে সন্ধি অথবা অন্য যে কোনো নামে আখ্যায়িত করতে পারেন।"

পেয়ারেলাল লিখেছেন:

"পরের দিন ১১ই মে শহীদ সুহরাওয়ার্দী বাংলার মন্ত্রিপরিষদের অর্থমন্ত্রী (পরবর্তীকালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী) মহাম্মদ আলী ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক লীগের সম্পাদক আবুল হাশিমকে সঙ্গে করে সার্বভৌম বাংলার প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা করতে গান্ধীজীর কাছে এলেন। গান্ধীজী শহীদকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে, হৃদয়ের সম্পূর্ণ এবং আসল পরিবর্তন দরকার। তিনি যদি আশা করেন যে হিন্দুরা

তাঁর প্রকাশ্য ঘোষণা গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করবে তাহলে সেটা তাঁর ব্যবহারে এবং প্রশাসনের মধ্যে প্রতিফলিত হতে হবে। কিন্তু বাংলার মুখ্যমন্ত্রী দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন যে, কলকাতায় শান্তি বজায় রয়েছে এবং কেউই বাংলা সরকারকে কোনো অবিচারের জন্য দোষারোপ করতে পারেন না। গান্ধীজী যখন তাঁকে বললেন, প্রশাসনের প্রধান হিসাবে বাংলায় প্রতিটি মৃত্যু সংঘটিত হওয়ার জন্য নৈতিকভাবে তিনি দায়ী ছিলেন, তখন তিনি ( সুহরাওয়ার্দী ) ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন এবং প্রত্যুত্তরে গান্ধীজীকে দোষারোপ করে বললেন, তিনিই সমস্ত গণ্ডগোলের স্রষ্টা। 'কি অদ্ভুত লোক', পরে গান্ধীজী মন্তব্য করলেন। কে কি বলেন না-বলেন তাতে তাঁর কিছু এসে যায় না, তিনি চান, যে নূতন বাংলা তিনি গড়তে চাইছেন তাতে সকল সম্প্রদায়ের প্রতি সমান আচরণ কবার নিশ্চয়তা প্রদান করা হবে। কিন্তু ভবিষ্যৎ হচ্ছে বর্তমানের সন্তান। কলকাতায় আজ যা ঘটছে সেটা যদি ভবিষ্যতের কোনো ইঙ্গিত বহন করে তাহলে তাঁর পরিকল্পনার ভবিষ্যৎ শুভ হতে পারবে না।"

সুহরাওয়ার্দী কামরা ত্যাগ করার পর মিস্টার গান্ধী আমাকে বললেন, "হাশিম, অসুবিধে হচ্ছে এই যে সুহরাওয়ার্দীকে কেউ বিশ্বাস করতে চায় না।"

গান্ধী বিহার থেকে কলকাতায় আসার পথে ৮ই মে লর্ড মাউণ্টব্যাটেনকে একটি পত্র লেখেন। পত্রটি পথেই কোনো এক স্টেশনের ডাকবাক্সে ফেলা হয়েছিলো।

মিস্টার গান্ধী লিখেছিলেন :

"আমার মনে হচ্ছে গত রবিবারে আমাদের সাক্ষাতের সময় আমি যা বলেছি ও বলতে চেয়েছি এবং সময়ের অভাবে যা বলা হয়ে ওঠেনি সেটার সারমর্ম সংক্ষেপে বলা দরকার।

১॥ এ কথার বিপক্ষে যাই বলা হোক, ভারতকে বিভক্ত করার ব্যাপারে যে কোনোভাবে অংশ গ্রহণ করলে বৃটিশরা মারাত্মক ভুল করে বসবে। ভারত বিভক্তি যদি প্রয়োজন হয় সেটা হতে হবে বৃটিশরা চলে যাওয়ার পর রাজনৈতিক দলের মধ্যে বোঝাপড়ার ফলে অথবা সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে যেটা কায়েদে আজম মহাম্মদ আলী জিন্নাহ মনে করেন নীতিগতভাবে নিষিদ্ধ। প্রতিযোগী দলগুলির মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিলে একটি সালিসি আদালত ( court of arbitration ) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষার নিশ্চয়তা বিধান করা যেতে পারবে।

২॥ ইতিমধ্যে কংগ্রেসের লোকদের নিয়ে নতুবা কংগ্রেস যাঁদের চান তাঁদেরকে নিয়ে অথবা মুসলিম লীগের লোকদের নিয়ে অথবা তাঁরা যাঁদের চান তাঁদেরকে নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা উচিত। আজকের দ্বৈত-শাসনে সহযোগিতা ও সহমর্মিতার অভাব দেশের জন্য ক্ষতিকর। বিভিন্ন দল তাদের আসন সংরক্ষণে এবং আপনাদেরকে শান্ত রাখার প্রচেষ্টায় নিজেদের ব্যস্ত রাখেন।

সহমর্মিতার অভাব সরকারকে দুর্বল করে ( demoralise ) এবং বিপন্ন করে সরকারী কর্মচারীদের সংহতি যা ভালোভাবে দক্ষতার সঙ্গে শাসন পরিচালনার জন্য খুব বেশি দরকার।

৩॥ বর্তমান পরিস্থিতিতে সীমান্ত প্রদেশে ( অথবা অন্য কোনো প্রদেশে ) গণভোট গ্রহণ এমনিতেই বিপজ্জনক। যেসব বস্তু আপনার সামনে রয়েছে আপনাকে তারই মোকাবিলা করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ডাঃ খান সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ ব্যতিরেকে কোনো প্রকারে কোনো কিছু করা যেতে পারে না এবং করা উচিত হবে না। মনে রাখতে হবে যে, এই অনুচ্ছেদ প্রাসঙ্গিক হবে যদি আমাদের দেশভাগের মুখোমুখী হতে হয় কেবলমাত্র সেই ক্ষেত্রেই।

৪॥ আমি মনে করি, পাঞ্জাব এবং বাংলাকে বিভক্ত করা প্রত্যেক ক্ষেত্রে অন্যায় এবং লীগের জন্য অনাবশ্যকভাবে বিরক্তিজনক। পারস্পরিক চুক্তি ব্যতিরেকে এই বা যে কোনো নূতন ব্যবস্থার প্রবর্তন বৃটিশরা বিদায় নেওয়ার পর হতে পারে, তার আগে নয়। বৃটিশরা যতক্ষণ ভারতের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রয়েছেন ততক্ষণ পর্যন্ত দেশে শান্তি রক্ষার জন্য মূলত তাঁরাই দায়ী থাকবেন। যা পূর্ণ হতে পারে না এবং হওয়া উচিত নয় সেই ধরনের নানা প্রকার আশ্বাসের কথা উত্থাপনের কারণবশত বিরাজমান চাপের দরুন সেই শাসনযন্ত্র ভেঙে পড়ছে। অবশিষ্ট তেরো মাসের মধ্যে এর পরিবর্তনের সম্ভাবনা :নেই। এই সময়টা সুবিধাজনকভাবে কমিয়ে নেওয়া যায় যদি সকলের মন একমাত্র বৃটিশকে বিদায় দেওয়ার ব্যাপারে নিযুক্ত থাকে। অন্য সব কিছু বাদ দিয়ে কেবল আপনিই বৃটিশ দখলদারীর ব্যাপারে সে কাজ করতে পারেন।

৫॥ নৌযুদ্ধের অবিসংবাদী পরিচালক হিসাবে ·আপনার যে মহান্ দায়িত্ব ছিলো সেটা আজকের যে দায়িত্ব আপনার ওপর ন্যস্ত রয়েছে সে তুলনায় একেবারে নগণ্য। চিত্তের যে একাগ্রতা এবং পরিচ্ছন্নতা আপনার সাফল্য এনেছিলো সেটা এই দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অধিকতর প্রয়োজনীয়।

৬॥ আপনি পিছনে যদি কোনো বিশৃঙ্খল অবস্থা রেখে যেতে না চান তাহলে আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং দেশীয় রাজ্যগুলি সহ সারা ভারতের শাসন ব্যবস্থা একটি দলের উপর ছেড়ে দিতে হবে। ভারতের যে সকল অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব মুসলিম লীগ অথবা দেশীয় রাজ্যগুলি করে না সেগুলোরও শাসন পরিচালনার ক্ষমতা প্রদান করতে হবে।

৭॥ পাঞ্জাব এবং বাংলাকে অবিভক্ত রাখার অর্থ এই নয় যে প্রদেশ দুটির সংখ্যালঘুদের অবহেলা করা হবে। এই দুই প্রদেশে তারা মনোযোগ আকর্ষণ ও দাবীর ব্যাপারে যথেষ্ট শক্তিশালী এবং সংখ্যায় অধিক। যদি জনপ্রিয় সরকার দুটি তাদেরকে শান্ত করতে ব্যর্থ হয় তাহলে মধ্যবর্তী সময়ে গভর্নরদের উচিত সক্রিয়ভাবে হস্তক্ষেপ করা।

৮॥ সর্বোচ্চ ক্ষমতা হস্তান্তর না করার অর্থ যদি এই হয় যে, তারা সার্বভৌম হতে পারে তাহলে তা একটা বিষাক্ত তত্ব এবং স্বাধীন ভারতের জন্য বিপজ্জনক। ভারতের যেখানেই বৃটিশরা যেসব ক্ষমতা ব্যবহার করেছিলো স্বভাবতই তার উত্তরাধিকারীদের উপর সেগুলো বর্তাবে। সুতরাং বৃটিশ ভারতের জনসাধারণের মতো বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যের জনগণও স্বাধীন ভারতের অংশবিশেষ রূপেই পরিগণিত হবে। বর্তমান প্রিন্সরা হচ্ছেন ক্রীড়নক মাত্র যাঁদেরকে বৃটিশ শক্তি রক্ষা ও তার মর্যাদার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিলো এবং সহ্য করা হতো। জনগণের উপর তাদের বলগাহীন ক্ষমতার প্রয়োগ সম্ভবত বৃটিশ শাসনের নিকৃষ্টতম কলঙ্ক। নূতন শাসন ব্যবস্থায় তত্বাবধায়করা যে ক্ষমতা লাভ করে থাকেন সেইমতো ক্ষমতা প্রিন্সরা ব্যবহার করতে পারেন এবং সংবিধানসভা যেরূপ ক্ষমতা প্রদান করবেন সেইমতো ক্ষমতার অধিকারী তাঁরা হতে পারেন। এতে এই বোঝায় যে, তাঁরা ব্যক্তিগত বাহিনী রাখতে অথবা অস্ত্র কারখানা চালাতে পারবেন না। যে যোগ্যতা ও রাজ্য পরিচালনার দক্ষতা তাঁদের আছে তা প্রজাতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণে থাকতে হবে এবং সর্বসাধারণের মঙ্গলার্থে তা ব্যবহার করতে হবে। বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যগুলি নিয়ে কি করতে হবে আমি শুধু সেটাই উল্লেখ করেছি। কিভাবে তা করা যেতে পারে এ পত্রে সেটা দেখানো আমার কাজ নয়।

৯॥ একই রূপে বেসামরিক চাকুরীর প্রশ্নটি অসুবিধেজনক কিন্তু তেমন বিভ্রান্তিমূলক নয়। এর সদস্যদের এখন থেকে নূতন শাসন ব্যবস্থায় নিজেদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার শিক্ষা দিতে হবে। তাঁদের পক্ষভুক্ত হয়ে একতরফা নীতি অবলম্বন করা উচিত হবে না। তাঁদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার লেশমাত্র চিহ্ন দেখা দিলে তা কঠোর হস্তে দমন করতে হবে। এর মধ্যে যাঁরা ইংরেজ রয়েছেন তাঁদের জানা দরকার যে তাঁদের পুরাতন শাসকদের তথা গ্রেট বৃটেনের পরিবর্তে নূতন শাসন ব্যবস্থার প্রতি অনুগত থাকতে হবে। নিজেদের শাসক এবং শ্রেষ্ঠ মনে করার অভ্যেস পরিত্যাগ করে জনগণের প্রকৃত সেবায় নিজেদের নিয়োজিত রাখতে হবে।" ('মহাত্মা গান্ধী : শেষ অধ্যায়'; পৃঃ. ১৭১-৭২)

শরৎচন্দ্র বসুর বাসভবন ১নং উডবার্ণ পার্কে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের যুক্ত কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হতো। শরৎ বসুর রোজনামচা থেকে মনে হয় দিনের বেলা তিনি প্রায়ই তাঁর হিন্দু বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন। কমিটির কাজ শেষ হলো ১৯৪৭ সালের ১৯শে মে। ২০শে মে শরৎ বসু তাঁর বাসভবনে এক সম্মেলন আহ্বান করলেন এবং সম্মেলনের সদস্যদের রাত্রিতে এক প্রীতিভোজে আপ্যায়িত করেন। এই সম্মেলনে সার্বভৌম বাংলার অন্তর্বর্তী সরকারের জন্য তৈরী খসড়া সংবিধান প্রীতিভোজের পর স্বাক্ষরিত হলো। ২৩শে মে দেবেন দে-র মাধ্যমে শরৎ বসু গান্ধীকে একটি চিঠি পাঠালেন।

শরৎ বসু লিখলেন :

"প্রিয় মহাত্মাজী,

আপনার কলকাতা থেকে চলে যাবার পর আমি অনেকগুলো বৈঠক আহ্বান করি যেগুলিতে মুসলিম লীগের কতিপয় নেতা এবং কিরণ ও সত্য বাবু যোগদান করেছিলেন এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় (২০শে মে) আমার বাসভবনে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত সম্মেলনে সুহরাওয়ার্দী, ফজলুর রহমান (মন্ত্রী), মহম্মদ আলী (মন্ত্রী), আবুল হাশিম (বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্পাদক, বর্তমানে ছুটিতে রয়েছেন), আবদুল মালেক (বঙ্গীয় আইনসভায় শ্রমিকদেব প্রতিনিধি সদস্য), কিরণ ও সত্য বাবু যোগদান কবেন। আমরা পরিক্ষামূলকভাবে এক চুক্তিতে উপনীত হয়েছি এবং আপনার বিবেচনাব জন্য তার একটি কপি সংযোজিত করা হলো। সনাক্তকবণের জন্য সেটি অন্যান্য সকলের উপস্থিতিতে আবুল হাশিম ও আমার দ্বাবা স্বাক্ষবিত হয়েছে। এটা অবশ্যই কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সংগঠনের সামনে উপস্থিত করতে হবে। আমাদেব যে আলোচনা হয়েছিলো তার ধারা থেকে আমাব মনে হয় যে বাংলার কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের কথা যদি ধরা যায় তাহলে সাময়িক চুক্তিটি এখানে সেখানে কিছু রদবদল করে তাঁদের দ্বারা অনুমোদিত হবে। সাময়িক চুক্তিটিকে চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার জন্য আপনার নির্দেশ, সাহায্য ও উপদেশ এবং প্রতিক্রিয়ার বিষয় জানার জন্য আমি খুবই উদ্বিগ্ন রয়েছি। সোদপুরে আপনাকে যা বলেছি তার পুনরুক্তির প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি না। আমার আরও মনে হয়, আপনার সাহায্য উপদেশ ও নির্দেশ অনুসারে সাময়িক চুক্তিটির লাইন অনুযায়ী দুটি সংগঠন যদি একটি চূড়ান্ত চুক্তিতে উপনীত হতে পারে তাহলে আমরা বাংলার এবং সেই সঙ্গে আসামেরও সমস্যার সমাধান করতে পারব। ভাবতের অপরাপর অঞ্চলের উপবও এর সুস্থ প্রতিক্রিয়া হতে পারে। আপনি যদি চান দিল্লীতে গিয়ে এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে আরও আলাপ আলোচনা করি তাহলে আমার বলা নিষ্প্রয়োজন যে আপনার বার্তা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি গিয়ে উপস্থিত হব। পরিস্থিতি খুব দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে কাজেই আমার মনে হয় আপনার সঙ্গে এ বিষয়ে আরও আলাপ আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।

আমার বিশ্বাস, বিহার সফরের ফলে শারীরিকভাবে আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। আমি আগের থেকে মোটামুটি ভালোই রয়েছি।

আজ এই পর্যন্তই। প্রণামসহ।

মহাত্মা গান্ধী।

আপনার স্নেহের,
শরৎচন্দ্র বসু (স্বাক্ষরিত)"

শরৎচন্দ্র বসু এবং আমার দ্বারা স্বাক্ষরিত সাময়িক চুক্তিটির মূল বিষয় নিম্নরূপ :

"১ ॥ বাংলা হবে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলা ভারতের অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে তার সম্পর্ক নির্ধারণ করবে ;

২ ॥ স্বাধীন বাংলার সংবিধানে হিন্দু ও মুসলমানদের জনসংখ্যার অনুপাতে আসন সংরক্ষণ সহ যুক্ত নির্বাচক মণ্ডলী এবং বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে বঙ্গীয় আইনসভায় নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকবে। হিন্দু এবং তফসিলী সম্প্রদায়ের আসন তাদের নিজস্ব জনসংখ্যার হার অনুপাতে অথবা নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়ার মাধ্যমে বণ্টন করা হবে। নির্বাচনী এলাকাগুলি হবে একই সঙ্গে একাধিক আসনের ( multiple constituencies ) কিন্তু প্রত্যেকের ভোট হবে একটি করে (distributive), একাধিক নয় (not cumulative)। একজন প্রার্থী যিনি নির্বাচনে তাঁর সম্প্রদায়ের প্রদত্ত অধিকাংশ ভোট এবং অন্য সম্প্রদায়ের পঁচিশ শতাংশ ভোট পাবেন তাঁকে নির্বাচিত ঘোষণা করা হবে। যদি কোনো প্রার্থী এসব শর্ত পূরণ করতে না পারেন, তাহলে সেই প্রার্থীই নির্বাচিত হবেন যিনি তাঁর সম্প্রদায়ের সর্বাধিক ভোট লাভ করবেন।

৩ ॥ মাননীয় সম্রাটের সরকার স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন এবং বাংলাকে বিভক্ত করা হবে না এই মর্মে ঘোষণা প্রদান করলে বর্তমান বাংলার মন্ত্রি-পরিষদ ভেঙে দেওয়া হবে এবং মুখ্যমন্ত্রীকে বাদ দিয়ে সমান সংখ্যক মুসলমান ও হিন্দু সদস্যদের ( তফসিলী সম্প্রদায়ের হিন্দু সহ ) নিয়ে একটি অন্তর্বর্তী মন্ত্রিপরিষদ গঠন করা হবে। এই মন্ত্রিপরিষদে মুখ্যমন্ত্রী হবেন একজন মুসলমান এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হবেন একজন হিন্দু।

৪ ॥ নূতন সংবিধানের অধীনে আইন ও মন্ত্রিপরিষদ চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত হিন্দু ( তফসিলী সম্প্রদায়ের হিন্দু সহ ) এবং মুসলমানদের সামরিক এবং পুলিশ সহ সকল চাকুরী ক্ষেত্রে সমান অধিকার থাকবে। এই সকল চাকুরীতে নিযুক্ত ব্যক্তিরা হবেন বাঙালী।

৫ ॥ ইউরোপীয়ানদের বাদ দিয়ে আইনসভার মুসলমান এবং অমুসলমান সদস্যরা ষোলো জন মুসলমান এবং চোদ্দজন হিন্দু নিয়ে তিরিশ জনের গঠিত সংবিধানসভা নির্বাচন করবেন।

১নং উডবার্ণ পার্ক, শরৎচন্দ্র বসু ( স্বাক্ষরিত )

কলকাতা, আবুল হাশিম ( স্বাক্ষরিত )

২০শে মে, ১৯৪৭ সাল।"

২৩শে মে শরৎ বসু-লিখিত পত্রের জবাবে গান্ধী পাটনা থেকে ২৪শে মে লিখলেন :

"প্রিয় শরৎ,

তোমার পত্র পেয়েছি। খসড়াটিতে এমন কিছু নেই যার থেকে মনে করা

যেতে পারে যে নিছক সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে কিছু করা যাবে না। প্রত্যেক আইনের জন্য কার্যনির্বাহীদের এবং আইনসভার হিন্দু সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশের সমর্থন থাকতে হবে। খসড়া চুক্তিটিতে স্বীকৃতি থাকতে হবে যে, বাংলার একটি সাধারণ সংস্কৃতি আছে এবং তার মাতৃভাষা হচ্ছে বাংলা। প্রস্তাবটি সম্পর্কে বিরুদ্ধ সংবাদ সত্ত্বেও যাতে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ প্রস্তাবটি সমর্থন করে সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। দিল্লীতে তোমার উপস্থিতি যদি প্রয়োজন হয় আমি টেলিফোন অথবা টেলিগ্রাফ করব। কাযনির্বাহী কমিটির সঙ্গে খসডাটি নিয়ে আলাপ করা উচিত বলে মনে করি।

তোমাদেব,

বাপু"

গান্ধীর চিঠির জবাবে ২৬শে মে, ১৯৪৭ সালে শরৎচন্দ্র বসু লিখলেন .

"প্রিয় মহাত্মাজী,

আপনার ২৪ তারিখেব চিঠি গতকাল দেবেন আমাকে দিয়েছেন। তাতে উল্লিখিত প্রস্তাবের জন্য আমি খুবই কৃতজ্ঞ। প্রায় প্রতিদিনই আমবা শর্তগুলি নিয়ে আলাপ আলোচনা করছি এবং সেগুলি আবও উন্নত কবার চেষ্টা কবছি। গত পবশু কিরণ এবং বঙ্গীয় আইন পরিষদের কিছু সদস্যদের সঙ্গে আমাব দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। গতরাত্রে আবুল হাশিম ও সত্য বসুর সঙ্গে আলাপ হয়েছে। আলোচনার ফলে শর্তের এক ও দুই অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় খসড়া তৈবী করেছি এবং আজ সকালে শহীদের কাছে পাঠিযেছি। আপনাব বিবেচনার জন্য এক অনুচ্ছেদের নূতন খসডাটির কপি সংযোজিত করলাম।

সরকাবের প্রতিটি বিধিবদ্ধ আইনে কার্যনির্বাহা পরিষদ ও আইনসভার দুই তৃতীয়াংশ হিন্দু-সদস্যদের সহযোগিতা থাকতে হবে আপনার এই প্রস্তাব সম্বন্ধে শহীদেব সঙ্গে আমি আলাপ করতে পারিনি। তিনি আজ বৈকালে বিমান যোগে দিল্লী রওয়ানা হচ্ছেন। আমি যদি দিল্লীতে যাই তাহলে সেখানে তাঁর সঙ্গে আলাপ করব। যদি এর মধ্যে তিনি আপনাব সঙ্গে দেখা করেন তাহলে এ বিষয়টি উত্থাপন করতে পারেন এবং তাঁর প্রতিক্রিয়ার বিষয় জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

বাংলার একটি সাধারণ সংস্কৃতি আছে এবং বাংলা তার সাধারণ মাতৃভাষা —চুক্তিতে এ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে আপনার পরামর্শ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, সে বিষয়ে গত জানুয়ারী মাসে আমি আলোচনার সূত্রপাত করেছিলাম এবং তখন থেকেই আলোচনা করে চলেছি। সে আলোচনার ভিত্তি ছিলো এই যে বাংলার সংস্কৃতি ও মাতৃভাষা এক এবং আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সকলেই সে ভিত্তির ব্যাপারে একমত। গত মাসে শহীদের একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে তিনি সে কথা স্বীকার করেছিলেন। সুতরাং

শর্তগুলির মধ্যে এ বিষয়গুলি সংযুক্তিকরণে কোনো অসুবিধে হওয়া উচিত নয়।

আজকের মতো এখানে শেষ করছি, প্রণামসহ।

মহাত্মা গান্ধী, আপনার স্নেহের,
নূতন দিল্লী। শরৎচন্দ্র বোস ( স্বাক্ষরিত )

পুনশ্চ:

শহীদ এবং ফজলুর রহমান জিন্নাহর সঙ্গে ও কার্যনির্বাহী কমিটিতে শর্তের বিষয় আলোচনা করবেন। তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে আমার মনে হয়েছে যে, বাংলার কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ যদি চুক্তিতে উপনীত হতে পারে, জিন্নাহ তাতে বাধা প্রদান নাও করতে পারেন।"

১৯৪৭ সালের ৯ই জুন শরৎচন্দ্র বসু জিন্নাহকে এক চিঠি লিখলেন :

"প্রিয় জিন্নাহ,

আমার প্রস্তাব বিবেচনা করার জন্য এবং আপনার সৌজন্য ও সহৃদয়তার জন্য আপনাকে অশেষ আন্তরিকতার সঙ্গে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বাংলা তার ইতিহাসের সব চেয়ে গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে কিন্তু এখনও তাকে রক্ষা করা সম্ভব। তাকে রক্ষা করা যেতে পারে যদি আপনি বঙ্গীয় আইন পরিষদের মুসলমান সদস্যদের অনুগ্রহ করে নিম্নরূপ নির্দেশ প্রদান করেন :

১॥ আইনসভার সদস্যদের ( ইউরোপীয়ান বাদে ) অনুষ্ঠিতব্য সভায় যেখানে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে যে, সমগ্র প্রদেশ কোন বিধানসভায় যোগ দেবেন, সেখানে যদি উভয় অংশ একত্রিত থাকবেন বলে স্থির করে থাকেন তাহলে তাঁরা যেন হিন্দুস্থান অথবা পাকিস্তান কোনো বিধানসভার পক্ষে ভোট না দেন এবং বিধান সভায় অথবা প্রেস বিজ্ঞপ্তি অথবা অন্যভাবে পরিষ্কারভাবে তাঁরা যেন বলেন যে তাঁরা দৃঢ়ভাবে বাংলার নিজস্ব বিধানসভার পক্ষে।

২॥ উভয় অংশের আইনসভার সদস্যদের পৃথক বৈঠকে প্রদেশকে বিভক্ত করা হবে কিনা সে বিষয়ে ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকায় তাঁরা যেন বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ভোট প্রদান করেন।

আমাদের সাক্ষাতে আপনি যে মতামত ব্যক্ত করেছিলেন সে অনুযায়ী আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি। কিন্তু আমার মনে হয় যে আপনার সদস্যদের কিভাবে ভোট প্রদান করতে হবে সে বিষয়ে যদি সুনির্দিষ্ট কোনো নির্দেশ না দিয়ে শুধুমাত্র আপনার মতামত ব্যক্ত করেন তাহলে এ অবস্থাকে রক্ষা করা যাবে না। আমি আশা করি বাংলার অখণ্ডতা বজায় রাখতে এবং তাকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত করতে আপনি আপনার ক্ষমতাকে কাজে লাগাবেন।

অনুচ্ছেদ এক ও দুই-এ যে প্রস্তাব করা হয়েছে সেভাবে বঙ্গীয় আইনসভার সদস্যরা যদি সঠিকভাবে ভোট প্রদান করেন, আমার মনে হয় লর্ড মাউণ্টব্যাটেন

( ইউরোপীয়ান সদস্য বাদে ) সংসদের সকল সদস্যের আরেকটি সভা আহ্বান করতে বাধ্য হবেন যেখানে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে যে সারা প্রদেশ তাদের নিজেদের পৃথক বিধানপরিষদ চান কিনা।

আমি তেরো অথবা চোদ্দ তারিখে দিল্লী পৌঁছব এবং আপনার সঙ্গে চোদ্দ অথবা পনেরো তারিখে দেখা করব।

শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ জানিয়ে।

কায়েদে আজম এম. এ. জিন্নাহ,
ব্যারিস্টার-এ্যাট-ল,
১৫ নং আওরঙ্গজেব রোড,
নূতন দিল্লী।"

আপনার একান্ত,
শরৎচন্দ্র বসু ( স্বাক্ষরিত )

জিন্নাহ মুসলিম বিধায়কদের পাকিস্তানের পক্ষে এবং বঙ্গভঙ্গের বিপক্ষে দৃঢ়ভাবে ভোট প্রদান করার জন্য নির্দেশ প্রেরণ করলেন। জিন্নাহ সারা বাংলাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তি করতে চেয়েছিলেন এবং কংগ্রেস বাংলার অর্ধেক অংশ ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়ে তদনুসারে কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা হিন্দু বিধায়কদের বঙ্গভঙ্গেব স্বপক্ষে ভোট প্রদান করাব জন্য নির্দেশ প্রদান করলেন। ইতিমধ্যে হিন্দু নেতৃবর্গ অভিযোগ করলেন যে, মুসলিম লীগ বঙ্গীয় আইনসভার সদস্যদের বঙ্গভঙ্গের বিপক্ষে ভোট প্রদানের জন্য উৎকোচ-দেওয়া শুরু করেছে। গান্ধী সে কথা বিশ্বাস করলেন। ১৯৪৭ সালের ৯ই জুন শরৎচন্দ্র বসু দিল্লীর ভাঙ্গী কলোনীতে গান্ধীর নিকট নিম্নোক্ত তারবার্তা প্রেরণ করলেন :

"যুক্ত বাংলার দাবীতে ভোট ক্রয় করার জন্য যে অকাতরে অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে সে বিষয়ে আপনার সংবাদদাতার নাম প্রকাশ্যভাবে ব্যক্ত করার জন্য এবং সত্য যাচাই করার জন্য অনুসন্ধান চালাতে অনুরোধ জানাচ্ছি। যদি সংবাদ সঠিক না হয় তাহলে সংবাদদাতাকে শাস্তি দিন। সংবাদ যদি সঠিক হয় তাহলে উৎকোচ দাতা এবং গ্রহিতাকে শাস্তি দিন।

শরৎ বসু"

জুনের দশ তারিখে গান্ধী টেলিগ্রাম করে শরৎচন্দ্র বসুর টেলিগ্রামের জবাব পাঠালেন। তিনি লিখলেন :

"ক্রুদ্ধ তারবার্তা পেলাম। ক্রোধ অনুচিত। রোববারে চিঠি লিখেছি। নাম প্রকাশ করা উচিত হবে না। জনমত বাদ দিয়ে ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক কিভাবে আন্দোলন ছাড়া উৎকোচ-দাতা ও গ্রহিতাকে শাস্তি দেওয়া যেতে পারে। শান্ত হও এবং ধীরস্থির থাকো।

বাপু"

জুনের এগারো তারিখে শরৎচন্দ্র বসু গান্ধীকে নিম্নোক্ত তারবার্তা পাঠালেন :

"আমার তারবার্তায় ও আমার মধ্যে কোনো ক্রোধ ছিলো না, কেবলমাত্র অনুরোধ ছিলো। সত্য যাচাই না করে আপনি উড়ো খবরে আস্থা স্থাপন করবেন আশা করিনি। আপনার চিঠির অপেক্ষায় রইলাম। আপনার অনুমতি ছাড়া নাম প্রকাশ করব না।

শরৎচন্দ্র বসু"

উপরোল্লিখিত তারবার্তা বিনিময়ের পূর্বে গান্ধী ১৯৪৭ সালের ৮ই জুন শরৎচন্দ্র বসুকে লিখলেন:

"প্রিয় শরৎ,

তোমার খসড়া পড়লাম। আমি এখন পরিকল্পনাটি মোটামুটিভাবে পণ্ডিত নেহরু এবং সরদারের সঙ্গে আলোচনা করেছি। দু'জনেই প্রস্তাবটির বিরুদ্ধে অনড় এবং তাঁরা মনে করেন এটা কেবল তফসিলী সম্প্রদায়ের এবং হিন্দু নেতাদের দ্বিধা বিভক্ত করার ফন্দী। তাঁদের কছে এটা সন্দেহ নয় বরং প্রায় দৃঢ় বিশ্বাস। তাঁরা আরও মনে করেন যে, তফসিলী সম্প্রদায়ের ভোট সংগ্রহের জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে। তাই যদি হয় তাহলে তোমার উচিত আপাতত সংগ্রাম থেকে বিরত থাকা। কারণ, খোলাখুলিভাবে বঙ্গভঙ্গের চেয়ে দুর্নীতিকে আশ্রয় করে অখণ্ডতা ক্রয় হবে অনেক বেশি খারাপ। এটা হচ্ছে বর্তমানের বিভক্ত হৃদয় এবং হিন্দুদের দুর্ভাগ্যজনক অভিজ্ঞতারই স্বীকৃতি। আমি আরও মনে করি যে ভারতের দুই অংশের বাইরে ক্ষমতা হস্তান্তরের কোনো সম্ভাবনা নেই। সুতরাং যে সিদ্ধান্তই নেওয়া হোক সেটা নিতে হবে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের পূর্ব চুক্তি অনুযায়ী। এটা আমার যতদূর মনে হয় অর্জন করা তোমার পক্ষে সম্ভব হবে না। যাই হোক, আমি তোমার বিশ্বাসকে দুর্বল করতে চাই না যদি না সেটা উপরোল্লিখিত চালাকি ও দুর্নীতিকে আশ্রয় করে চোরাবালির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। তুমি যদি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত থাকো যে সন্দেহের কোনো কারণ নেই, তবুও কেন্দ্র কর্তৃক সমর্থিত স্থানীয় মুসলিম লীগের লিখিত নিশ্চয়তা যদি না পাও তাহলে তোমার উচিত হবে বাংলার অখণ্ডতার জন্য সংগ্রাম পরিত্যাগ করা এবং বঙ্গভঙ্গের জন্য যে পরিবেশ রচিত হয়েছে তাতে কোনো বিঘ্ন সৃষ্টি না করা।

ভালোবাসা সহ,

বাপু"

লর্ড মাউন্টব্যাটেনের ভারত, বাংলা এবং পাঞ্জাব বিভক্তির চূড়ান্ত রোয়েদাদ বিবেচনা করার জন্য নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কাউন্সিল অধিবেশনের দিন ধার্য করা হলো ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন। অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিলো বেলা দশটায় দিল্লীর ইম্পিরিয়াল হোটেলে।

দিল্লীর উদ্দেশে রওয়ানা হওয়ার কয়েকদিন পূর্বে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কাউন্সিলে বাংলার প্রতিনিধিরা সুহরাওয়ার্দীর বাসভবনে মিলিত হলেন। তাঁরা

সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিলেন মুসলিম লীগ যদি লর্ড মাউন্টব্যাটেনের রোয়েদাদ গ্রহণ করেন তাহলে তাঁরা সে প্রস্তাবের বিরোধিতা করবেন। সভা শেষে সুহরাওয়ার্দী সমস্যাটি নিয়ে লর্ড মাউন্টব্যাটেন এবং জিন্নাহর সঙ্গে আলোচনা করার জন্য দিল্লীর উদ্দেশে বিমান যোগে কলকাতা ত্যাগ করলেন। বাংলার প্রতিনিধিরা ট্রেন যোগে কলকাতা থেকে দিল্লী রওয়ানা হলেন। আমি ২রা জুন বিমান যোগে দিল্লীর উদ্দেশে কলকাতা ত্যাগ করেছিলাম।

পালাম বিমানবন্দরে নোয়াখালীর আবদুল জব্বার খদ্দর আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং সংবাদ দিলেন যে সুহরাওয়ার্দী যেখানে ছিলেন সেখানে তিনি একটি সভা আহ্বান করে বাংলার প্রতিনিধিদের জিন্নাহর প্রস্তাব সমর্থন করার জন্য প্ররোচিত করেছেন। যখন খদ্দরের নিকট থেকে একথা আমি শুনলাম তখন আমার চোখের সামনে বাঙালার ট্র্যাজেডা ভেসে উঠল। পরের দিন সকালে কাউন্সিলের অধিবেশনে যোগদান করার জন্য ইম্পিরিয়াল হোটেলের উদ্দেশে আমি আমার হোটেল ত্যাগ করলাম।

আমাদের পূর্ব চুক্তি অনুযায়ী পাঞ্জাব এবং সিন্ধু প্রদেশ, এমনকি জিন্নাহর প্রদেশ বম্বে, বাংলাকে সমর্থন দানে রাজি হয়েছিলো। ইম্পিরিয়াল হোটেলের প্রবেশ পথে ভারতের বিভিন্ন সংখ্যালঘু প্রদেশের কয়েক হাজার মুসলিম যুবক সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ছিলো। তাঁরা আমাকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে বলে উঠল। "ওঁরা সবাই আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন এখন আপনিই আমাদের ভরসা।" আমি তাদের বিলাপ শুনলাম, কিন্তু আমার কিছুই করার উপায় ছিলো না।

সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিলো হোটেলের উপরতলায়। হলের দ্বার দেশে আমি সুহরাওয়ার্দীকে দেখতে পেলাম। তাঁকে আমি জিজ্ঞেস করলাম "আপনি কি প্রস্তাবটি উত্থাপন করছেন"? তিনি বললেন, "না হাশিম, তাঁরা প্রস্তাবটি উত্থাপন করার জন্য আমাকে বলেননি তবে এর পক্ষে আমাকে কিছু বলতে হতে পারে কারণ এর বিকল্প এক ভয়ানক ব্যাপার।"

জিন্নাহ মাইক্রোফোনের কাছে এসে তাঁর প্রস্তাব পাঠ করা মাত্র খাকসাররা বেলচায় ( Belchas ) সজ্জিত হয়ে হোটেলের রান্নাঘরের মধ্যে থেকে বের হয়ে সামনে ও পিছনে দুই দিক দিয়ে সভাকক্ষ আক্রমণ করল। চেয়ারে বসে আমি নির্বিঘ্নে ধূমপান করতে করতে সব সময় মাথায় বেলচার মারাত্মক আঘাতের আশংকা করছিলাম। সভাকক্ষের সম্মুখভাগে বাংলার স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ও বালুচ এবং পশ্চাৎভাগে পাঞ্জাবী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী পাহারায় নিযুক্ত ছিলো। খাকসারদের সাফল্যের সঙ্গে প্রতিহত করা হয়েছিলো কিন্তু ইম্পিরিয়াল হোটেলের মেঝে খাকসারদের তাজা রক্তে রঞ্জিত হয়েছিলো। স্মরণ করা যেতে পারে যে, ১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ যখন আমরা পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণ করি তখন স্যার সিকান্দার

হায়াৎ খানের পুলিশ বাহিনী খাকসারদের বিরাট বিক্ষোভ মিছিলের উপর গুলি চালিয়েছিলো। এভাবে তথাকথিত পাকিস্তান প্রস্তাবের শুরু ও শেষ খাকসারদের রক্তে চিহ্নিত হয়েছিলো।

জিন্নাহ তাঁর প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। মৌলানা হসরত মোহানী এবং আমি প্রস্তাবের উপর বক্তব্য রাখার চেষ্টা করলাম কিন্তু জিন্নাহ আমাদের মঞ্চে আহ্বান করলেন না। এরপর সভা আমাদের বক্তব্য শুনতে চাইল। জিন্নাহ বললেন, "আমি যদি আবুল হাশিমকে বক্তৃতা দিতে অনুমতি প্রদান করি তাহলে তিনি যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবেন তার প্রভাব খর্ব করতে আমাকে দশজন প্রথম শ্রেণীর বক্তাকে দাঁড করাতে হবে, আমার ততটা সময় নেই। আলোচনা করার কি আছে, বাংলা এবং পাঞ্জাব বিভাগ? এ বিষয়ের মীমাংসা হয়ে গেছে বলে ধরে নিতে হবে। আপনাদের মাউণ্টব্যাটেনের রোয়েদাদ হয় সম্পূর্ণভাবে মেনে নিতে হবে নয়ত সম্পূর্ণভাবে নাকচ করতে হবে। বলুন, হঁ্যা কি না?"

হাত উঠিযে ভোট নেওয়া হলো। সুহরাওয়ার্দী ভোট গণনা করলেন এবং বিজয়ীর সুরে বললেন, "কায়েদে আজম, কেবলমাত্র এগারোজন আমাদের বিরুদ্ধে ভোট প্রদান কবেছেন।" প্রস্তাব পাশ হয়ে গেলো এবং ৭ই জুন সুহরাওয়ার্দী এক প্রেস বিবৃতির মাধ্যমে বললেন, "ঢাকা এখন পাকিস্তানে।"

৩রা জুনের সন্ধ্যায় আমি এক প্রেস বিবৃতি প্রদান করলাম। আমি বলেছিলাম মুসলিম লীগ কাউন্সিল সদস্যদের সিদ্ধান্ত তিন প্রকার ভীতির পরিণাম। প্রথমত, জিন্নাহর প্রতি অভ্যাসগত ভাতি, দ্বিতীয়ত, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ এবং তৃতীয়ত, জিন্নাহ অসন্তুষ্ট হলে পাকিস্তানে তাঁদের পদমর্যাদার অনিশ্চয়তা। আমার বিবৃতির উপর মন্তব্য করতে গিয়ে ডন পত্রিকা এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ 'ঘাসের মধ্যে সাপ' এই শিরোনামে প্রকাশ করল। ডন পত্রিকা আমাকে ঘাসের মধ্যে সাপ বলে উল্লেখ করেছিলো।

এভাবে ১৯৪০ সালের বিখ্যাত প্রস্তাবকে অনাড়ম্বরভাবে আরব সাগরে নিক্ষেপ করা হলো এবং জিন্নাহ এক সময় যাকে ছিন্নভিন্ন পোকায় কাটা আখ্যায়িত করে-ছিলেন সেই পাকিস্তানকে দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করে নিলেন। যে নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেস দৃঢভাবে ভারত বিভাগের বিরোধিতা করেছিলো, তাঁরা সাম্প্র-দয়িকতার ভিত্তিতে ভারত, বাংলা এবং পাঞ্জাব বিভাগে সম্মত হলেন।

শরৎচন্দ্র বসু ১৪ই জুন গান্ধীকে নিম্নলিখিত পত্রটি লিখলেন :

"প্রিয় মহাত্মাজী,

আপনার আট তারিখের সহৃদয় চিঠি গতকাল বৈকালে আমার হাতে পৌছেছে। আমি জানতে পারলাম জওহরলাল এবং বল্লভ ভাই দু'জনেই প্রস্তাবটির বিরুদ্ধে অনড়। এটা হিন্দু এবং তফসিলী সম্প্রদায়ের নেতাদের বিভক্ত করার একটা চক্রান্ত তাঁদের এই মতের সঙ্গে আমি একমত হতে পারি না। জানুয়ারী মাসে এবং তারপর.

থেকে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এবং পরবর্তী কালে কতিপয় কংগ্রেস নেতৃবর্গের সঙ্গে আলাপ আলোচনার পর নিশ্চিতভাবে এবং জোরালোভাবে বলতে পারি যে, সেখানে চক্রান্ত বলে কোনো ব্যাপার ছিলো না। আমি বুঝতে পারি না যে তফসিলী সম্প্রদায়েব ভোট সংগ্রহের জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে বলতে জওহরলাল এবং বল্লভ ভাই কি বোঝাতে চাইছেন। সত্য ঘটনার ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব, সন্দেহ এবং অনুমানের ক্ষেত্রে নয়। এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি যে, তফসিলী সম্প্রদায়ের ভোট সংগ্রহের জন্য অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে বলে যে সন্দেহ অথবা অনুমান তা সম্পূর্ণ ভীত্তিহীন। আমাব বিশ্বাস দৃঢ রয়েছে এবং আমি আমার ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে বাংলার অখণ্ডতার জন্য কাজ করে যাওয়ার অভিপ্রায় পোষণ করি। বঙ্গভঙ্গের পক্ষে যে প্রচণ্ড উত্তেজনামূলক প্রচারাভিযান চলছে এতদসত্ত্বেও আমার লেশমাত্র সন্দেহ নেই যে যদি গণভোট নেওয়া হতো তাহলে বাংলার হিন্দুরা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে অধিক সংখ্যায় ভোট প্রদান কবতেন। বাংলার কণ্ঠকে কিছুকালের জন্য রুদ্ধ করা হয়েছে কিন্তু আমার দৃঢ বিশ্বাস যে ভবিষ্যতে সে নিজেকে জোরের সঙ্গে প্রকাশ করবে।

প্রণামসহ।

মহাত্মা গান্ধী,
নূতন দিল্লী।

আপনার স্নেহের,
( স্বাক্ষরিত ) শরৎচন্দ্র বসু”

শরৎচন্দ্র বসু গান্ধীকে আরেকটি পত্র লেখেন ও সেই পত্রে উল্লেখ করেন .

“আমাব ভাবতে কষ্ট হয় যে, কংগ্রেস একদা ছিলো এক মহান্ জাতীয় প্রতিষ্ঠান তা দ্রুত কেবলমাত্র হিন্দুদের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে চলেছে।”

এক গভীর ব্যক্তিগত শোকচ্ছায়ায় নিমগ্ন হয়ে ‘নেশন’ পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান হিসাবে ১৯৫০ জালের ১১ই ফেব্রুয়ারীতে লিখতে গিয়ে শরৎচন্দ্র বসু বলেছিলেন, “পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার বাঙালী ভাইদের আমি শান্তি বজায় রাখার জন্য আবেদন করেছিলাম। আবেদন করেছিলাম পবিণামদর্শিতা, প্রশান্ত ভাব এবং স্থির মস্তিষ্কের প্রতি সন্মান রেখে শান্ত হওয়ার জন্য। আমি তাঁদের যা কিছু পবিত্র তাব নামে, বাঙালীর অতীতের নামে, তাঁদেব মধ্যে যে হৃদ্যতা ছিলো ও যা অপরিবর্তিত থাকবে তার নামে এবং মানবতার নামে আবেদন জানিয়েছিলাম হিংসার পথ পরিত্যাগ করতে এবং প্রশান্ত ভাব ধারণ করে ও স্থির মস্তিষ্কে সাম্প্রদায়িক শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে। আমি তাঁদের নিষেধ করেছিলাম দিল্লী অথবা করাচীর দিকে যেন তাঁরা তাকিয়ে না থাকেন, কেন না সেখান থেকে কোনো আলোর সন্ধান পাওয়া যাবে না। আমি তাঁদের বলেছিলাম তাঁদের নিজেদের মধ্যে আলোর সন্ধান খুঁজে বের করতে।”

সংসদ কক্ষে ২৯শে জুন বঙ্গীয় বিধানসভার সদস্যদের এক যুগ্ম সভা অনুষ্ঠিত হলো। যুগ্ম সভা পাকিস্তানে যোগদানের পক্ষে ভোট প্রদান করল। এর পনেরো

মিনিট পর তুটি সভা অনুষ্ঠিত হলো। একটি বাংলার হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং অন্যটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের অঞ্চলের। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের সদস্যরা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে এবং হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের সদস্যরা বঙ্গভঙ্গের পক্ষে ভোট প্রদান করলেন। বাংলা তুই ভাগে বিভক্ত হলো। কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্যরা বঙ্গভঙ্গের পক্ষে ভোট প্রদান করেন।

কম্যুনিস্ট পার্টি বঙ্গভঙ্গের পক্ষে ভোট প্রদান করেছিলেন কিন্তু সিলেটের গণভোটে তাঁরা আসাম থেকে সিলেটকে বিচ্ছিন্ন করার বিপক্ষে ভোট দেন। যখন গণভোট আসাম থেকে সিলেটকে বিচ্ছিন্ন করার পক্ষে রায় প্রদান করল তখন কম্যুনিস্ট পার্টি দাবী জানালেন যে, সিলেটের হিন্দু অধ্যুষিত থানাগুলিকে সিলেট থেকে যেন আলাদা করে আসামের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

মিস্টার চুন্দ্রীগড়ের সভাপতিত্বে ৫ই আগস্ট তুটি সভা অনুষ্ঠিত হলো। পূর্ব পাকিস্তানের বিধানসভার সদস্যদের সভায় পূর্ব পাকিস্তান পার্লামেণ্টারী পার্টির নেতৃত্বের জন্য সুহরাওয়ার্দী খাজা নাজিমুদ্দীনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেন এবং পরাজিত হলেন। খাজা নাজিমুদ্দীন পঁচাত্তরটি ভোট পান এবং সুহরাওয়ার্দী পান মাত্র উনচল্লিশটি। সুহরাওয়ার্দী পরাজিত হবার পরমুহূর্তে বসিরহাটের আবত্বর রহমানকে সঙ্গে করে পার্শ্ববর্তী কক্ষে যেখানে পশ্চিমবঙ্গ মুসলিম লীগের পার্লামেণ্টারী পার্টির সদস্যরা তাঁদের নেতা নির্বাচিত করার জন্য বসে ছিলেন সেখানে ছুটে গেলেন। আবত্বর রহমান সুহরাওয়ার্দীর নাম প্রস্তাব করলেন এবং সুহরাওয়ার্দী পশ্চিমবঙ্গ মুসলিম লীগের পার্লামেণ্টারী পার্টির নেতা নির্বাচিত হলেন। এটা ছিলো দেবতাদের উপভোগ করার মতো এক দৃশ্য। যে ব্যক্তি একমূহূর্ত আগেও পাকিস্তানে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছিলেন তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম লীগের পার্লামেণ্টারী পার্টির নেতা হিসাবে নিজের নাম প্রস্তাব করলেন।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হলো। রাজা গোপাল আচারী পশ্চিমবঙ্গের প্রথম গভর্নর নিযুক্ত হলেন। ১৫ই আগস্টে সকালে গভর্নমেণ্ট হাউসে ভারতীয় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হলো এবং রাজা গোপাল আচারীকে পশ্চিমবঙ্গের গভর্নর হিসাবে আনুষ্ঠানিক-ভাবে পদাভিষিক্ত করা হলো। আমরা অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিলাম।

গান্ধী কলকাতায় উপস্থিত ছিলেন। বিকেলে সোদপুর আশ্রমে আমি গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। দ্রেবেন দে আমার সঙ্গে ছিলেন। আমরা যখন গান্ধীর কামরায় প্রবেশ করলাম তখন তিনি আমার সঙ্গে করমর্দন করার জন্য তাঁর দীর্ঘ হস্ত প্রসারিত করে উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন। তিনি বললেন, "হাশিম, তুমি পরাজিত হয়েছো।" আমি মনে করলাম তিনি পূর্ব পাকিস্তানের পার্লামেণ্টারী পার্টির নেতৃত্বের জন্য সুহরাওয়ার্দীর পরাজয়ের ব্যাপারটি উল্লেখ করেছেন। গান্ধী

বললেন, "না, না ওটা একটা তুচ্ছ ব্যাপার। তুমি বঙ্গভঙ্গ রোধ করতে পারলে না। এটাই তোমার পরাজয়। কিন্তু আমি তোমাকে নিশ্চয় করে বলতে পারি যে তুমি যদি তোমার দৃষ্টিশক্তি না হারাতে তাহলে তুমি জয়লাভ করতে পারতে।" ১৯৪৭ সালের মধ্যেই আমি প্রায় সম্পূর্ণভাবে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলাম। এখানে তিনি আমার দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলার বিষয়টিই উল্লেখ করেছিলেন।

গান্ধী যথারীতি সাধারণ বেতের মাদুরে বসেছিলেন। দুনিয়া মনে করল দিনটি স্বাধীনতার জন্য গান্ধীর সারাজীবনের সংগ্রামের বিজয় দিবস। কিন্তু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে তিনি তাঁর গভীর হতাশা প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন, "পৃথিবী জানে সরদার প্যাটেল 'আমার আজ্ঞাবহ ব্যক্তি', কিন্তু ইদানীং আমি যা কিছু বলি তিনি তাতেই 'না' বলেন। বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রাতঃভ্রমণে আমার সঙ্গে থাকেন কিন্তু যখনই আমি আশ্রমে ফিরে আসি আমার মনে হয় যেন আর আমাদের দেখা হবে না। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সত্যই জওহার কিন্তু আবেগ উচ্ছ্বাসের বশবর্তী হয়ে কখনো কখনো এমন কথাবার্তা বলেন যেটা তাঁর বলা উচিত নয়। কিন্তু তাঁর ভুল যদি তাঁকে দেখিয়ে দেওয়া যায় তাহলে তিনি তাঁর ভুল স্বীকার করে নেওয়ার সাহস রাখেন। এসব দেখার জন্য আর কতদিন আমি জীবিত থাকব।" তিনি বেশিদিন জীবিত থাকেননি। ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী শুক্রবার তিনি আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছিলেন।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, সরদার প্যাটেল, বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রভৃতি গান্ধীর সহকর্মীরা গান্ধীর আদর্শকে কখনই গ্রহণ করতে পারেননি বরং তাঁরা তাঁদের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁকে নেতা হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। একথা গান্ধী খুব ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং এখানেই তাঁর সারাজীবনের যে সংগ্রাম তার পরাজয় হয়েছিলো। আমাদের কথাবার্তার শেষ পর্যায়ে আমি গান্ধীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম পাকিস্তানের বদলে আজ জিন্নাহ যদি তাঁকে তাঁর চোদ্দ দফার প্রস্তাব দেন তাহলে তাঁর মনোভাব কী হবে। তিনি বলেছিলেন, "হাশিম আমি খুব সাগ্রহে তা গ্রহণ করব।" শ্রদ্ধার সঙ্গে ও বিনম্র স্বরে আমি মন্তব্য করলাম, "মহাত্মাজী, আপনাকে তাহলে স্বীকার করতে হবে যে, আপনি যখন জিন্নাহর চোদ্দ দফা অগ্রাহ্য করেছিলেন সে সময় ১৫ অগাস্ট, ১৯৪৭ আপনার দৃষ্টিগোচর হয়নি।"

পরিশিষ্ট : ১

## জিন্নাহর চোদ্দ দফা

মহামান্য আগা খানের সভাপতিত্বে ১৯২৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর দিল্লীতে মুসলিম সর্বদলীয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত :

১ ॥ ভারতের শাসনব্যবস্থা হতে হবে যুক্তপ্রজাতান্ত্রিক ;

২ ॥ প্রদেশ এবং রাষ্ট্রগুলিকে অবশিষ্ট ক্ষমতা দিতে হবে ;

৩ ॥ কোনো বিল সম্পর্কে উপস্থিত যে কোনো সম্প্রদায়ের তিন চতুর্থাংশ সদস্য আপত্তি জানালে তা নিয়ে অগ্রসর হওয়া যাবে না ;

৪ ॥ মুসলমানদের পৃথক নির্বাচনের অধিকার যতক্ষণ তারা নিজেরা বর্জন না করে ততক্ষণ বলবৎ থাকবে ,

৫ ॥ কেন্দ্রীয় আইনসভায় মুসলমান সদস্যদের এক তৃতীয়াংশ প্রতিনিধিত্ব থাকবে ;

৬ ॥ যে প্রদেশের মুসলমানরা সংখ্যালঘু সেখানে বর্তমান প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে ,

৭ ॥ কোনো সংখ্যাগুরুকে সংখ্যালঘু অথবা সমানে সমানে রূপান্তরিত করা যাবে না ;

৮ ॥ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং বেলুচিস্তানে সংস্কার প্রবর্তন করতে হবে ;

৯ ॥ সিন্ধু প্রদেশের পৃথকীকরণ ;

১০ ॥ চাকুরীক্ষেত্রে মুসলমানদের আসন সংরক্ষণ ;

১১ ॥ মুসলমান সংস্কৃতি, ভাষা, ধর্ম এবং শিক্ষা ব্যবস্থা, ব্যক্তিগত আইন ও ওয়াকৃফ সংরক্ষণ ;

১২ ॥ সরকারের শিক্ষা বিভাগে মুসলমানদের প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব ;

১৩ ॥ প্রদেশগুলি কর্তৃক স্বেচ্ছায় সম্মতি প্রদান ব্যতিরেকে ভারতীয় আইন পরিষদে কোনো পরিবর্তন আনা চলবে না ;

১৪ ॥ ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগুলি কর্তৃক স্বেচ্ছায় সম্মতি প্রদান ব্যতিরেকে ভারতীয় আইন পরিষদে কোনো পরিবর্তন আনা চলবে না ।*

*এই ১৪ দফা ১৯২৯ সালে মার্চ মাসে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ সম্মেলনে গৃহীত হয়েছিলো এবং পরবর্তীকালে হিন্দু প্রেস 'জিন্নাহর চোদ্দ দফা' নামে একে আখ্যায়িত করেছিলো ।

পরিশিষ্ট : ২

## ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব

[ লাহোর প্রস্তাব, যেটা সরকারীভাবে পাকিস্তান প্রস্তাব নামে পরিচিত, ২৩শে মার্চ নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিলে উত্থাপন করা হয়েছিলো এবং লাহোরে ১৯৪০ সালে ২৪শে মার্চ গৃহীত হয়েছিলো। উত্থাপক : বাংলার এ. কে. ফজলুল হক। ]

১॥ ১৯৩৯ সালের ২৭শে আগস্ট, ১৭ই ও ১৮ই সেপ্টেম্বর ও ২২শে অক্টোবর এবং ১৯৪০ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী সাংবিধানিক প্রশ্নে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কাউন্সিল ও কার্যনির্বাহী কমিটি যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলো, সেটা অনুমোদন ও সমর্থন করে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের এই অধিবেশন জোরালোভাবে পুনরুল্লেখ করছে যে, ১৯৩৬ সালের ভারত সরকার আইনে অন্তর্ভুক্ত যুক্ত প্রজাতন্ত্র পরিকল্পনা এ দেশের বিশেষ অবস্থায় অনুপযুক্ত ও অকার্যকর এবং মুসলিম ভারতের জন্য একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়,

২॥ এই অধিবেশন তার দৃঢ় অভিমত পুনরায় লিপিবদ্ধ করছে যে, যেহেতু মহামান্য সম্রাটের পক্ষ থেকে ১৮ই অক্টোবর ১৯৩৯ সালে ভাইসরয় তাঁর ঘোষণায় ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইন বা নীতি ও পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে তা বিভিন্ন দল, স্বার্থ ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে আলোচনা করে পুনর্বিবেচনা করবেন বলে যে ঘোষণা করেছেন সেটা আশার কথা। মুসলিম ভারত সন্তুষ্ট হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সমগ্র শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা নূতনভাবে বিবেচিত হয় এবং মুসলমানরা কোনো সংশোধন ব্যবস্থা মেনে নেবে না যতক্ষণ না সেটা তাদের সম্মতি ও অনুমোদন সাপেক্ষে তৈরী হয়;

৩॥ সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো যে, নিখিল ভারত মুসলিম লীগের এই অধিবেশনের বিবেচিত অভিমত এই যে, এই দেশে কোনো শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকর ও গ্রহণযোগ্য নয় যতক্ষণ পর্যন্ত নিম্নোক্ত মূল নীতির উপর সেটি পরিকল্পিত হয়— যেমন, ভৌগোলিকভাবে লাগোয়া ভূখণ্ডগুলিকে এক একটি অঞ্চল হিসাবে চিহ্নিত করে সেগুলির এলাকা প্রয়োজন অনুযায়ী রদবদল করে এমনভাবে গঠন করতে হবে যে, যে সকল অঞ্চল মুসলিম অধ্যুষিত, যেমন ভারতের উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্বাঞ্চল, সেগুলিকে একত্রিত করে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহে পরিণত করতে হবে যেখানে গঠনকারী এককগুলি হবে স্বাধীন ও সার্বভৌম।

এই সমস্ত একক অঞ্চলে সংখ্যালঘুদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক শাসন ব্যবস্থা এবং অন্যান্য স্বার্থ ও সুবিধে যথাযথভাবে রক্ষার জন্য তাদের সঙ্গে আলোচনা করে সংবিধানে সুনির্দিষ্ট এবং বাধ্যতামূলকভাবে রক্ষণ ব্যবস্থা সন্নিবেশিত করতে হবে। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে যেখানে মুসলমান এবং

অন্যান্যরা সংখ্যালঘু সেখানে তাদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক, শাসন ব্যবস্থা, স্বার্থ ও সুবিধে তাদের সঙ্গে আলোচনা করে সংবিধানে যথাযথ, কার্যকর, বাধ্যতামূলক এবং সুনিশ্চিতভাবে রক্ষা করতে হবে।

এই অধিবেশনে মৌল নীতিভিত্তিক একটি সংবিধান রচনার দায়িত্বও কার্য-নির্বাহী কমিটির উপর ন্যস্ত করা হলো যেখানে বিশেষ বিশেষ অঞ্চলগুলো কর্তৃক প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র বিষয়ক যোগাযোগ, বহিঃশুল্ক এবং অন্যান্য বিষয়ে ক্ষমতা চূড়ান্তভাবে গ্রহণের ব্যবস্থা থাকবে।

পরিশিষ্ট . ৩

## শুরু হোক সংগ্রাম

আবুল হাশিম

( ১৯৪৫ সালেব ৬ই সেপ্টেম্বরে প্রদত্ত প্রেস বিবৃতি )

কায়েদে আজম মহাম্মদ আলী জিন্নাহ নিখিল ভারত মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে ঘোষণা করেছেন যে, ভারতের কেন্দ্রীয় প্রাদেশিক আইনসভার আসন্ন সাধারণ নির্বাচন পাকিস্তানের উপব ভারতীয় মুসলমানদের গণভোট হিসাবে গ্রহণ করা হবে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কার্যনির্বাহী কমিটিতে ১৯৪৫ সালের ১লা আগস্টের সভায় এ বিষয়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষ থেকে মেজব এটলীর সরকার এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন।

আমরা দাবী করি যে, নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ভারতের দশ কোটি মুসলমানের প্রতিনিধিত্বমূলক সংগঠন এবং লাহোরে ১৯৪০ সালের অধিবেশনে গৃহীত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অধুনা প্রখ্যাত প্রস্তাব যেটা সাধারণভাবে 'পাকিস্তান পরিকল্পনা' নামে পরিচিত, মুসলিম ভারতের অভিমতের প্রতিনিধিত্ব করে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধিরা সুস্পষ্টভাবে কখনও এটাকে মেনে নিতে পারেনি এবং ভারতে কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা ইত্যাদি তীব্রভাবে আমাদের দাবীর বিরোধিতা করেছে। তাঁরা মনে করেন, মুসলিম লীগ ছাডাও ভারতে আহরার, খাকসার, জামিয়াতুল ওলামা ইত্যাদির মতো ভারতের মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বমূলক কয়েকশো প্রতিষ্ঠান রয়েছে। পাকিস্তান পরিকল্পনা প্রথম দিকে জিন্নাহ ও মুসলিম লীগের কার্যনির্বাহী কমিটিতে তাঁর কিছু সংখ্যক বন্ধু-বান্ধবদেরই অভিমতের প্রতিনিধিত্ব করে। গান্ধী তাঁর এক চিঠিতে জিন্নাহকে এ বিষয়ে স্পষ্টভাবে বলেছিলেন। পরিশেষে কংগ্রেস মুসলিম লীগকে, মুসলিম ভারতের কিছু অংশের, সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান হিসাবে এবং মুসলিম লীগের পাকিস্তান পরিকল্পনা মুসলিম ভারতের সেই অংশেরই সাম্প্রদায়িক দাবী হিসাবে বর্ণনা করে যাঁদের প্রতিনিধিত্ব

করে মুসলিম লীগ। কিন্তু ভারতে লীগ প্রতিষ্ঠানের অসাধারণ বিকাশলাভ, তার সভাসমিতি, বিক্ষোভ ইত্যাদি এবং সর্বোপরি গত আট বছরে ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভার উপনির্বাচনে তার শতকরা একশো ভাগ সাফল্য, ভারতীয় রাজনীতির সঙ্গে পরিচিতদের একথা মেনে নিতে সাহায্য করেছিলো যে, মুসলিম ভারতের পক্ষ থেকে কেবলমাত্র মুসলিম লীগই দায়িত্ব পালনে সক্ষম। এবং নিখিল ভারত মুসলিম লীগের 'পাকিস্তান পরিকল্পনা' বিশ্বস্ততার সঙ্গে ভারতীয় মুসলমানদের সমগ্র অংশের অভিমতের প্রতিনিধিত্ব করে। প্রকৃতপক্ষে ক্রিপস্ প্রস্তাব যা গ্রেট বৃটেন ও ভারতের মধ্যে আলোচনার ভিত্তি প্রস্তুত করেছিলো এবং রাজা গোপাল আচারীর পরিকল্পনা যা কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে আলোচনার ভিত্তি প্রস্তুত করেছিলো তা মূল পাকিস্তান নীতি এবং মুসলিম লীগের দাবীকে পরোক্ষভাবে গ্রহণ করার কথাই ব্যক্ত করে। যদিও রাজাজী এবং স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপস্ উভয়েই নিজেদের মতো করে তাঁদের পরিকল্পনায় পাকিস্তান বিরোধী উপাদান আমদানি করে লাহোর প্রস্তাব নস্যাৎ করার জন্য সুচতুর প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন।

সিমলা আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পর খুবই দুর্ভাগ্যবশত কংগ্রেস ভারতীয় রাজনীতিকে সম্পূর্ণরূপে অবজ্ঞা করে এবং বাস্তব সত্যতাকে অস্বীকার করে তার পুরাতন মনোভাব অবলম্বন করল। তারা লীগের এবং পাকিস্তান পরিকল্পনার বিরুদ্ধে তাদের একই পুরাতন প্রচারকার্য শুরু করল। তারা এখন জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে অন্যায়ভাবে ভারতের নেতৃত্বের জন্য নিজেদের দাবী প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে লীগকে এবং তার দাবীকে উচ্ছেদ করার লক্ষ্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। বিদেশে প্রেরিত তাদের প্রতিনিধিরা সোভিয়েত ইউনিয়ন, গ্রেট বৃটেন এবং যুক্তরাষ্ট্রে জনমত গঠনের চেষ্টা চালাচ্ছে এই উদ্দেশ্যে যাতে করে স্তালিন, এটলী ও ট্রুম্যানকে কার্যকরভাবে প্রভাবিত করে পটস্ডাম থেকে তারা নিজেদের পক্ষে রায় পেতে পারে।

বর্তমান কালে একমাত্র ব্যালট বাক্সের মাধ্যমেই সম্ভব নির্ভুলভাবে জনমত যাচাই করা। সুতরাং মুসলিম লীগ, সহজ সরল মুসলমান, যারা ছলচাতুরীতে অনভ্যস্ত তাদেরই সংগঠন হিসাবে সোজাসুজিভাবে ভারতে সাধারণ নির্বাচন দাবী করেছে এবং ঘোষণা করেছে যে তারা এই নির্বাচনকে পাকিস্তানের উপর গণভোট হিসাবে ও সারা ভারতের মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বের দাবীর উপর গণভোট হিসাবে গ্রহণ করবে। মহামান্য সম্রাটের সরকার পরবর্তী শীত মরসুমে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সুতরাং আমরা এখন সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছি যেহেতু সাধারণ নির্বাচন হতে চলেছে পাকিস্তানের জন্য মুসলিম ভারতের শত্রুদের সঙ্গে প্রথম খণ্ডযুদ্ধ।

এই সংগ্রামের জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ প্রয়োজনীয় প্রাথমিক প্রস্তুতি করছে। এই সংগ্রামে বিজয় লাভের জন্য আমাদের সম্পদকে সংগঠিত করতে

হবে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ বাংলার সাড়ে তিনকোটি মুসলমানের প্রতিনিধিত্ব করে এবং বর্তমান হিসাবে এর দশ লক্ষেরও অধিক সদস্য রয়েছে। এরূপ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে এটা স্বাভাবিক যে এর নেতৃবৃন্দ, কর্মী, সদস্য ও সমর্থকদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকবে। আমি সকলের নিকট আন্তরিকভাবে আবেদন জানাচ্ছি, আমাদের এই সাধারণ সংগ্রাম অব্যাহত থাকা কালে তাঁদের সকল মতপার্থক্যকে পুঁটলি পাকিয়ে রেখে, প্রয়োজন হলে সেগুলোকে হিমাগারে আবদ্ধ রাখুন। এই সন্ধিক্ষণে ক্ষমতার জন্য, ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ এবং অন্য কিছুর জন্য অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বসংঘর্ষ হবে আত্মঘাতী। আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল সুদূরপ্রসারী পরিণতি বয়ে আনবে এবং কিছুকালের জন্য এর দ্বারা ভারতের ভাগ্য নির্ধারিত হবে।

কংগ্রেস নিজেদের ব্যাপারে যাই চিন্তা করুন না কেন অথবা অন্যকে সে বিষয়ে যাই চিন্তা ভাবনা করার প্রয়াসী হন না কেন, মধ্যদিনের সূর্যের মতো একথা পরিষ্কারভাবে সত্য যে তাঁরা মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করেন না। কিছু সংখ্যক মুসলমান হয়ত-বা তাঁদের বদ্ধমূল রক্ষণশীলতার জন্য যা ক্রমবর্ধমান এবং প্রগতিশীল রাজনৈতিক চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁদের তাল মিলিয়ে চলার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করছে, অথবা তাঁদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য এখনও কংগ্রেসের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্কিত রেখেছেন, তাঁদের কোনো প্রতিনিধিত্বমূলক ক্ষমতা নেই, কেননা, তাঁরা নিজেদের ছাড়া অন্য কারও প্রতিনিধিত্ব করেন না। মৌলানা আবুল কালাম আজাদের প্রতি যথাযথ সম্মান রেখে বলা চলে যে, তাঁর কংগ্রেস সভাপতির পদটি হচ্ছে যাঁরা ভারতীয় রাজনীতির সঙ্গে ভালোভাবে পরিচিত নন তাঁদেরকে সুপরিকল্পিতভাবে প্রতারণা করারই একটি কৌশল মাত্র।

গান্ধী জিন্নাহ আলোচনার অব্যবহিত পরই বিশ্বস্ততার সঙ্গে ভারতীয় মুসলমানদের অনুভূতির প্রতিধ্বনি করে কায়েদে আজম ঘোষণা করেন যে, আমাদের পাকিস্তান সংগ্রাম কোনো রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে পরিচালিত নয় বরং ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে নির্মূল করার লক্ষ্যেই পরিচালিত। সিমলা আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার অব্যবহিত পরই ভাইসরয় এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের নির্দেশিত প্রতিনিধিদের বাদ দিয়ে লীগের সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্য নূতন উদ্যোগ গ্রহণ করতে তিনি কংগ্রেসের প্রতিও আবেদন জানান। কিন্তু কংগ্রেস যথোপযুক্ত সাড়া প্রদানের তোয়াক্কা করল না। ক্ষমতা ও প্রভুত্বের উন্মাদনায় বিভোর ব্যক্তিদের যে অবস্থা হয়ে থাকে, কংগ্রেস নেতৃবর্গ কায়েদে আজমের এরূপ ইঙ্গিতকে দুর্বলতার চিহ্ন হিসাবে মনে করল এবং ভারতের গৃষ্মাবকাশের রাজধানী (সিমলা) থেকে লীগের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ডাক দিলো। সুতরাং কংগ্রেসের সঙ্গে আমাদের সংগ্রাম হবে আত্মরক্ষামূলক, যদিও আমাদের পাকিস্তান সংগ্রাম মূলত কংগ্রেসের বিরুদ্ধে পরিচালিত নয় বরং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে নির্মূল করার লক্ষ্যেই

পরিচালিত। কংগ্রেস তাঁদের নিজেদের চিন্তা অনুযায়ী তাঁদের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হতে আমাদের বাধ্য করেছেন। সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল লীগ এবং কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্রের ব্যাপারে বিতর্কের চির অবসান ঘটাবে।

আদর্শগত অথবা ব্যক্তিগত, বৈধ অথবা অন্য কিছু সব রকম মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত। আমাদের দলের মধ্যে সম্ভাব্য সব রকমের বিশৃঙ্খলা পরিহার করার নিমিত্তে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে, প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ১৯৩৫ সালের ২৭শে আগস্ট এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলির নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত না হওয়া পর্যন্ত প্রাদেশিক লীগ, জেলা, মহকুমা এবং ইউনিয়ন পুনর্গঠনের জন্য সর্বপ্রকার নির্বাচন স্থগিত রাখা হোক। আমি অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ পার্লামেণ্টারী বোর্ডের সদস্য নির্বাচনের জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিলের অধিবেশন আহ্বান করি। সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ যে পার্লা-মেণ্টারী বোর্ড গঠনের উপর অনেকখানি নির্ভরশীল, সেটা উপলব্ধির জন্য বেশি জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। সুতরাং এখন থেকে কাউন্সিলের ভদ্রমহোদয়দের সাবধান করে দিচ্ছি তাঁরা যেন তাঁদের স্বদেশ প্রেমের চেতনাকে ব্যক্তিগত স্বার্থের বশীভূত হতে না দেন।

কায়েদে আজম মহাম্মদ আলী জিন্নাহ চান আমরা যেন আইনসভায় প্রথম শ্রেণীর একটি দল প্রেরণ করি। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিগত আট বৎসরে অযোগ্য ও অনির্ভরশীল দলের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে। আমরা কেবলমাত্র ভালো ধরনের নির্বাচন করতে পারি যদি আমরা একটি পার্লামেণ্টারী বোর্ড গঠন করতে সক্ষম হই যেটি প্রার্থী মনোনয়ন করার সময় সততা, যোগ্যতা এবং ন্যায়পরায়ণতা ব্যতিরেকে অন্য কিছু বিবেচনা করবে না। পার্লামেণ্টারী বোর্ডের সদস্যদের এমন হতে হবে যাতে তাঁরা জনগণের আস্থাভাজন হতে পারেন।

চতুর্দিক থেকে আমরা খবর পাচ্ছি যে, আইনসভার ভাবী প্রার্থীরা তাঁদের জন্য ভোট প্রার্থনা শুরু করে দিয়েছেন। কিছুসংখ্যক ব্যক্তি তাঁদের সম্ভাব্য বিরোধী পক্ষকে ভীতিপ্রদর্শনের নিমিত্তে এই মর্মে গুজব রটাচ্ছেন যে, তাঁদের নিজেদের নির্বাচনী এলাকার জন্য ইতিমধ্যে লীগ তাঁদের মনোনীত করেছেন। এ ধরনের প্রচারণার জন্য যেসব ব্যক্তি দায়ী তাঁরা যদি এ কাজ অব্যাহত রাখেন তবে তাঁরা লীগের সব চেয়ে বড় শত্রু হিসাবে বিবেচিত হবেন। মুসলিম লীগ জনগণের প্রতি আবেদন জানাচ্ছে যাতে তাঁরা লীগের আদর্শ ও দাবীর পক্ষেই নিজেদের ভোট প্রদান করেন, কোনো ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে নয়।

পার্লামেণ্টারী বোর্ড যদি সততার সঙ্গে গঠিত হয় তাহলে তাঁরা প্রার্থী নির্বাচনের ব্যাপারে স্থানীয় মতামত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন। বহু বছর

ধরে আমরা উঁচু গলায় চিৎকার করে আসছি মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ, পাকিস্তান এবং কায়েদে আজম জিন্দাবাদ। এখন লীগের মূল নীতির প্রতি, পাকিস্তান এবং তার নেতা কায়েদে আজম মহাম্মদ আলী জিন্নাহর প্রতি আনুগত্যের ক্ষেত্রে সত্য যাচাইয়ের সময় ও সুযোগ এসেছে। সুতরাং আমাদের উচিত স্বদেশপ্রেমের সর্বোচ্চ আদর্শ স্থাপন করা।

আমার বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, মুসলিম বাংলা একযোগে, এক ব্যক্তি রূপে, তাব সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করবে এবং একজন মুসলিম মুজাহিদের চেতনা নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণ করবে। একজন গাজীর সম্মান ও মর্যাদা অর্জন করে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সাফল্যমণ্ডিত হতে পারবে। কিছুসংখ্যক ব্যক্তি মনে করেন যে, মুসলিম লীগ নির্বাচনে সম্পূর্ণভাবে জয়লাভ করবে এবং শতকরা একশো ভাগ সাফল্য অর্জন করবে। আল্লাহতায়ালার আশীর্বাদে আমরা তাই আশা করি, কিন্তু অতিরিক্ত আত্মপ্রসাদের বিরুদ্ধে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। আসুন, আমবা বিনম্রভাবে আল্লাহতায়ালার কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের আশীর্বাদ করেন এবং সেই সঙ্গে তাঁর আশীর্বাদ লাভের যোগ্যতার জন্য আসুন আমরা সবতোভাবে চেষ্টা করি। এটাই হচ্ছে চিন্তা ও কোনো কাজ করার প্রকৃষ্ট মুসলিম রীতিনীতি।

পাকিস্তান বলতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বোঝায়। তাঁরা হচ্ছেন মূর্খ, কল্পনাবিলাসী অথবা কপট যাঁরা মনে করেন যে, চরম ত্যাগ ও সংগ্রাম ছাড়াই পাকিস্তান অর্জন করা সম্ভব। পাকিস্তানের প্রতিটি সৈনিকের পরিষ্কারভাবে জানা দরকার যে, পাকিস্তান অর্জনের পথ ক্যাল্‌ভ্যারির পথ থেকেও অনেক দুরূহ।

আমাদের কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী ও কারিগর, ছাত্র ও যুবক, কৃষক ও ভূস্বামী, উলেমা ও অপেশাদারী ব্যক্তির উচিত মুসলিম ভারতের মহান্ নেতার তূর্যধ্বনীর আহ্বানে সাড়া দেওয়া, সমস্ত মতপার্থক্যের অবসান ঘটানো, অতীতকে ভুলে যাওয়া, এবং শীতকালীন সংগ্রাম, আইনসভার সাধারণ নির্বাচনের জন্য নিজেদের সকল সম্পদকে কাজে লাগানো। মুসলমান হিসাবে আমাদের ব্যক্তিসত্তা ও সম্পত্তি সবই আল্লাহতায়ালার এবং আমাদের প্রতি নির্দেশ রয়েছে যখন যেমন প্রয়োজন হবে সেইমতো আমাদের সকল সম্পদ আল্লাহতায়ালার পথে নিয়োজিত রাখতে হবে। যাঁদের অর্থ আছে তাঁরা প্রয়োজন মতো যেভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে হজরত আবুবকর মু'তার যুদ্ধের জন্য রসুলের নিকট তাঁর বিষয় সম্পত্তি দান করে-ছিলেন সেইভাবে মুসলিম লীগের নিকট তা নির্বাচনী যুদ্ধের জন্য সমর্পণ করবেন। যাঁদের লেখনীশক্তি রয়েছে তাঁরা লেখা দিয়ে, যাঁদের বাচনশক্তি আছে তাঁরা তাঁদের বাগ্মীতার দ্বারা সাহায্য করবেন। ছাত্র এবং যুবকেরা তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম কাজে লাগাবেন।

কায়েদে আজম মহাম্মদ আলী জিন্নাহ তাঁর সাম্প্রতিক প্রেস বিবৃতিতে

ভারতীয় মুসলমানদের কাছে এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী আবেদন জানিয়েছেন। আসুন, আমরা তাঁর আশ্বাসে যথাযোগ্য সাড়া প্রদান করি। মুসলিম লীগের মতো একটি মহান্ প্রতিষ্ঠানের কারও প্রতি প্রতিহিংসা অথবা বিদ্বেষ থাকতে পারে না এবং সৎ ও সরল উদ্দেশ্য নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানে যাঁরা যোগ দিতে চান তাঁদের লীগ স্বাগত জানাতে প্রস্তুত। মুসলিম লীগের বাইরে এখনো যাঁরা রয়েছেন তাঁদের উচিত পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করা এবং অনতিবিলম্বে লীগে যোগদান করা।

কংগ্রেস নিজেদের অহেতুক এবং অনর্থকভাবে লীগের সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে ফেলেছে। আসুন, আমরা সাহসের সঙ্গে এর মোকাবেলা করি। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁর সাম্প্রতিক প্রেস বিবৃতিতে রাষ্ট্রীয় স্বায়ত্তশাসনের এবং কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা বলেছেন ও অনুগ্রহপূর্বক প্রস্তাবটি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে পেশ করার প্রতিজ্ঞা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি খুবই অনুগ্রহ করেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কংগ্রেস ভারতীয় মুসলমানদের যতটা বোকা বলে মনে করলেন তারা ততটা বোকা নন। আল্লাহর করুণায় এখন তাঁরা আসল ব্যাপারটি উপলব্ধি করতে পেরেছেন।

পাকিস্তান সূত্রটি খুবই সোজা এবং ভারতীয় রাজনীতির বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পাকিস্তানের মূলসূত্র হচ্ছে প্রকৃত গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, ন্যায় বিচার ও সমতা। সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্য ও অর্থনৈতিক শোষণ, যা কংগ্রেসের অখণ্ড ভারতের ভিত্তি, তার বিরোধিতা।

স্বাধীন ভারত কখনও এক দেশ ছিলো না। স্বাধীন ভারতীয়রা কখনও এক জাতি ছিলো না। অতীতে মোগল ও মৌর্য্য আধিপত্যে ভারত ছিলো অখণ্ড এবং বর্তমানে গ্রেট বৃটেনের আধিপত্যে রয়েছে অখণ্ড। স্বাধীন ভারতকে আল্লাহতায়ালা যেমন সৃষ্টি করেছেন সেইভাবে হতে হবে একটি উপমহাদেশ যেখানে প্রতিটি বসবাসকারী জাতি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করবে। বোম্বাইয়ের পুঁজিপতিদের প্রতি কংগ্রেসের যতই দুর্বলতা থাকুক এবং অখণ্ড ভারতের দোহাই দিয়ে সমগ্র ভারতকে শোষণ করার ক্ষেত্রে তাদের জন্য তাঁরা যতই সুযোগ সৃষ্টি করুন, প্রতিটি ভারতীয় মুসলিম, ভারতে কংগ্রেস কর্তৃক যে কোনো চক্র, গ্রুপ অথবা সংগঠনের একনায়কত্ব প্রতিষ্টা করার উদ্যোগকে প্রতিরোধ করবে। পাকিস্তান বলতে হিন্দু ও মুসলমান সকলের স্বাধীনতা বোঝায়, ভারতীয় মুসলমানরা প্রয়োজন হলে রক্তস্নানের মাধ্যমে তা অর্জন করতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। কংগ্রেসের একথা বোঝা উচিত যে, যখন আমরা মুসলমানরা স্বাধীনতার কথা বলে থাকি তখন সেটি সত্যিভাবেই বলি এবং ভারতীয় মুসলমানরা বৃটিশ অথবা ভারতীয় সব রকমের আধিপত্য ও শোষণের বিরোধী। পাকিস্তানে জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের জন্য সুযোগ সুবিধের ন্যায়সঙ্গত ও

সমতাভিত্তিক বণ্টন ব্যবস্থা থাকবে। শরিয়ত অনুযায়ী তাদের সমাজকে শাসন করার অধিকার ছাড়া নিজেদের জন্য কোনো বিশেষ সুযোগের সংরক্ষণ রাখা মুসলমানদের চিন্তার মধ্যে নেই। এটা বললে মিথ্যা ও দুরভিসন্ধিমূলক হয় যে, পাকিস্তান বলতে মুসলমানদের আধিপত্য এবং অন্যান্যদের শোষণ করার সুযোগ সুবিধে বোঝায়।

কায়েদে আজম মহাম্মদ আলী জিন্নাহ নিখিল ভারত মুসলিগ লীগের পক্ষ থেকে ঘোষণা করেছেন,"পাকিস্তান সরকারের প্রতি পাকিস্তানের সাধারণ মানুষদের সমর্থন থাকবে এবং পাকিস্তান সরকার জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে পাকিস্তানের সকল জণগণের ইচ্ছে অনুযায়ী ও অনুমতি নিয়ে পরিচালিত হবে।" (৫ই অক্টোবর, ১৯৪৩)

মুসলমানদের লীগে যোগদানের এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষামূলক সংগ্রামের আবেদন জানাতে গিয়ে তাদের সাবধান করে দিতে চাই, তাঁরা যেন দিল্লী ও লণ্ডনের আপাত উদাসীন সাম্রাজ্যবাদীদের ভুলে না যান। আমরা যেন ভুলে না যাই যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদের উপর পাকিস্তান অর্জন নির্ভরশীল। সাম্রাজ্যবাদীরা কংগ্রেসে ক্ষমতার লোভের আভাস পেয়েছে এবং তার যথাযথ সদ্ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস মুসলিম লীগকে জড়ানোর জন্য সাবধানে ফাঁদ পেতেছে। সিমলায় উর্দী পরিহিত ভৃত্য কর্মচারা এবং মার্শাল ওয়াভেলের সুমধুব কথাবার্তা সাফল্যের সঙ্গে কংগ্রেসকে ফাঁদে আকর্ষণ করেছে। কংগ্রেস মুসলমানদের পরাজিত করার জন্য সৈনিক ভাইসরয়কে তাদের মিত্র হিসাবে পাওয়ার চেষ্টা করেছে। কায়েদে আজমকে ধন্যবাদ, তিনি ভারতীয় মুসলমানদের সম্মান ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে মাথা উঁচু করে সিমলা ত্যাগ করেছিলেন এবং একজন সৎ নেতার সাহস নিয়ে সাধারণ নির্বাচন দাবী করেছেন। সুতরাং লীগ আমাদের শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের নিকট নয়, জনগণের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। আমরা পাকিস্তান অর্জন করব আমাদের নিজেদের জনগণের ত্যাগ ও তিতিক্ষার দ্বারা, বৃটিশদের সৌজন্য ও বদান্যতার মাধ্যমে নয়। যেহেতু আমরা সমদর্শিতা, ন্যায় বিচার ও ন্যায্য ব্যবহারের উপর দাঁড়িয়ে আমাদের নীতি নির্ধারণ করেছি, যেহেতু আধিপত্য ও শোষণ নয়, স্বাধীনতা ও মুক্তিই হলো আমাদের প্রেরণার উৎস, তাই ঐক্যবদ্ধ থাকলে আমাদের জয় হবেই।

আমার বাংলা সফর কালে আমি দেখেছি জনগণের বুদ্ধি ও হৃদয় খুবই সুস্থ এবং উপরতলার নেতারা যদি তাঁদের নেতৃত্ব অর্জনের ব্যগ্রতায় জনগণের হৃদয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি না করেন অহলে তাঁরা কোনো রকম ভুল করবেন না। সুতরাং এই একটি ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণ থেকে আমাদের সাবধান থাকতে হবে। এক মুহূর্তের জন্যও যাতে আমরা বিস্মৃত না হই যে, আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে পাকিস্তান এবং ১৯৩৫ সালের ভারত সরকার আইনের অধীনে মন্ত্রিত্ব শুধু একটি আনুষঙ্গিক

ব্যাপার মাত্র। নেতৃবর্গের মধ্যে যাঁরা ভাবী বিধানসভায় মন্ত্রী অথবা মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নিজের অবস্থান বজায় রাখার প্রবণতা প্রদর্শন করবেন তাঁদেরকে ভালো-ভাবে চিহ্নিত করা হবে এবং মুসলিম বাংলা তাঁদেরকে কখনও ক্ষমা করবে না।

সাধাবণ নির্বাচন আমাদের সংগ্রামের সূত্রপাত। ভোট কেন্দ্রে পাকিস্তানের স্বপক্ষে আমাদেব ভোট প্রদানের পর, কংগ্রেসের মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বের মিথ্য দাবীকে নিশ্চিহ্ন করে গণভোটে বিজয় লাভের পর মুহূর্তেই সাম্রাজ্যবাদের প্রতি আমরা দৃষ্টি নিবদ্ধ করব এবং পাকিস্তানের ভিত্তিতে ভারতের জনগণের কাছে আশু ক্ষমতা হস্তান্তবের দাবী করব। আমাদের সংগ্রাম সকলের মুক্তির সংগ্রাম, আমরা বিশ্বাস ও আশা করি প্রত্যেক মুক্তিকামী নারী ও পুরুষ আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন।

আমরা কংগ্রেসের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হতে চলেছি কিন্তু এ ব্যাপারে আমরা খুব একটা খুশি নই কেন না কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা অথবা প্রকৃত অর্থে ভারতীয় জনগণের কোনো অংশ অথবা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংগ্রামে আমরা কখনও শক্তির অপচয় করতে চাইনি। আমাদের সংগ্রাম শতকরা একশো ভাগ আত্মরক্ষামূলক। আমরা কংগ্রেসের সঙ্গে সংগ্রাম করতে চাইনি, তারা ফ্যাসিস্ট আক্রমণকারাদের ন্যায় অন্যায় ও অশোভনভাবে জোর পূর্বক আমাদের সংগ্রামে নামতে বাধ্য করেছে। সুতরাং বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা ব্যাতিরেকে চূড়ান্ত বিজয়ের প্রত্যয় নিয়ে অন্তর দিয়ে এবং আল্লহতায়লার প্রতি আস্থা রেখে শুরু হোক আমাদের সংগ্রাম।*

* মূল ইংরেজি রচনা 'Let us go to war' থেকে অনূদিত —অনুবাদক

## পরিশিষ্ট : ৪

## ১৯৪৬ সালের দিল্লী প্রস্তাব

[ ১৯৪৬ সালের ৯ই এপ্রিল দিল্লীর অ্যাংলো এরাবিক কলেজে আইনসভার সদস্যদের অধিবেশনে অনুষ্ঠিত প্রস্তাবের মূল বয়ান যেটি প্রস্তাব নামে সমধিক পরিচিত। উত্থাপক : বাংলার এইচ. এস. সুহরাওয়ার্দী ]

"যেহেতু ভারতের এই বিশাল উপমহাদেশে দশ কোটি মুসলমান এখন এক বিশ্বাসে অনুগত যেটি তাদের শিক্ষা বিষয়ক, সামাজিক, অর্থ নৈতিক এবং রাজ-নৈতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে নিয়ন্ত্রিত করে; যেটি কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক মতবাদ ও আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। যেটি হিন্দু ধর্ম ও দর্শনের সংকীর্ণ এবং অনুদার প্রবৃত্তি যা হাজার বছর ধরে একটি গোঁড়া বর্ণাশ্রমকে লালন ও পোষণ করে আসছে, যা ছয় কোটি মানব সন্তানকে অস্পৃশ্যের পর্যায়ভুক্ত করেছে, মানুষের মধ্যে অস্বাভাবিক ভেদের প্রাচীর সৃষ্টি করেছে এবং দেশের জনগণের

বিরাট অংশের উপর সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য উপর থেকে চাপিয়ে রেখেছে, যা মুসলমান, খৃষ্টান ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পুনরুদ্ধারের অযোগ্য ভূমিদাসে পরিণত করার ভীতি প্রদর্শন করে,

"যেহেতু হিন্দু বর্ণাশ্রম, জাতীয়তাবাদ, একতা, গণতন্ত্র এবং সর্বপ্রকার মহৎ আদর্শ যা ইসলাম স্বীকার করে তাকে সরাসরি অস্বীকার করে,

"যেহেতু বিভিন্ন ঐতিহাসিক পটভূমি, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, হিন্দু মুসলমানের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো, আদর্শ এবং সাধারণ আশা আকাক্ষার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে এক ভারতীয় জা৷তব অভ্যুত্থানকে অসম্ভব করেছে এবং যেহেতু শত বছর পর তারা আজও দুই পৃথক প্রধান জাতি হিসাবে বজায় রয়েছে,

"যেহেতু সংখ্যাগুরুর শাসনের ৷ভত্তিতে পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের ধারায় ভারতে বৃটিশ কর্তৃক রাজনৈতিক প্রাতষ্ঠান প্রবর্তনের নীতির অব্যবহিত পরই যার অর্থ সংখ্যাগুরু জাতি অথবা সমাজ অন্যান্য সংখ্যালঘু জাতি অথবা সমাজের উপর তাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও নিজেদের সংকল্প আরোপ করতে পারবে যা ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অধীনে কিছু সংখ্যাগুরু প্রদেশগুলিতে কংগ্রেস সরকারের আড়াই বছরের শাসনে পরিষ্কারভাবে প্রদর্শিত হয়েছিলো, যখন মুসলমানরা অবর্ণনীয় হয়রানি ও অত্যাচারের শিকারে পরিণত হয়েছিলো। যার ফলে সংবিধানে তথাকথিত নিরাপত্তার ব্যবস্থা এবং গভর্নরদের নিকট নির্দেশমালার অক্ষমতা ও অকার্যকারিতা সম্বন্ধে তাঁরা নিশ্চিত হয়েছেন এবং এই অপ্রতিরোধ্য ৷সদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, যুক্ত ভারত ফেডারেশন যদি গঠিত হয় তাহলে তাতে এমনকি মুসলমান প্রদেশেও কেন্দ্রের মতোই হিন্দু সংখ্যাগুরুদের থেকে তাঁদের সুযোগ সুবিধে যথাযথরূপে সংরক্ষিত হবে না এবং তাঁদের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন সূচিত হবে না,

"যেহেতু মুসলমানরা সুনিশ্চিত যে হিন্দুদের আধিপত্য থেকে ভারতীয় মুসলমানদের রক্ষা করার জন্য এবং তাদের প্রতিভা অনুযায়ী নিজেদের গঠন করার সুযোগের ব্যবস্থা করার জন্য উত্তর-পূর্ব দিকে বাংলা ও আসাম এবং উত্তর-পশ্চিম দিকে পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং সিন্ধু ও বেলুচিস্তান নিয়ে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের প্রয়োজন রয়েছে;

"ভারতের মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভার সভ্যদের এই সম্মেলন মনোযোগ সহকারে বিবেচনা করার পর এই মর্মে ঘোষণা করছেন যে, মুসলমান জাতি যুক্ত-ভারতের জন্য কোনো সংবিধান মেনে নেবে না। এজন্য গঠিত কোনো একক সংবিধান প্রস্তুতকারী ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করবে না এবং বৃটিশ সরকার কর্তৃক প্রস্তুত ক্ষমতা হস্তান্তরের এমন কোনো ফর্মুলা সমর্থন করবে না যা ভারতীয় সমস্যা সমাধানে সহায়তা বা দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য যদি নিম্নোক্ত ন্যায়সঙ্গত নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়:

"(১) উত্তর-পূর্বে বাংলা ও আসাম এবং ভারতের উত্তর-পশ্চিমে পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান নিয়ে যা পাকিস্তান অঞ্চল, যেখানে মুসলমানরা প্রধান সংখ্যাগুরু সেগুলিকে নিয়ে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হবে এবং বিলম্ব না করে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য সুস্পষ্ট অঙ্গীকার দিতে হবে ;

"(২) পাকিস্তানের এবং হিন্দুস্থানের জনসাধারণ কর্তৃক তাঁদের নিজস্ব সংবিধান সাধনের উদ্দেশ্যে দুটি পৃথক সংবিধান তৈরীর সংস্থা স্থাপন করতে হবে ,

"(৩) ১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ লাহোরে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের গৃহীত প্রস্তাবের ধারায় পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা সংরক্ষিত থাকতে হবে ,

(৪) মুসলিম লীগের সহযোগিতা এবং কেন্দ্রে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের জন্য মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবী মেনে নেওয়া এবং তা অনতিবিলম্বে কার্যকর করা হলো একটি পূর্ব শর্ত ।

"এই সম্মেলন পুনরায় দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করছে যে, মুসলমানদের দাবীর পরিপন্থী যুক্ত-ভারতের ভিত্তিতে কোনো সংবিধান চাপিয়ে দেওয়ার যে কোনো উদ্যোগ অথবা কেন্দ্রে কোনো অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি হলে, তাদের জাতীয় অস্তিত্বকে বজায় রাখাব জন্য যে কোনো উপায়ে তাতে বাধা প্রদান করা ছাড়া মুসলমানদের বিকল্প কোনো পথ থাকবে না ।"

পরিশিষ্ট : ৫

**অনাস্থা প্রস্তাব**

আবুল হাশিমের বক্তৃতা,
বৃহস্পতিবার ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬ বেলা দুই ঘটিকা,
বঙ্গীয় আইন পরিষদের কার্যবিবরণী ।

মাননীয় স্পীকার মহোদয় আজকে আমি কোনো উগ্র বিতর্কমূলক আলোচনায় অংশ গ্রহণ অথবা ভবিষ্যতে এর প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে সে বিষয়ে সচেতন থেকে বাংলার হিন্দু মুসলমানদের কার কত দোষ ত্রুটি আছে তার ভাগ-বণ্টন থেকে বিরত থাকা স্থির করেছি । আমি আশ্চর্য হচ্ছি যে, বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাবটি কি বর্তমান মন্ত্রিত্বের বিরুদ্ধে হওয়া উচিত, না-কি তা হওয়া উচিত ১৯৩৫ সালের ভারত সরকার আইন (Government of India Act ) এবং তার প্রবক্তা ও মিত্রদের বিরুদ্ধে । আমার কোনো সন্দেহ নেই যেহেতু কংগ্রেস বেঞ্চে আমাদের বন্ধুদের বুদ্ধিমত্তা ও বোধশক্তির প্রতি আমার পূর্ণ আস্থা রয়েছে যে, তাঁরা যদি তাঁদের বিশেষ স্বার্থের উর্ধ্বে থেকে ঘটনার বাস্তব দিকগুলো এবং মুসলমানদের অভিযোগগুলো আবেগহীন মনোভাব নিয়ে বিশ্লেষণ

করতেন তাহলে তাঁরা এই মন্ত্রিত্বের বিশেষ করে স্বরাষ্ট্র ও মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় সুহরাওয়ার্দীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব না এনে তাঁর প্রতি আস্থা প্রস্তাব আনয়ন করতেন। এটা অতীব দুঃখজনক ব্যাপার কারণ আমার দেশের অন্যান্য দল এবং প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমার মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও আমার বিপক্ষদের জন্য কিছুটা সম্মান ও শ্রদ্ধা আমি বজায় রেখেছিলাম। আজকে কংগ্রেস বেঞ্চে আমাদের অনেক বন্ধু যখন সুহরাওয়ার্দীকে তাঁর কৃত অপকর্ম পুলিশ কমিশনারের ঘাড়ে চাপানোর জন্য অভিযুক্ত করেন তখন এটাকে আমি অতীব দুঃখজনক ব্যাপার বলে মনে করি। কারণ সাধারণ কাজ-কর্মের ক্ষেত্রে কেউ এটা আশা করতে পারতেন না যে, কংগ্রেসের সদস্যবৃন্দ, যাঁরা প্রতিনিধিত্ব করেন এমন একটি মহান্ সংগঠনের যা সাম্প্রতিক বৎসরগুলিতে ভারতে বিপ্লব ও স্বাধীনতার শিখা সমুজ্জ্বল রেখেছিলেন, তাঁরা এ ধরনের কথা বলতে এবং সরকারী আমলাতন্ত্রের পক্ষে ওকালতি করতে পারেন। যে দলের অন্তর্ভুক্ত থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছে তার দোষত্রুটি থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে একজন সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি হিসাবে হৃদয়ে কি অনুভব করি সে বিষয়ে মহোদয়কে বলতে পারি যে, এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যা ঘটেছে সেটা সুহরাওয়ার্দী অথবা তাঁর মন্ত্রিসভার কারণে নয় বরং তাঁরা থাকা সত্ত্বেও সেটা ঘটেছে। এই বীভৎস হত্যাকাণ্ড কি কারণে সংঘটিত হয়েছিলো সেটা আমি যেভাবে বুঝি ও অনুভব করি আপনাদের কাছে তুলে ধরতে চাই। মহোদয় আমার ক্ষুদ্র অভিমত অনুযায়ী বলতে পারি পৃথিবীর বুকে এমন বড় মূর্খ আর কেউ হতে পারে না যে বলতে পারে যে, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ এবং তাঁর সঙ্গীরা যাঁদের বলা যেতে পারে পৃথিবীর সেরা কূটনীতিজ্ঞ, যাঁরা এমন এক জাতির প্রতিনিধিত্ব করেন যাঁরা শত বছর ধরে কূটনীতিতে অন্যান্য জাতিকে পরাজিত করেছেন, তাঁরা ভারতে এসেছিলেন ভারতের মঙ্গলের জন্য, হিন্দু মুসলমানদের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে। সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতে বৃটিশরা নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলো এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতীয় শাসন ব্যবস্থা ও ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রগুলি করায়ত্ত করেছিলো। এরপর তারা মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চলে রাজনীতি নিয়ে নিজেদের ব্যাপৃত রেখেছিলো। কিন্তু এখন আমরা ভারতীয়রা যখন স্বাধীনতা লাভের জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, আমাদের লক্ষ্যে অগ্রগতি লাভ করতে চলেছি তখন বৃটিশদের এখানেও কিছুটা রাজনীতি করবার সময় এসেছে। সুতরাং স্যার স্ট্যাফোর্ড এবং তাঁর সঙ্গীরা ভারতে রাজনীতি করতে এসেছেন এবং তাঁদের বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে কৃতকার্য হয়েছেন। এটা আমাদের লজ্জার ব্যাপার যে তাঁরা পুনরায় কৃতকার্য হয়েছেন, এর প্রতি আমি আরও গুরুত্ব দিচ্ছি এজন্য যে আমাদের দৌড় কতদূর সে বিষয়ে সচেতন থাকার সৎ সাহস যেন আমরা লাভ করি।

মহোদয়, এই সব কূটনীতিকরা রাজনীতির ব্যাপারে ভারতে এসেছিলেন

যখন আমরা ভারতের হিন্দু মুসলমানরা পারস্পরিক বিবাদে লিপ্ত। কংগ্রেস ও লীগের মহান্ নেতারা সমভাবে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ ও তাঁর সঙ্গীদের শ্রেষ্ঠতর রাজনৈতিক বুদ্ধির কাছে ভালোভাবে পরাভূত হয়েছিলেন। এটাকে প্রথমে স্বীকার করে নিতে হবে এবং তাহলে এই হত্যাকাণ্ডের জন্য কে দায়ী ছিলো, কেমন করে এর সমাধান সম্ভব এবং এরপর আমরা কি করেত পারি সেটা খুঁজে বের করতে কোনো অসুবিধে হবে না। আমাদের ভুললে চলবে না যে, ভারতে বৃটিশদের অধিকৃত অঞ্চলগুলি লাল রঙ দ্বারা চিহ্নিত। বিগত চল্লিশ বছরে আমাদের সংগ্রামের ফলে ভারতের মানচিত্রে এই লাল রঙ ফ্যাকাশে হয়েছে। এখন তারা হিন্দু এবং মুসলমান উভয়ের রক্তে তাকে নূতনভাবে রঞ্জিত করতে চায়। কলকাতার হত্যালীলা এর শুরু এবং যতক্ষণ না আমরা সতর্কতা অবলম্বন করি এটা হতে থাকবে এবং ভারতের লাল মানচিত্র ভারতীয়দের রক্তে আরও দেড়শত অথবা তার অধিক বছরের জন্য রঞ্জিত হবে। ভারতের ভাইসরয় মহামান্য লর্ড ওয়াভেল যদি সত্যিই ভারতের জনগণের মধ্যে শান্তি, ঐক্য ও সদ্ভাবের কথা, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে একতার কথা চিন্তা করতেন, যতক্ষণ না কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ কোনো চুক্তিতে উপনীত হচ্ছে ততক্ষণ কোনো দলকেই তিনি সমর্থন দান করবেন না বলে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন, তাহলে অনেক আগেই একটি চুক্তিতে উপনীত হওয়া সম্ভব হতো। কংগ্রেস দল বলে থাকেন যে আমরা সাম্প্রদায়িক সুযোগ দাবা কবছি এবং হিন্দু মুসলমানদের অনৈক্য তৃতীয় শক্তির একপ্রকার কৃত্রিম সৃষ্টি। এটা হাজার বার অনুতাপের ব্যাপাব যে আজকে তাঁরা সেই শক্তিকে ভুলে গেছেন ও হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে কি ঘটছে সে বিষয়ে নিজেদের বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন এবং এক দল অন্য দলকে এড়িয়ে চলেছেন যার ফলেই কলকাতার গোলযোগ দেখা দিয়েছিলো। মুসলমানদের মনে এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে তাদের হিন্দুদের কাছে সমর্পণ করা হয়েছে এবং হিন্দুদের মনে এই ধারণা জন্মেছে যে তাঁরা যা চেয়েছিলেন তাই পেয়েছেন।

বাংলার সেই মহান্ ব্যক্তিত্ব ও দেশপ্রেমিক স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী যিনি প্রকৃতপক্ষে ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের পথিকৃৎ ছিলেন তাঁর কথা আমার মনে পড়ছে। তিনিও তাঁর প্রতিভা, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা এবং দুর্ভোগ সত্ত্বেও ১৯১৯ সালে মনে করেছিলেন, তিনি যা চেয়েছিলেন তাই পেয়েছেন। সুতরাং আমিও মনে করি যে আমাদের শ্রদ্ধেয় কংগ্রেস নেতৃবর্গ, যাঁদের দুর্ভোগ ও ত্যাগের কথা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকবে এবং যাঁদের ত্যাগের জন্য সারা ভারতবর্ষ তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে, পঁচিশ ত্রিশ বৎসরের কঠিন সংগ্রামের পর তাঁদের জীবন সায়াহ্নে মনে করছেন, যেমন বাংলার স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী মনে করেছিলেন, যে অন্তর্বর্তী সরকারে তাঁরা যা চেয়েছিলেন তাই পেয়েছেন। এ কারণেই যখন মুসলিম লীগের বোম্বে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিলো তখন ভারতের অপর দিক থেকে সরদার

প্যাটেল ঘোষণা করেন যে, মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম বৃটিশদের বিরুদ্ধে নয় বরং কংগ্রেস এবং হিন্দুদের বিরুদ্ধে। তাঁরা ঘোষণা করেন যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ আর নেই, গ্রেট বৃটেন তার সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করেছে এবং পণ্ডিত নেহরু, সরদার প্যাটেল ও অন্যান্যেরা ভারত দখল করে ফেলেছেন, তাঁরা একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের কর্তৃত্বে রয়েছেন। এই ধারণা পণ্ডিত নেহরু এবং অন্যান্যেরা সকলের মনে সৃষ্টি করলেন।

মহোদয়, এখন আমি জানি যে, ভারতের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের উক্তি ও বক্তব্যের উপর মহামান্য ভাইসরয়ের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। কিন্তু মহোদয়, পণ্ডিত নেহরু ও সরদার প্যাটেল যখন জনগণের কাছে বক্তব্য রেখেছিলেন যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারত ত্যাগ করেছে, যা ছিলো সত্যের অপলাপ, সে সময় ভাইসরয়ের এ ব্যাপারে নীরব থাকা উচিত হয়নি। এই উক্তির পর কয়েক সপ্তাহ ভাইসরয়ের সুস্পষ্ট নীরবতা সত্যিই এই বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছিলো যে, বোম্বে প্রস্তাবের পর পণ্ডিত নেহরু ও সরদার প্যাটেল যা বলেছেন বাস্তবে তাই হয়েছে। মহামান্য ভাইসরয় সকল প্রদেশের গভর্নরদের একটি সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন। আমি মনে করি সেটা ছেলেখেলার মতো কোনো ব্যাপার ছিলো না। তারও একটা রাজনৈতিক পটভূমি ছিলো।

এখানে কলকাতায় আজকে দেখছি, আমাদের বিরোধী দলীয় বন্ধুরা অযোগ্যতা ও উদাসীনতার কারণ দেখিয়ে, স্রষ্টার দোহাই দিয়ে, সুহরাওয়ার্দীকে পদত্যাগ করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে তার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন।

স্রষ্টার দোহাই এবং যা কিছু মহৎ তার দোহাই দিয়ে তাঁদের আমি বলতে চাই, তাঁরা নিজেদের অন্তরকে বিশ্লেষণ করে দেখুন এবং নিজেদের প্রশ্ন করুন এটা সত্য কিনা যে, সুহরাওয়ার্দীকে এই হত্যালীলার সময় তাঁর প্রতিভার শীর্ষে দেখা গিয়েছিলো। আইনশৃঙ্খলা বলতে যে কিছুই ছিলো না সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এটা সত্যের অবমাননা করা হবে যদি পক্ষান্তরে কিছু বলা হয়। কিন্তু এটা সত্য যে এই মহৎ পুরুষের মধ্যে আমি যা দেখেছি তা হলো তিনি প্রতিভার, সততার, চারিত্রিক দৃঢ়তার, বিচার শক্তির ও যোগ্যতার শীর্ষে ছিলেন। সে সময় তাঁকে নিজের জীবন বিপন্ন করে দিবা রাত্রি কলকাতার পথে ঘুরতে দেখা গিয়েছিলো। তিনি তাঁর সহকর্মী বন্ধু-বান্ধবদের একে একে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখেছিলেন কিন্তু তাঁর সেই বিচারবুদ্ধির কোনো বিলুপ্তি ঘটেনি যা আমাদের দেশের একজন মুখ্য-মন্ত্রীর পক্ষে শোভনীয়। কংগ্রেসে আমাদের বন্ধুবর্গ বলেছেন যে, মুসলিম লীগ পার্টির সঙ্গে তাঁর সংস্রব ও ঘনিষ্ঠতার কারণে তিনি ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলেন, কিন্তু এর থেকে বড় মিথ্যা আর হতে পারে না। সেই সময় আমরা দেখেছি যে, মুসলমানরা দল বেঁধে এসে আমাদের কাছে অভিযোগ করেছেন যে, সুহরাওয়ার্দী

হিন্দুদের প্রতি অত্যধিক মাত্রায় মনোযোগ দিচ্ছেন। আমরা দেখেছি গত তিন-চার দিন ধরে আহার নিদ্রা পরিহার করে তিনি অবিরাম কাজ করে যাচ্ছেন, এবং লালবাজার কণ্ট্রোল রুমে নিজেকে আবদ্ধ রেখে তিনি নির্দেশ জারি করছেন। যদি কেউ তাঁর ব্যক্তিগত নোট বই দেখতে সাহস করেন তিনি দেখতে পাবেন কত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাঁকে সব ব্যাপার পর্যালোচনা করতে হয়েছিলো। এটা সত্য যে, ১৬ই ও ১৭ই তারিখে সাধারণ ট্রাফিক পুলিশ দেখা যায়নি এবং কলকাতা পুলিশ অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনতে অক্ষম হয়েছিলো, কিন্তু সুহরাওয়ার্দী প্রথমেই মহানগরীর ভার গ্রহণ করার জন্য সৈন্য তলব করেছিলেন, একথা কে অস্বীকার করতে পারেন। (এ সময় সদস্যের সময় সীমা শেষ হয়ে গিয়েছিলো কিন্তু তাঁকে আরও দু'মিনিট সময় দেওয়া হয়েছিলো।) কিন্তু সৈন্যদের যেভাবে তাড়াতাড়ি আদেশ পালন করা উচিত ছিলো তা তারা করেনি কারণ ভারত সরকার আইনে ( Govt. of India Act ) সৈন্যদের উপর মুখ্যমন্ত্রীর কোনো নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ছিলো না। তিনি যদি পুলিশ কমিশনারের বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ করে থাকেন তাহলে তিনি অন্যের দোষ তাঁর ঘাড়ে চাপাননি। বিরোধী দলীয় বন্ধুদের এবং তাঁদের মারফৎ দেশবাসীকে আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি, সুহরাওয়ার্দী আর যাই হোন তিনি কাপুরুষ নন। তিনি জানেন কিভাবে নিজের উপর দায়িত্ব নিতে হয়।

যেহেতু আমার সময় সীমা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে তাই আমি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে স্রষ্টার দোহাই দিয়ে এবং যা কিছু মহান্ ও গরিমাময় তার দোহাই দিয়ে জিজ্ঞেস করতে চাই হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই কী এত সহজে বৃটিশ চক্রান্তের শিকারে পরিণত হবেন এবং যেভাবে অবস্থার পর্যালোচনা করা উচিত তা থেকে বিরত থাকবেন? আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, সময় আগত প্রায়, এখন আমাদের চেতনার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করা উচিত। জনগণের এই চরম দুর্দশা আমাদের মধ্যে সমস্ত বিভেদ দূর করে সাম্য অনায়নে শক্তিশালী অস্ত্র স্বরূপ। জনগণের এই দুর্দশা, আমাদের বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন ও সহকর্মীদের রক্ত, আমাদের মধ্যেকার ভেদাভেদকে দূর করতে এবং এই তৃতীয় শক্তি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ভারত থেকে বিতাড়িত করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হতে অবশ্যই সহায়ক হবে।*

---

*মূল ইংরেজি বক্তৃতা থেকে অনূদিত —অনুবাদক

★